

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2856

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

ড. মোঃ আলী করিম

ড. এ.টি.এম. সামছুজ্জোহা

মাহমুদুর রহমান

এ.কে.এম. ইফতেখারুল ইসলাম

ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির

কোর্স সমন্বয়কারী

ড. মোঃ আলী করিম

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2856

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৮

পুনঃ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি-২০১৯, অক্টোবর-২০২০, অনলাইন ভার্সন : জানুয়ারি-২০২২, জানুয়ারি-২০২৩,
জানুয়ারি-২০২৪, সেপ্টেম্বর-২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর-২০২৫

[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

মানচিত্র/ছবি: সংগৃহীত

কভার গ্রাফিক্স

আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ টিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3150-9

মুদ্রণ

বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০।



কোর্স বই অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ

এই বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামত সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি ‘মড্যুলার পদ্ধতি’ নামে পরিচিত। এখানে পাঠ্যপুস্তক একসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্স বইটির ভাবগত ঐক্য বজায় রেখে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতকগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতকগুলো পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল:

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- প্রথম পাঠের সবগুলো ‘উদ্দেশ্য’ পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কি না তা ভালভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালভাবে বুঝার জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাকটিভিটি (এসো নিজে করি) সংযোজন করা হয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালাসহ সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভাল করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কিনা দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও পড়ুন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কিত পরামর্শ

- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশ গ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যোপযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করুন প্রয়োজনে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে যেগুলো কঠিন/দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করেছেন সে সকল বিষয় বুঝতে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের টিউটরের (শিক্ষকের) সহায়তা নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউনিটের সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	 কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	 উদ্দেশ্য	 বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	 ভিডিও বা দেখা	 অডিও বা শোনা
 অ্যাসাইনমেন্ট	 কেস স্টাডি	 দলীয় কাজ	 ব্যবহারিক	 শিক্ষার্থীর কাজ	 সারসংক্ষেপ
 পাঠোত্তর মূল্যায়ন	 শব্দার্থ/মুখ্যশব্দ	 চূড়ান্ত মূল্যায়ন	 উত্তরমালা	 সাহায্য/প্রয়োজনে	

 কোর্স সমাপ্তির সময়	কোর্স সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ
--	--

 অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়গুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।
---	--

 প্রয়োজনে	যে কোন সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন— আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর অথবা (ড. মোঃ আলী করিম) সহকারী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস) ওপেন স্কুল, বাউবি গাজীপুর-১৭০৫। ই-মেইল: alikaarim1979@bou.ac.bd
--	--

সূচিপত্র

ইউনিট ১: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	১-২০
পাঠ- ১ : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা	২
পাঠ- ২ : মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	৬
পাঠ- ৩ : সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব	১০
পাঠ- ৪ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অভিযান: তরাইনের (প্রথম ও দ্বিতীয়) যুদ্ধ	১৫
পাঠ- ৫ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৮

ইউনিট ২: দিল্লি সালতানাত যুগ (১২০৬-১৫২৬ খ্রি.)	২১-৬৩
পাঠ- ১ : সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক	২২
পাঠ- ২ : সুলতান ইলতুতমিশ	২৫
পাঠ- ৩ : সুলতান ইলতুতমিশের চরিত্র ও কৃতিত্ব	২৮
পাঠ- ৪ : সুলতান রাজিয়া	৩১
পাঠ- ৫ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন	৩৩
পাঠ- ৬ : আলাউদ্দিন খলজি: রাজ্য বিজয়	৩৬
পাঠ- ৭ : আলাউদ্দিন খলজির শাসন সংস্কার ও কৃতিত্ব	৪০
পাঠ- ৮ : তুঘলক বংশ ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক	৪৩
পাঠ- ৯ : ফিরোজ শাহ তুঘলক	৪৭
পাঠ- ১০ : সৈয়দ বংশ	৫০
পাঠ- ১১ : লোদী বংশ	৫৩
পাঠ- ১২ : সুলতান আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৫৬
পাঠ- ১৩ : দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ ও ফলাফল	৬০

ইউনিট ৩ : ভারতবর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)	৬৪-১০৬
পাঠ- ১ : ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৬৫
পাঠ- ২ : সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব	৭০
পাঠ- ৩ : শূর বংশ: শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা	৭৫
পাঠ- ৪ : শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৭৯
পাঠ- ৫ : সম্রাট আকবর: রাজ্য বিজয়, ধর্মনীতি ও রাজপুত নীতি	৮১
পাঠ- ৬ : সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা, সংস্কারসমূহ ও কৃতিত্ব	৮৫
পাঠ- ৭ : সম্রাট জাহাঙ্গীর: নূরজাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব	৮৮
পাঠ- ৮ : সম্রাট শাহজাহান : চরিত্র ও কৃতিত্ব	৯১
পাঠ- ৯ : সম্রাট আওরঙ্গজেব: দক্ষিণাত্য নীতি, ধর্মনীতি, শাসন পদ্ধতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব	৯৫
পাঠ- ১০ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল	৯৯
পাঠ- ১১ : মুঘল আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১০২
পাঠ- ১২ : মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন	১০৫

ইউনিট ৪ : বাংলার ইতিহাস: খলজি, তুর্কি ও বলবনি শাসন (১২০৪-১৩৩৮ খ্রি.).....১০৭-১২২

পাঠ- ১ : মুসলিম আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা	১০৮
পাঠ- ২ : মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়: চরিত্র ও কৃতিত্ব	১১২
পাঠ- ৩ : বাংলায় খলজি শাসন.....	১১৫
পাঠ- ৪ : বাংলায় তুর্কি শাসন.....	১১৮
পাঠ- ৫ : বাংলায় বলবনি শাসন.....	১২০

ইউনিট ৫ : বাংলার ইতিহাস: স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.) ১২৩-১৫০

পাঠ- ১ : সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা, চরিত্র ও কৃতিত্ব	১২৪
পাঠ- ২ : ইলিয়াস শাহী বংশ: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব	১২৬
পাঠ- ৩ : গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ ও সিকান্দার শাহ	১২৯
পাঠ- ৪ : রাজা গণেশ ও পরবর্তী শাসন.....	১৩৩
পাঠ- ৫ : পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ.....	১৩৬
পাঠ- ৬ : বাংলায় হাবশি শাসন.....	১৩৯
পাঠ- ৭ : হোসেন শাহী বংশ: আলাউদ্দিন হোসেন শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৪১
পাঠ- ৮ : বাংলায় হোসেন শাহী বংশের অবদান.....	১৪৪
পাঠ- ৯ : সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৪৭

ইউনিট ৬ : বাংলার ইতিহাস: আফগান ও মুঘল আমল (১৫৩৮-১৭০৭ খ্রি.) ১৫১-১৬৮

পাঠ- ১ : বাংলায় কররানী শাসন	১৫২
পাঠ- ২ : বার ভূঁইয়া: পরিচয় ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক.....	১৫৫
পাঠ- ৩ : বার ভূঁইয়াদের পতন	১৫৮
পাঠ- ৪ : বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন	১৬২
পাঠ- ৫ : মুঘল শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৬৫

ইউনিট ৭ : বাংলার ইতিহাস: নবাবি আমল (১৭০৭-১৭৫৭ খ্রি.) ১৬৯-১৯২

পাঠ- ১ : মুর্শিদকুলি খান: নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা	১৭০
পাঠ- ২ : মুর্শিদকুলি খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৭৩
পাঠ- ৩ : সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৭৬
পাঠ- ৪ : আলীবর্দী খান: মারাঠা ও ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক	১৭৮
পাঠ- ৫ : নবাব সিরাজউদ্দৌলা	১৮১
পাঠ- ৬ : পলাশীর যুদ্ধ: ঘটনা, কারণ ও ফলাফল.....	১৮৩
পাঠ- ৭ : নবাবি শাসনের পতন	১৮৮
পাঠ- ৮ : নবাবি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১৯১

ইউনিট ৮ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) ১৯৩-২৫২

পাঠ- ১ : ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি: বঙ্গারের যুদ্ধ.....	১৯৪
পাঠ- ২ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ.....	১৯৭
পাঠ- ৩ : বাংলায় দ্বৈত শাসন	২০০
পাঠ- ৪ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	২০৪

পাঠ- ৫ :	১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ঘটনা, কারণ ও ফলাফল	২০৭
পাঠ- ৬ :	বাংলায় সংস্কার আন্দোলন	২১১
পাঠ- ৭ :	বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন	২১৬
পাঠ- ৮ :	সর্বভারতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রি.)	২২০
পাঠ- ৯ :	বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.): রদ ও প্রতিক্রিয়া	২২৩
পাঠ- ১০ :	সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (১৯০৬ খ্রি.)	২২৭
পাঠ- ১১ :	লক্ষ্মী চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)	২৩০
পাঠ- ১২ :	খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন.....	২৩৩
পাঠ- ১৩ :	বেঙ্গল প্যাক্ট.....	২৩৭
পাঠ- ১৪ :	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন.....	২৪০
পাঠ- ১৫ :	১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব	২৪৩
পাঠ- ১৬ :	১৯৪৭ সালের ভারত-বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান.....	২৪৬
পাঠ- ১৭ :	ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	২৪৯

ইউনিট ৯ : বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন ২৫৩-২৮৩

পাঠ- ১ :	ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ	২৫৪
পাঠ- ২ :	১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	২৫৭
পাঠ- ৩ :	পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি	২৬১
পাঠ- ৪ :	ছয়দফা কর্মসূচি	২৬৫
পাঠ- ৫ :	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ ও গুরুত্ব	২৬৯
পাঠ- ৬ :	১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন	২৭৩
পাঠ- ৭ :	মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়.....	২৭৮

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্স কোড: এইচএসসি-২৮৫৬(HSC-2856)

বিষয়ের নাম: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। যে দেশের জনগন যত বেশি শিক্ষিত সে দেশ তত বেশি উন্নত। জাতীয় জীবনের উন্নয়নে এবং প্রগতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একটি সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা। প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম বিন্যাস করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়টি একজন শিক্ষার্থীকে এর গৌরবোজ্জ্বল অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে। দেশের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় এরই প্রয়োগের দিকটি বিবেচনায় রেখে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়েও জ্ঞান, দক্ষতা এবং মানবতাবোধ সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা যায়। এছাড়া ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আত্মস্থ করে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি সচেতন জনশক্তি তৈরি করা। এই শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় আত্মস্থ করতে পারে, বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। মুখস্থ বিদ্যা নিরুৎসাহিত করে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার জন্য আরও জীবনঘনিষ্ঠ এবং অধ্যয়ন সহজতর ও আনন্দদায়ক করার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যেহেতু এখানে পাঠ্যপুস্তকটি একইসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে, তাই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। পুস্তকটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা, ইউনিট সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও ইউনিট বিভাজন (পাঠ) দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও সহজতর করার জন্য বিষয়বস্তু আলোচনার সময় মাঝে মাঝে ‘শিক্ষার্থীর কাজ’ (যা অ্যাক্টিভিটি নামে পরিচিত) সংযোজন করা হয়েছে। প্রয়োজন মারফিক মানচিত্র, ছবি, চার্ট ও টেবিল ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ শেষে ঐ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ ‘আলোচ্য বিষয়’ সংক্ষিপ্ত আকারে (সারসংক্ষেপ) দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী পাঠটি পুনরায় বালিয়ে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে উত্তরমালা দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকটি সুখপাঠ্য ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

ইউনিট

১

ভূমিকা:

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণে ভারতবর্ষকে উপ-মহাদেশ বলা হয়। অষ্টম শতাব্দির শুরুর দিকে এ উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। তৎকালীন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য ও সামাজিক বৈষম্য ছিল বেশ প্রকট। ভারতে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু- এই তিন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল ভারতীয়রা। শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি-সভ্যতায় সে যুগে ভারতে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ও হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব পাদদেশে অবস্থিত ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মহামিলন ঘটেছে। ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রধান দেশ হওয়ায় আরব মুসলমানরা ভারতকে 'হিন্দুস্তান' নামে আখ্যা দিয়েছিল এবং এ নামটি এখনো প্রচলিত।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ:

- পাঠ- ১ : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা
- পাঠ- ২ : মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
- পাঠ- ৩ : সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৪ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অভিযান: তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ
- পাঠ- ৫ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ-১.১

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও গ্রাম পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থার ধারণা পাবেন ও
- ভারতের তৎকালীন রাজনীতি ও স্বাধীন রাজ্যগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, উপারিক, বিষয় ও পঞ্চায়েত
-----	------------	---

ভূমিকা: প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল ভারতবর্ষ। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে প্রধানত: তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। এগুলো হল বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম। প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন প্রধান এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত। রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল আইন প্রণয়ন, ক্ষমতার বন্টন, শাসন পরিচালনা এবং সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের চূড়ান্ত এখতিয়ার। রাজা হর্ষবর্ধন (মৃত্যু ৬৪৫খ্রি.) এর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যময় অবস্থা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুসলিম বিজয়ের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সময় ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন ও সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের ঐক্য ও সংহতির মূলে প্রবল আঘাত হানে।

ধর্মীয় ও প্রশাসনিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্ম হিসেবে পরিণত হয়। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তারা সকলেই হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ও শাসনকার্যে তাদের অধিকার ছিল একচেটিয়া। বৈশ্য ও শূদ্রগণ ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত এবং নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা ছিল অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণগণ ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বসর্বা ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে ধর্মীয় অসন্তোষ, অরাজকতা ও নৈরাজ্য চরম আকার ধারণ করে। সাম্প্রদায়িক কলহ ও ধর্মীয় কোন্দল মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে বংশানুক্রমিকভাবে ভারতবর্ষের রাজা নিযুক্ত হতেন। রাজকুমারীগণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। রাজার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। তিনি আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ন্যায় বিচারের উৎস এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি রাজধর্মের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রীগণ রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। তবে রাজা তাঁদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। এ সময় সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক প্রধানকে বলা হত ‘উপারিক’। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল প্রদেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা রাজার আদেশকে কার্যকরী করা এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা। প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলাকে বলা হত ‘বিষয়’। জেলার শাসনকর্তা বিষয়পতি নামে অভিহিত হতেন। দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসন ব্যবস্থা মোড়ল বা পঞ্চায়েত কর্তৃক সম্পাদিত হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ। এ দেশের মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। অভিজাত ও উঁচু শ্রেণির অধিকাংশ লোক বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের বিবরণ অনুযায়ী তিনটি মূখ্য উৎস থেকে রাষ্ট্রের আয় ছিল: ক) ভূমি রাজস্ব, খ) সামন্ত প্রভু ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত কর, এবং গ) আবগারী ও বাণিজ্য শুল্ক। পরবর্তীতে এদেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। গুজরাট ও বাংলা কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিভিন্ন পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হতে থাকে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল বলে এদেশে সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরম

বিকাশ ঘটেছিল। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে পঞ্চম শতাব্দির শুরুতে ভারতবর্ষের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মগধের লোকেরা ধনী ও সমৃদ্ধশালী ছিল। পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দিতেও ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত ও নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। এদেশের অতুল ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী বণিকগণ যেমন এদেশে বারবার এসেছেন আবার বিদেশী আক্রমণকারীগণও এ দেশ বার বার লুণ্ঠন করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস চালিয়েছেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারটি বর্ণ স্তরে বিভক্ত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আর বৈশ্য ও শূদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। শূদ্রদের সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত। জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর ছিল। জনসাধারণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করতে পছন্দ করত। ব্রাহ্মণরা শিক্ষা, ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও কখনো কখনো যুদ্ধ বিগ্রহে নিয়োজিত থাকতো। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহ, বৈশ্যরা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শূদ্রগণ কৃষিকাজ ও সাধারণ কাজ কর্ম করত। বর্ণপ্রথার কারণে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ছিল। সমাজে বহু বিবাহ, সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। নারীরা অন্তঃপুরে জীবন যাপন করতেন। তাদের ব্যক্তি স্বাভাব্য ছিল না। দাসপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও অভিজাত শ্রেণির মেয়েরা উদার শিক্ষা লাভ করত। তারা শাসন ক্ষেত্রে ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করত। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রভূত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় ভারতীয়গণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সে যুগে ভারতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ভারতের স্বনামধন্য বল্লভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, বারানসী প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। মালব ও আজমীরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের চর্চা করা হত। সে যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা:

আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও কনৌজ

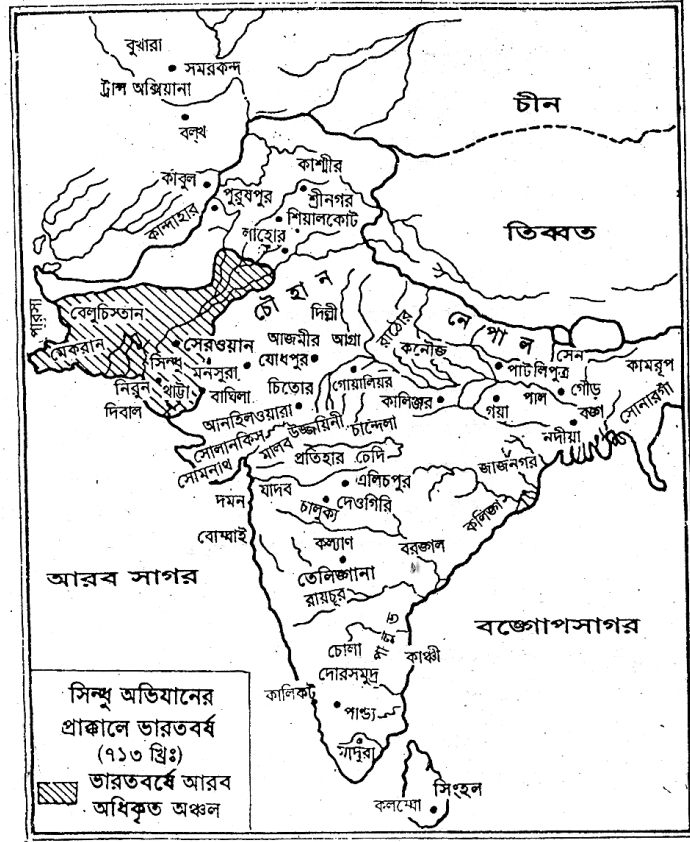
মৌর্য বংশের শাসনামল থেকেই আফগানিস্তান ছিল ভারতের একটি অংশ। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এটিকে হিন্দুশাহী রাজ্য বলে অভিহিত করেন। সপ্তম শতাব্দিতে কর্কট রাজবংশীয় দুর্লভ বর্ধনের অধীনে কাশ্মীর ছিল উত্তর ভারতের অপর একটি স্বাধীন রাজ্য। বিজেতা, বিদ্যোৎসাহী ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ছিলেন কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর। তিনি কনৌজ, কামরূপ, কলিঙ্গ ও গুজরাট জয় করেন বলে জানা যায়। কর্কট বংশের অপর একজন শাসক জয়পীড় গৌড় ও কনৌজের নৃপতিদের পরাজিত করেন। অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকে কনৌজ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হত। উত্তর-ভারতের অন্যতম পরাক্রমশালী রাজা যশোবর্মণ কনৌজের হৃত গৌরব ও আধিপত্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি গৌড় জয় করে এর রাজাকে হত্যা করেন এবং কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সহায়তায় তিব্বত অভিযান করেন। তিনি চীনে দূত প্রেরণ করেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন। যশোবর্মণ, সিন্ধুরাজ দাহিরের সমসাময়িক ছিলেন। অতঃপর অষ্টম শতকের প্রথম দিকে কনৌজে গুরজর-প্রতিহার রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু ও মালব-দিল্লি ও আজমীর

সপ্তম শতকে সিন্ধু ছিল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভূক্ত। পরবর্তীতে ‘চাচ’ নামক সিন্ধুর জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিন্ধুতে স্বাধীন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। চাচের পুত্র রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ইমাদউদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ সালে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রতিহার রাজপুত্রদের দ্বারা শাসিত মালব ছিল উত্তর-ভারতের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। উজ্জয়িনী ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। দ্বাদশ শতকে মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে দিল্লি ও আজমীরে শক্তিশালী চৌহান বংশীয় রাজপুত্রগণ রাজত্ব করত। এ বংশের শাসক বিশালদেব চৌহান প্রতিহার বংশের নিকট থেকে দিল্লি দখল করেন। রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে তারা একটি বিশাল রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এ বংশের নৃপতি পৃথ্বীরাজের সাথে মুহাম্মদ ঘোরির পর পর দু’বার সংঘর্ষ হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১১৯২ খ্রি. পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলে চৌহান বংশের অবসান হয়।

গুজরাট, আসাম ও নেপাল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে গুজরাট ছিল গুরজর প্রতীহার বংশের অধীনে। অতঃপর তাদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করে চালুক্য ও ভাগেলা বংশ পর্যায়ক্রমে গুজরাট শাসন করে। নবম শতাব্দীতে চান্দেলা বংশ বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। শেষ রাজা গন্ড ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদের নিকট পরাজিত হন। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটি রাজ্য হল আসাম। এটি হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। এ সময় রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার স্বাধীন নৃপতি। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এই শাসকের মৃত্যুর পর বাংলায় মারাত্মক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নেপাল সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের অপর একটি স্বাধীন রাজ্য। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সাথে নেপালের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।



মানচিত্র: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ

	শিক্ষার্থীর কাজ	উত্তর-পশ্চিম ভারতের এলাকাগুলো চিহ্নিত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুন।
--	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বেশ উন্নত ছিল। তবে রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাও ছিল বেশ গোলযোগপূর্ণ। ভারতে এ সময় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ ঘটেছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা। তিনি শাসন ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও প্রদেশ থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রশাসনিক ইউনিট ছিল। তৎকালীন ভারতের সার্বিক অবস্থা মুসলিম বিজয় অভিযানের অনুকূলে ছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছিলেন?
ক) দুর্লভ বর্ধন খ) ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় গ) কণিষ্ক ঘ) চানক্য
- চৌহান বংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে তরাইনের যুদ্ধ দুটি সংঘটিত হয়?
ক) রাজাশূদ্র খ) রাজা দুর্লভ বর্ধন গ) রাজা দাহির ঘ) পৃথ্বীরাজ
- প্রাক-মুসলিম ভারতের কোন স্থানে উন্নত চিত্র ও স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন ছিল?
ক) গুজরাট খ) কলকাতা গ) অজন্তা-ইলোরা ঘ) দাক্ষিণাত্য



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

রাজা মাইকেল সাম্রাজ্য পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে সমাজ পরিচালনায় রাজার কোন ভূমিকা ছিল না। শুধু তাই নয় ধর্মীয় কাজে ও সমাজ পরিচালনায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। সাধারণ ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা ছিল অস্পৃশ্য।

- | | |
|---|---|
| ক. প্রাক-মুসলিম ভারতের প্রাদেশিক প্রধানকে কী বলা হতো? | ১ |
| খ. তখনকার হিন্দু সমাজ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে আপনার পঠিত ভারতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি তুলে ধরুন? | ৪ |

পাঠ-১.২

মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুহাম্মদ বিন-কাশিমের সৈন্য বাহিনীর সিন্ধু ও মুলতান বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন ও
- সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

দেবল বন্দর, 'বালিস্ত', রণকৌশল ও জহরব্রত



ভূমিকা: আরব বণিকগণ ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করতো। আরবে ইসলামের আবির্ভাবের পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। আরব নাবিকদের অনেকেই এ উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে-সাদীও হয়। ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দি পর ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। উমাইয়া বংশের খলিফা প্রথম ওয়ালিদ তখন আরব জাহানের খলিফা। তাঁর অধীনে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজের নির্দেশে মুসলমানগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে। এরপর পর্যায়ক্রমে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু অভিযানের কারণসমূহ

তৎকালীন ভারতের সিন্ধু ও মুলতানের রাজা ছিলেন দাহির। আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন প্রথম ওয়ালিদ। আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ইরাক প্রদেশের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সিন্ধু ও মুলতানের সাথে আরব শাসনের সাধারণ সীমান্ত ছিল। নানা কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও রাজা দাহিরের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। এ কারণে হাজ্জাজ ভারতের সিন্ধু জয় করার জন্য তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইমাদউদ্দিন মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে এক বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ: সিন্ধু বিজয়ের পরোক্ষ কারণসমূহের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ এবং প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে ছিল জলদস্যুদের দ্বারা আরব বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ

ভারত ধন-ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লাভ করা। রাজা দাহিরের রাজ্য ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত অভিন্ন হওয়ায় দুই রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই মতানৈক্য ও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো এবং সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই থাকত। হাজ্জাজ ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক। আইনের শাসন এড়িয়ে হাজ্জাজের অঞ্চল থেকে অনেক অপরাধী রাজা দাহিরের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সকল কারণে রাজনৈতিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই সময় সিন্ধুতে চলছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। দাহির ছিলেন অত্যাচারী শাসক। নিম্নশ্রেণির লোকেরা ছিল অত্যাচারিত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সুতরাং এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাজ্জাজ সিন্ধু জয় করে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। ভারতে ইসলাম প্রচার করাও হাজ্জাজের একটি উদ্দেশ্য ছিল।



মুহাম্মদ বিন-কাশিম

জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন

অষ্টম শতকের শুরুতে বেশ কয়েকজন আরব বণিক শ্রীলংকায় (তৎকালীন সিংহল) প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীলংকার রাজা মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে তাদের মৃতদেহ, পরিবার-পরিজন ও অর্থসামগ্রীসহ আটটি জাহাজে বোঝাই করে প্রেরণ

করেন। সাথে খলিফা এবং হাজ্জাজের জন্য কিছু উপহারও ছিল। সিন্ধুর বন্দর দেবলের (করাচির সন্নিকটে) কাছে এ সকল জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি করেন। কিন্তু দাহির বলে পাঠান যে, জলদস্যুদের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে হাজ্জাজের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। হাজ্জাজ এতে খুবই রেগে যান। তিনি দাহিরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে সিন্ধু অভিযানের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেন।

সিন্ধু অভিযানের ঘটনা

ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ সিন্ধু বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দু'টি অভিযান পাঠালেন। কিন্তু দু'টি অভিযানই ব্যর্থ হল। এতে হাজ্জাজ ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তৃতীয় অভিযান পাঠালেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন-কাসিমকে। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বয়স তখন মাত্র ১৭ (সতেরো) বছর। আগের দু'টি অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবার হাজ্জাজ ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেন। মুহম্মদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল প্রায় ৬০০০ পদাতিক, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৩০০০ তীরন্দাজ এবং ৩০০০ ভারবাহী পশু। তরুণ সেনানায়ক ছিলেন অসীম মনোবলের অধিকারী। নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলীই তাঁর ছিল। মুহম্মদ মাকরানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেন। মাকরানের শাসকের সাথে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। মাকরানের শাসক মুহম্মদকে আরও একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। রাজা দাহিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জাঠ ও মেওয়াট গণ মুসলমানদের পক্ষে যোগ দেয়। হাজ্জাজ জলপথেও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য একদল সৈন্য পাঠান। এছাড়া 'বলিস্ত' নামক একপ্রকার যন্ত্রও হাজ্জাজ পাঠিয়েছিলেন। বলিস্ত ছিল এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে ভারী পাথর দূরে নিক্ষেপ করে আঘাত করা সম্ভব ছিল।

মুহম্মদ বিন-কাসিম প্রথমেই দেবল বন্দর অবরোধ করেন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান সেনানায়ক। দেবলের প্রধান মন্দিরের চূড়ায় একটি লাল নিশান উড়ানো ছিল। তিনি বলিস্ত দিয়ে পাথর ছুড়ে নিশানটি ধ্বংস করে ফেলেন। এতে দেবলের সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল মন্দিরের চূড়ায় যতক্ষণ নিশান উড়বে ততক্ষণ বাহিরের কোন শত্রু দেবল দখল করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ দেবল রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালান। তাঁরা অসীম সাহসে যুদ্ধ করলেও শেষে মুসলমানদের উন্নত রণকৌশলের কাছে পরাজিত হলো। মুসলমানদের দখলে এলো দেবল বন্দর। দেবল দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধু নদের তীর ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে নীরুন, সিওয়ান ও সিসাম শহরগুলো একের পর এক জয় করলেন। এগুলো দখল করতে তাঁকে তেমন কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু রাওয়ার দুর্গ দখলের ব্যাপারে মুহম্মদ বিন-কাসিমকে প্রচণ্ড বাঁধার মুখে পড়তে হয়। এখানে রাজা দাহির এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটান। মুহম্মদ বিন-কাসিম নৌকার সেতু তৈরি করে সিন্ধু নদ পার হন। অতঃপর দাহিরের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাজা দাহির বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুতে সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সবাই পালিয়ে যায়। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে দাহিরের বিধবা পত্নী রাণীবাসী দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুর্গ রক্ষা করা যাবেনা ভেবে তিনি অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীদের নিয়ে আশ্রয় ছাড়া দেন। শত্রুর হাতে অপমানিত হওয়ার ভয়ে এভাবে মৃত্যুকে বেছে নেয়ার রীতি তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ছিল; একে হজরব্রত বলা হতো। রাওয়ার দুর্গ দখলের পর মুহম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণবাদ অধিকার করেন। এরপর সিন্ধুর রাজধানী আলোর দুর্গের পতন ঘটে। আলোর জয় করে তিনি সিন্ধু অঞ্চলে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। এরপর মুহম্মদ বিন-কাসিম আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে মুলতান জয় করেন। মুলতানের পথে তিনি রাভী নদীর তীরে অবস্থিত উচ্চ দখল করেন। মুলতান দখল করতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মুলতান রক্ষার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে স্থানীয় যোদ্ধারা প্রায় দু'মাস মুলতান দুর্গ রক্ষায় সক্ষম হয়। অবশেষে তাদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে মুহম্মদ বিন-কাসিম মুলতান দখল করতে সক্ষম হন। মুলতান দখলের মধ্য দিয়ে রাজা দাহিরের রাজ্যের পুরোটাই মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ৭১২ থেকে ৭১৫ পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সিন্ধু-মুলতানে তিনি মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যু হয়। পরবর্তী খলিফা সোলায়মান আল ওয়ালিদের আস্থাভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রতি বিরূপ আচরণ শুরু করেন এবং তিনি মুহম্মদ বিন-কাসিমকে দামেস্কে যেতে নির্দেশ পাঠান। সেখানে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারেই

তাঁর মৃত্যু হয়। মুহম্মদ বিন-কাসিমের অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর বিজয় অভিযান সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষত এ কারণেই মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেছেন, “ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি একটি নিষ্ফল বিজয়।” কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর এই মন্তব্যকে সমর্থন করলেও কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।

রাজনৈতিক ফলাফল

একথা সত্য যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলে এ বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। আরবরা সিন্ধু অঞ্চলে এক উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং কেউ কেউ স্থানীয় রমণীও বিয়ে করেন। এভাবে ভারতে স্থায়ী মুসলমান বসতি গড়ে ওঠে। তারা রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে। আরব বংশধর ও হিন্দুগণ দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় সুলতান মাহমুদকে বারবার ভারত অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিল। সুলতান মাহমুদের পর মুহম্মদ ঘোরি ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তবে মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয়কে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিন্ধু বিজয়ের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল লক্ষ্যণীয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার কারণে তারা ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জাঠ ও মেওয়াটগণ মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই বিজয়ের ফলে আরব সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় এর ফলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূর প্রসারী হয়। ফলে দু’পক্ষই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে আরবগণ গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমীয় এবং পারসিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। তারা এ সকল সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধন করে। মুসলমানগণ যখন ভারতে আসে তখন তারা ছিল এই সমন্বিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী। ভারতীয়রা দর্শন, সাহিত্য, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলে ভাবের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ ঘটে। আব্বাসীয় যুগের খলিফাগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে ‘সিন্দহিন্দ’ নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। খলিফা মনসুরের আমন্ত্রণে কয়েকজন ভারতীয় পন্ডিত বাগদাদ যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে যান জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত ‘সিন্ধান্ত’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি। আরবীয় পন্ডিতগণ এটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় ‘সিন্দহিন্দ’। ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবগণ গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত ‘চরক’ ও ‘সুশ্রুত’ আরবিতে অনূদিত হয়। ‘পঞ্চতন্ত্রের’ হিতোপদেশ আরবিতে অনূদিত হয়ে আরব ভূখণ্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।



শিক্ষার্থীর কাজ

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী-ব্যাখ্যা করুন।



সারসংক্ষেপ :

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় তাঁর অনুমতি নিয়ে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহম্মদ বিন-কাসিমের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সিন্ধু বিজয় করেন। এছাড়া দেবল, নীরুন, সিওয়ান, সিসাম, সিন্ধুর রাজধানী আলোর দুর্গ এবং মুলতান মুসলমানদের দখলে আসে। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সিন্ধু বিজয় পরবর্তী মুসলিম অভিযানকে সফল করে তুলেছিল। ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা ইসলামের সংস্পর্শে এসে বহুলাংশে হ্রাস পায়। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামি ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যে উভয় সভ্যতা লাভবান হয়। মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া ভারতে সুফীবাদেরও উন্মেষ ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন—

ক. আবদুল মালিক খ. প্রথম ওয়ালিদ গ. হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ ঘ. হারুন-অর-রশীদ

২। মুসলমানদের বিজয়ের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন—

ক. রাজা দাহির খ. রাজা হর্ষবর্ধন গ. রাজা পরশুরাম ঘ. রাজা লক্ষ্মণসেন

৩। জলদস্যুগণ যে বন্দরের কাছে ৮টি আরব জাহাজ লুণ্ঠ করে তার নাম—

ক. বোম্বাই খ. মাদ্রাজ গ. দেবল ঘ. সুরাট



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

আরব নাবিকদের অনেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে-সাদী হয়। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় একশ' বছর পর ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামি ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যে উভয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়।

- | | |
|--|---|
| ক. কোন মুসলিম বীর প্রথম ভারত আক্রমণ করেন? | ১ |
| খ. মুহম্মদ বিন-কাসিম এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় দেশের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে বিবরণ দিন। | ৩ |
| ঘ. “ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান”-ব্যাখ্যা করুন। | ৪ |

পাঠ-১.৩

সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ◆ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের বিভিন্ন কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও অভিযান প্রতিহতের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- ◆ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পর্যায় ক্রমিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

গজনি, ধনরত্ন, মুলতান ও রাজন্যবর্গ ও সোমনাথ মন্দির



ভূমিকা: সুলতান মাহমুদের অভিযানের কারণ

সুলতান মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু অভিযানের প্রায় তিনশ বছর পর গজনির সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেন। গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলগুগীন। আলগুগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা গজনির আমির সবুজগীনের পুত্র ছিলেন সুলতান মাহমুদ। এ রাজবংশটি ইসলামের ইতিহাসে ‘গজনি রাজবংশ’ নামে পরিচিত। সবুজগীনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইল সিংহাসনে বসেন। ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আমির-এর পরিবর্তে সুলতান উপাধি ধারণ করেন। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে ‘ইয়ামিন-উদ-দৌলা’ ও ‘আমিন-উল-মিল্লাত’ খেতাবে ভূষিত করেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সতেরো বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযানের কারণগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয়।

রাজনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদের পিতা সবুজগীনের সময় থেকে গজনির সাথে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের বিরোধ চলছিল। পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী রাজ্যের রাজা জয়পাল সবুজগীনের শত্রু হওয়ায় সুলতান মাহমুদ জয়পালের সাথে শত্রুতা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। ভারতের অনেক রাজা জয়পালের সাথে মাহমুদ বিরোধী জোটে যোগদান করেন। সুতরাং মাহমুদকে তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করতে হয়। আবার ভারতের কোন কোন রাজা মাহমুদের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। এতে তাঁদের প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রতি বৈরী আচরণ শুরু করেন। মিত্রবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও মাহমুদকে ভারতে অভিযান করতে হয়। পরাজিত রাজারা মাহমুদের সাথে সন্ধি করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেয়ে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন। বিদ্রোহী রাজাদের সন্ধির শর্ত পালনে বাধ্য করার জন্যও মাহমুদকে অভিযান করতে হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদ রাজধানী গজনিকে তিলোত্তোমা নগরীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী-গুণী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। তিনি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এসবের জন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। গজনির রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাঁর চাহিদার যোগান দিতে পারছিল না। তাই তিনি বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। তখন ভারত ছিল সম্পদশালী দেশ। এখানকার বিভিন্ন রাজ্যের কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ অকাতরে মন্দিরগুলোতে দান করতো। মন্দিরকে নিরাপদ বিবেচনা করে অনেক সময় রাজারাও তাতে ধনরত্ন সংরক্ষণ করতেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সুলতান মাহমুদের নজর ভারতের উপর পড়ে। এজন্য তিনি প্রায় প্রতি বছর ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ভারত থেকে প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। প্রফেসর হাবিব, প্রফেসর নাজিম ও হেইগ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলে মাহমুদকে লুণ্ঠনকারী বা অর্থলোলুপ তস্কর বলা যাবে না। কারণ ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য তিনি সে অর্থ ব্যবহার করেন নি।

সামরিক উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এ সকল অঞ্চল ছিল সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ সমরবিদ হিসেবে তাঁর অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও সমরনিপুণ। তিনি বুঝতে পারেন এ সকল অঞ্চল জয় করতে তাঁকে খুব একটা বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করে তাঁর সামরিক উদ্দেশ্য হাসিল করেছিলেন।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পশ্চাতে কোন কোন ঐতিহাসিক ধর্মীয় উদ্দেশ্যও কার্যকর ছিল বলে মনে করেন। তাঁদের মতে তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন মাহমুদের যুগে শাসকগণ ইসলাম প্রচার করা তেমন কর্তব্য বলে মনে করতেন না। তিনি ভারত অভিযানে এসে কোন বিধর্মীকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি। এছাড়া মাহমুদ হিন্দু মন্দির দখল করেছেন ধর্ম বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং অর্থ পাওয়ার আশায়। এ সকল মন্দির ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদে পূর্ণ। সর্বোপরি তাঁর সেনাবাহিনীতে হিন্দু সৈন্যের উপস্থিতি তার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যকে অনুমোদন করে না।

সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযান

সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাত্র ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে তিনি খাইবার গিরিপথের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। পিতা সবুজগীনের সময় থেকেই জয়পালের সাথে তাদের শত্রুতা চলে আসছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। তিনি কয়েকজন পুত্র-পৌত্রসহ সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দী এবং কয়েকটি শর্তে তিনি মুক্তি পান। নিজ পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্যের ভার ছেড়ে দেন তিনি। অতঃপর তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জয়পালের পৌত্র সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় 'নওশাহ'। ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভীরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বিজয় রায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিজয় রায় পলায়ন করেন। মুসলমান সৈন্যগণ তাঁর পিছু ধাওয়া করে। পলায়ন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন। ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন। মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন আবুল ফতেহ দাউদ। দাউদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মাহমুদ জয়পালের পুত্র নওশাহকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান গজনীতে ফিরে যাওয়া মাত্র নওশাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। সুলতান তাঁকে দমন করার জন্য আবার অভিযান পাঠান। এটি ছিল ভারতে তাঁর পঞ্চম অভিযান। নওশাহ পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ ভারতে তাঁর ষষ্ঠ অভিযান পরিচালনা করলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আনন্দপাল পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলোর রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লি ও আজমীরের রাজাগণ এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া দেন। হিন্দু রমণীগণ তাদের গায়ের গহনা ও অন্যান্য সৈন্য ও অর্থ দিয়ে আনন্দপালকে সাহায্য করেন। আনন্দপাল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাহমুদের মুখোমুখি হন। ওয়াইহিন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আনন্দপালের সম্মিলিত বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ আনন্দপালের হাতী ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। এতে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হয়ে পাঞ্জাব থেকে প্রচুর ধন-রত্ন গজনীতে নিয়ে যান। পাঞ্জাবকে তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

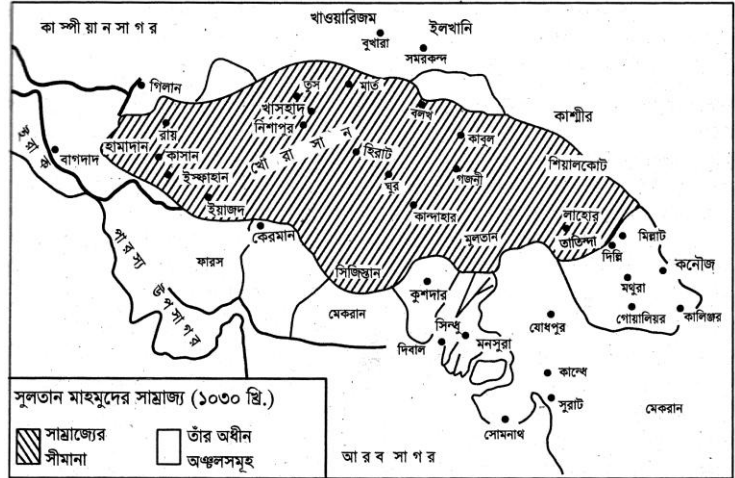
মাহমুদ ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিলোচনপালের রাজধানী নন্দনা আক্রমণ করেন। এটি ছিল তাঁর নবম অভিযান। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরে পলায়ন করেন। কাশ্মীরের রাজা তুঙ্গ তাঁকে আশ্রয় দেন। মাহমুদের সাথে তাঁদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও মাহমুদ জয়ী হন। সুলতান গজনীতে ফিরে গেলে ত্রিলোচনপাল পাঞ্জাবে ফিরে আসেন। তিনি শিবলী পাহাড়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। বুন্দেলখন্ডের রাজা বিদ্যাধরের সাথে তিনি মৈত্রী চুক্তি করেন। মাহমুদ তাঁকে এই চুক্তি ভঙ্গ করতে বলেন। কিন্তু ত্রিলোচন এতে রাজী হন নি। মাহমুদ তাই তার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। এবার মাহমুদ পাঞ্জাব দখল করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিজের একজন আমিরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুলতান মাহমুদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয় কনৌজের বিরুদ্ধে। এটি ছিল তাঁর ১২তম অভিযান। কনৌজ ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। রাজ্যপাল ছিলেন সে-সময় কনৌজের রাজা। মাহমুদ ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি শক্তিশালী

বাহিনী নিয়ে গজনি ত্যাগ করেন এবং পথে তিনি বারগ জয় করেন। বারগের রাজা তাঁর অনুচরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর সুলতান কনৌজের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছালে রাজ্যপাল সামান্য বাঁধা দানের পর আত্মসমর্পণ করেন। রাজ্যপাল সুলতানের নিকট নতি স্বীকার করায় ভারতের অন্যান্য রাজারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। কালিঞ্জরের রাজা গোন্ড তাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁরা একজোট হয়ে কনৌজ আক্রমণ ও রাজ্যপালকে তাঁরা হত্যা করেন। রাজ্যপালের পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয়। এতে মাহমুদ খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি গোন্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারত অভিযান করেন। গোন্ড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এটি ছিল তাঁর ১৩তম অভিযান। মাহমুদের ১৪ তম ও ১৫ তম অভিযান পরিচালিত হয় যথাক্রমে গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে। উভয় অভিযানে তিনি সফল হন। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর থেকে তিনি প্রচুর ধন-রত্ন প্রাপ্ত হন। উভয় রাজ্যের রাজা বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য হয়। মাহমুদের অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ষোড়শ অভিযান।

কাথিওয়ারের বর্তমান গুজরাট এর সোমনাথ মন্দিরের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই মন্দিরে বিপুল পরিমাণ ধন-রত্ন সঞ্চিত ছিল। ধনী ব্যক্তিগণ এবং রাজ্যবর্গ এই মন্দিরে অর্থ হিসেবে সোনা-রূপা দান করতেন। তাছাড়া অনেকেই মন্দিরকে নিরাপদ স্থান মনে করে সেখানে তাদের ব্যক্তিগত ধন-রত্নও গচ্ছিত রাখতেন। হিন্দুগণ সোমনাথ মন্দিরকে অজেয় মনে করতো। মাহমুদ সোমনাথ জয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে গজনি থেকে বের হন। মুলতান ও রাজস্থান হয়ে তিনি সোমনাথ মন্দিরের দ্বারে এসে পৌঁছেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা সোমনাথ মন্দির রক্ষার জন্য বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু ১০২৬ খ্রি. মাহমুদ তাদের সকল বাঁধা ছিন্ন করেন। এই মন্দির থেকে তিনি বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই সম্পদের মধ্যে ছিল দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা, প্রচুর অলঙ্কার ও মণি-মানিক্য। মাহমুদের সোমনাথ বিজয় ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম দুঃসাহসিক অভিযান। ভারতে সুলতান মাহমুদের শেষ অভিযান পরিচালিত হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। মাহমুদ যখন সোমনাথ অভিযান শেষে গজনি ফিরছিলেন তখন জাঠগণ চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে উত্যক্ত করে। তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য মাহমুদ ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই শেষ অভিযান পরিচালনা করে জাঠদের পরাজিত করেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান নিষ্ফল ছিল না। মাহমুদের এই অভিযানের ফলাফলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই তিন ভাগে পাওয়া যায়।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রভাব সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনুভূত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই অভিযানের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুলতান মাহমুদ অভিযান করেছেন, জয়লাভ করেছেন এবং ধন-সম্পদ নিয়ে নিজের রাজ্য গজনিতে ফিরে গিয়েছেন। শুধু পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং কোন স্থায়ী সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন নি। কয়েকজন রাজা অবশ্য তাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই সকল রাজা কর প্রদান বন্ধ করেন। পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান সফল হয় নি। তবে এ কথাও সত্য যে, সুলতান মাহমুদের বিজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। সুলতান মাহমুদের বার বার আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নি। সুলতান মাহমুদের



মানচিত্র: সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য

অভিযানের সময় ভারতীয় সামরিক শক্তি ও রণকৌশল মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও রণকৌশলের তুলনায় যে কত দুর্বল তা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। মাহমুদ ভারতের সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, দুর্গ ও মন্দির আক্রমণ করেন ধন-রত্ন লাভ করার জন্য। এই জন্য এ সকল লক্ষ্যস্থল থেকে তিনি প্রচুর সম্পদ নিজ রাজধানী গজনিতে নিয়ে যান। এর ফলে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে গজনি অর্জন করে আর্থিক সমৃদ্ধি। ভারতের আর্থিক দুর্বলতা তার সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল ছিল লক্ষ্যনীয়। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও লক্ষ্যনীয়। সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ মন্তব্য করেন, “তিনিই প্রথম ভারতের মধ্যস্থলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন”। সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীর সাথে অনেক সুফি-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে আসেন। সুফি-দরবেশগণ ভারতে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে বহু ভারতীয় ইসলাম গ্রহণ করে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি চিন্তা-চেতনার সমন্বয় সাধন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত আল-বিরুনী দশ বছর ভারতে অবস্থান করেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট ভারতের দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এর ফল স্বরূপ তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কিতাব-উল-হিন্দ’ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। মাহমুদের অভিযানের ফলে ইসলামি সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটে।



সুলতান মাহমুদ



সোমনাথ মন্দির

সুলতান মাহমুদ: চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ও বিজেতা হিসেবে সুলতান মাহমুদের অবস্থান ইতিহাসের পাতায় এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। সুলতান মাহমুদ অনেকবার বিজয়ী হয়ে জীবনের শেষ বেলায় অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৬০ বছর বয়সে গজনিতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি প্রায় ৩২ বছর রাজত্ব করেন। সুলতান মাহমুদকে তাঁর যুগের প্রতিভাবান শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ ছিলেন একজন সুনিপুন সৈনিক। তাঁর দেহে ছিল যেমন শক্তি, তেমনি মনেও ছিল অফুরন্ত সাহস।

সুলতান মাহমুদ সকল অভিযানেই বিজয়ী হয়েছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে ‘বড় মাপের দিগ্বিজয়ী বীর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈশ্বর টোপ্লয়ার মতে, সুলতান মাহমুদ ছিলেন ‘গজনির নেপোলিয়ন’। সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব, তীক্ষ্ণতা এবং সামরিক সংগঠক হিসেবে সুলতান মাহমুদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আরব, আফগান, ইরান, তুরান, হিন্দু ও তুর্কিদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীর ক্ষিপ্রতা, সাহসিকতা ও অপরাজেয়তা তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচায়ক। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, একটি পার্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে শুধু শক্তির বলে বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। আরব-তুর্কি শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি হিরাত, কাবুল ও গজনির সীমা অতিক্রম করে সমগ্র আফগানিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক গিবনের মতে, সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ভারতবর্ষের আবহাওয়ার কথা ভেবে তিনি অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে অভিযান আরম্ভ করতেন এবং শীতকালে গিরিপথ, মরুভূমি এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল অতিক্রম করে তিন মাসের মধ্যে গাঙ্গেয় অঞ্চলে পৌঁছে যেতেন। আর শত্রু নিধন ও ধন-সম্পদ লাভ করে গ্রীষ্মের পূর্বেই গজনিতে প্রত্যাবর্তন করতেন। সুলতান মাহমুদ শিল্প,

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা আল বিরুনী ছিলেন, সুলতান মাহমুদের দরবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে গ্রন্থটি আল বিরুনীকে ইতিহাসে বিখ্যাত করে রেখেছে তা হলো ‘কিতাব-উল-হিন্দ’। ঈশ্বরী প্রসাদ সুলতান মাহমুদের যুগকে কবিতার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। ঐ যুগের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবুল কাশেম ফেরদৌসী। প্রাচ্যের হোমার নামে খ্যাত এ কবি সুলতান মাহমুদের অনুরোধে জগদ্বিখ্যাত ‘শাহনামা’ মহাকাব্য রচনা করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।



সারসংক্ষেপ:

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতে অনুভূত হয়। পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সুলতান মাহমুদের এ বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। সুলতান মাহমুদের বার বার আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গ সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নি। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে ‘বড় মাপের দ্বিগ্বিজয়ী বীর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুলতান মাহমুদ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল বিরুনীর বিখ্যাত ‘কিতাব-উল-হিন্দ’ ও কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর জগদ্বিখ্যাত ‘শাহনামা’ মহাকাব্য।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মাহমুদ কোন দেশের সুলতান ছিলেন—

ক. আফগানিস্তান

খ. গজনী

গ. ঘোর

ঘ. কাবুল

২। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমুদকে কি উপাধিতে ভূষিত করেন?

ক. সুলতান

খ. সুলতান-উস-সালাতিন

গ. ইয়ামিন-উদ-দৌলা

ঘ. সুলতান-উল-আজম

৩। সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান করেন—

ক. ১২ বার

খ. ১৪ বার

গ. ১৬ বার

ঘ. ১৭ বার



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ফারহানা ইসলাম তার দাদার নিকট ইসলামের ইতিহাসের একজন সুলতানের ১৭ বার ভারত আক্রমণের গল্প শুনছিল। পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর ভারত অভিযান ব্যর্থ হয়। তবে এ কথাও সত্য যে, বিজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

ক. গজনবীর অবস্থান কোথায়?

১

খ. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানের সাথে পাঠ্য বইয়ের ভারত আক্রমণের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ লিখুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন স্থান থেকে সুলতান সবচেয়ে বেশী সম্পদ আহরণ করেছিলেন লিখুন।

৪

পাঠ-১.৪

মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অভিযান: তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুহম্মদ ঘোরি কর্তৃক বিজিত এলাকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- ঘোরির ভারত অভিযানের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ABC ✓	মূখ্য শব্দ	মুলতান, পৃথ্বীরাজ, কনৌজ, বারাণসী ও আজমির
----------	------------	--

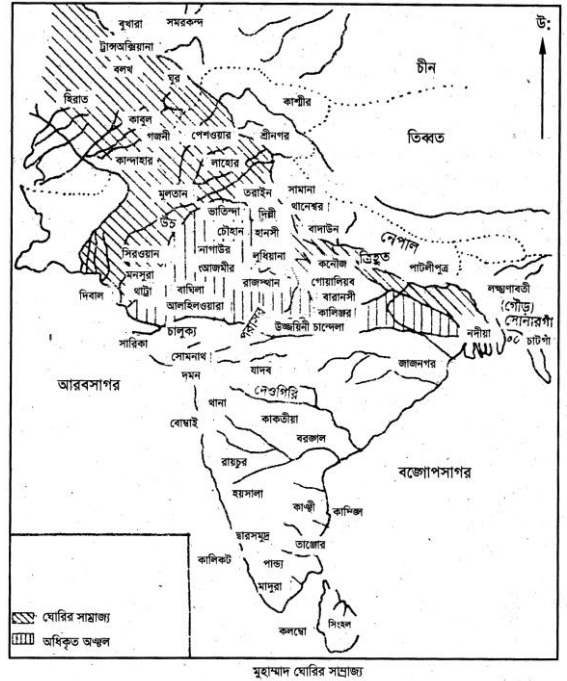
ভূমিকা: গজনির শাসনকর্তা হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরি ভারতে অনেকগুলো অভিযান প্রেরণ করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরি কারমাতি শিয়াদের পরাজিত করে মুলতান দখল করেন। তিনি অন্য শিয়া সম্প্রদায় সুমরাদের কাছ থেকে সিন্ধু নিজ হস্তগত করেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার আক্রমণ করেন। কিন্তু গুজরাট রাজের হাতে তিনি পরাজিত হন। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন। এরপর কয়েক বছর তিনি পাঞ্জাবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। অবশেষে গজনি বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব ঘোর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ। ঘোর নামক স্থানে জন্মে ছিলেন বলে ভারতের ইতিহাসে তিনি মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরি নামে পরিচিত। তিনি দিল্লি ও এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন। ফলে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রি.)

মুহম্মদ ঘোরি পাঞ্জাব দখল করলে ভারতের হিন্দু রাজাগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ১১৮৯ খ্রি. ভাতিন্দা দখল করে মুহম্মদ ঘোরি চৌহান রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে দিল্লি ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান একটি শক্তি-সংঘ গঠন করেন। পৃথ্বীরাজের আশ্রানে অনেক রাজা সাড়া দেন। তবে কনৌজের রাজা জয়চাঁদের সাথে পৃথ্বীরাজের সুসম্পর্ক ছিল না। পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ পাননি। তিনি ছদ্মবেশে এসে সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন। মুহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইন প্রান্তরে মিলিত পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে মুহম্মদ ঘোরির প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির বাহিনী পরাজিত হলে তিনি নিজে আহত হন ও পলায়ন করেন। এটি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত ছিল।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২ খ্রি.)

মুহম্মদ ঘোরি দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও পর বৎসর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবার ভারত আক্রমণ করেন। এবারও পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে তরাইনের প্রান্তরে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেই বহু সৈন্য নিহত হয়। এবার পৃথ্বীরাজের বাহিনী পরাজিত হলে পৃথ্বীরাজ পলায়ন করেন। কিন্তু সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সিরসুতী নামক স্থানে তিনি ধরা পড়লে তাঁকে হত্যা করা হয়। আজমীর



মানচিত্র: মুহম্মদ ঘোরির বিজিত অঞ্চলসমূহ

পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে আসে। উন্নত রণকৌশল এবং সৈন্য পরিচালনার দক্ষতায় ঘোরির সৈন্যবাহিনী রাজপুতদের নির্মমভাবে পরাজিত করে। অতঃপর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুহম্মদ ঘোরি গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। কুতুবউদ্দিন আইবক মুসলিম বিজয়কে আরও সম্প্রসারিত করে হান্সী, মীরাট, দিল্লি ও কুইলী দখল করেন। জয়চাঁদের সাথে মোকাবেলার জন্য মুহম্মদ ঘোরি ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভারতে আসেন। কুতুবউদ্দিন তাঁর সাথে যোগ দেন। কনৌজ মুহম্মদ ঘোরির দখলে আসে। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বারাণসী অধিকার করে গজনী ফিরে যান। তাঁর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন গোয়ালিয়র জয় করেন। এরপর কুতুবউদ্দিন ভীমকে পরাজিত করে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার দখল করেন। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কালিঞ্জরও কুতুবউদ্দিনের অধিকারে আসে। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ঝাড়খণ্ড এর মধ্য দিয়ে বখতিয়ার খলজী সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া ও বঙ্গ পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়। তখন মুহম্মদ ঘোরি ঘোরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম উপাধি গ্রহণ করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযান পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযানগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফলের তুলনায় বেশী ছিল। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধু সিন্ধু ও মুলতানে সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত অভিযান করলেও এর তাৎক্ষণিক কোন রাজনৈতিক ফলাফল ছিল না। তাঁর অভিযানগুলো ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযান এদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করার পর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।



মুহম্মদ ঘোরির মুদ্রা

তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তিনি আজমীর পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভি.এ. স্মিথ বলেন, “এই যুদ্ধ হিন্দুস্থানের উপর মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যের নিশ্চয়তা দান করেছিল।” বিজিত এলাকা শাসন করার জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবককে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কুতুবউদ্দিনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। বস্তুত কুতুবউদ্দিনের বিজয় ছিল তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির বিজয়েরই যৌক্তিক পরিণতি। কনৌজ ও বারাণসী জয় করে মুহম্মদ ঘোরি ভারতে মুসলিম বিজয়কে সুসংহত করেন। এরপর বখতিয়ার খলজির বিহার ও বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজন পড়লো নতুন প্রশাসনের। মুহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ভারতীয় প্রশাসনিক রীতির সাথে ইসলামি রীতির মিলন ঘটান। ফলে উদ্ভব ঘটে এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার। তিনি প্রশাসন স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের হাতে ন্যস্ত করেন। বিচার কাজ সম্পন্ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুসলমান কাজী ও ফৌজদার নিযুক্ত হন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরির অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন এবং ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মন্ডব, মাদ্রাসা ও খানকাহ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথা মুসলিম শাসনে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয়। ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে। এক নতুন ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। এভাবেই মুহম্মদ ঘোরির বিজয় অভিযান ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা করে।



শিক্ষার্থীর কাজ

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক বিজিত রাজ্যগুলোর একটি মানচিত্র অংকন করুন।



সারসংক্ষেপ:

ঘোর রাজ্যের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব জয়ের জন্য যুদ্ধ করেন ভারতের হিন্দু রাজশক্তিগুলোর সাথে। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হলেও তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। পলায়নকালে পৃথ্বীরাজ নিহত হলে আজমীর তাঁর দখলে আসে। তিনি কুতুবউদ্দিনকে ভারতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দিন দিল্লিসহ ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করেন। কনৌজের জয়চাঁদকে পরাজিত করে মুহম্মদ ঘোরি কনৌজ ও বারাণসী দখল করেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইয়ের মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘোরি ঘোরের সুলতান হন। এই অভিযানের ফলে এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। তরাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির নিকট পরাজিত হয়।

ক. মুহম্মদ বিন-কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ গ. পৃথ্বীরাজের বাহিনী ঘ. কুতুবউদ্দীন আইবেক

২। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় –

ক. ১০৯২ খ্রি. খ. ১১৯০ খ্রি. গ. ১০৯০ খ্রি. ঘ. ১১৯২ খ্রি.

৩। মুইজ উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন?

ক. ১২০৪ খ্রি. খ. ১২০৬ খ্রি. গ. ১২০৫ খ্রি. ঘ. ১২০৭ খ্রি.



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

রায়হান বিশ্বাস মাগুরা জেলার একজন বিখ্যাত কুস্তিগির ছিলেন। প্রথম বছর কুস্তি খেলতে শ্রীপুর উপজেলা থেকে মাগুরা জেলায় আসেন। এ বছর তিনি কুস্তি খেলার প্রথম ধাপেই বাদ পড়ে যান। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। এরপরের বছর তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এলেন এবং জেলার সেরা কুস্তি খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন।

- | | |
|---|---|
| ক. ঘোর রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? | ১ |
| খ. মুহম্মদ ঘোরি কোন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন লিখুন। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রায়হান বিশ্বাসের ন্যায় মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানে সফলতার ব্যাখ্যা দিন। | ৩ |
| ঘ. পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযান অপেক্ষা মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানের ফলাফল ব্যাপক ছিল-বর্ণনা করুন। | ৪ |

পাঠ-১.৫

মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুহম্মদ ঘোরি কর্তৃক বিজিত এলাকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	মুলতান, আনহিলওয়ার, কনৌজ ও বারাণসী
--	------------	------------------------------------



ভূমিকা: মুহম্মদ ঘোরি ভারতে অনেকগুলো অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি দিল্লি ও এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন এবং ভারতে সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অর্জন করেন। মুহম্মদ ঘুরি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে একজন শিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর নিকট শত্রু-মিত্র সকলেই ন্যায় বিচার পেতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন। মানুষ হিসেবে তিনি আকর্ষণীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয়, ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও দানশীলতা ইত্যাদি। সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল তার চরিত্রের উজ্জ্বল দিক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিনের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ইতিহাসে তাঁকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছে। এজন্যই হয়তো ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিঙ্গী তাকে আল্লাহভীরু, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জন সুলতান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দয়ালু ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব

মুহম্মদ ঘোরি ছিলেন একজন বিজেতা। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি সুচতুর ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। কোন ব্যর্থতা কোনদিন তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর মনোবল ও সংগঠনীয় শক্তি ছিল অসাধারণ। অন্য ধর্মের লোকের প্রতিও তিনি সদয় আচরণ করতেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তিনি যে আনুগত্য দেখান ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তবিরল। তিনি দয়ালু ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর স্থান ইতিহাসে অস্মান। মুহম্মদ ঘোরির অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয় এবং ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে।

রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা:

মুহম্মদ ঘোরি ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। লক্ষ্য ছিল তাঁর ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার। ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও কোনো পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে তিনি লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্থির ছিলেন। এজন্য তিনি বাঙলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ইতিহাসে পরিচিতি হন নি বরং একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যা তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

সমরনেতা ও সংগঠক:

মুহম্মদ ঘোরি একজন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসবিদ এ বি এম হবীবুল্লাহর মতে, “শীর দরিয়া থেকে যমুনা পর্যন্ত সামরিক অভিযান তাঁর সমর কুশলতা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রমাণ করে। মুহম্মদ ঘোরি অসংখ্য তুর্কী ক্রীতদাসদের যুদ্ধকৌশল ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান এবং প্রতিভা অবৈষণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত নেতা ও সংগঠক। তিনি সে সময়ের খ্যাতিমান সমরবিদ কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইয়ালদুজ ও তুখিল বেগের ন্যায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তাঁর বিজয়াভিযান ও রাজ্য গঠনে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। মুহম্মদ ঘোরি তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিনিধি ও শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন বলেই ভারতে তথাকথিত দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী সাম্রাজ্য আর রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল।

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক:

মুহম্মদ ঘোরির প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতে ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ বি এম হবীবুল্লাহ বলেন, “সমরক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততার কারণে তিনি (মুহম্মদ ঘোরি) হয়তো শিল্প-সংস্কৃতির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি জ্ঞানচর্চার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।” তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিল খ্যাতনামা দার্শনিক ফখরুদ্দিন আল রাজী, কবি নিজামী, সাহিত্যিক মুবারক শাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ। কুতুব উদ্দিন আইবেক আজমিরে ‘আড়াই দিনকা বোপড়া মসজিদ ও দিল্লিতে ‘কুওয়াতুল ইসলাম’ নামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এতে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সূচনা করেন।

মুহম্মদ ঘোরি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি ভারতের ধনসম্পদ হস্তগত করেই থেমে যান নি বরং সেখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ দিক থেকে মুহম্মদ ঘোরি সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা অধিকতর কুশলী ছিলেন। তিনি সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হন। ভারতীয় ইতিহাসের খ্যাতিমান শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শিল্প, সংস্কৃতিচর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা মুহম্মদ ঘোরি অনেক বেশী সফল ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।



আড়াই দিনকা বোপড়া মসজিদ

✂	শিক্ষার্থীর কাজ মুহাম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন
---	---

সারসংক্ষেপ : ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘোরি সুলতান হন। তাঁর অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মন্ডব, মাদ্রাসা ও খানকাহ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয় এবং ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত মুসলিম প্রাধান্যের আওতায় আসে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে ভারতে—

- i. বাণিজ্যিক পথ সুগম হয়
- ii. রাজপুতদের প্রাধান্য খর্ব হয়
- iii. মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

২। কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন —

ক. সেনাপতি

খ. কাঠুরিয়া

গ. শ্রমিক

ঘ. দিনমজুর

৩। ‘শাহনামা’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. আল বিরুনী

খ. আবুল কাশেম ফেরদৌসি

গ. আবুল ফজল

ঘ. আবুল হাসান ফিদা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান সাহেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান। ভারতে অবস্থিত কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত ‘কুতুব মিনার’ পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনিও দেশীয় স্থাপত্য ও শিল্প কলা নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দান করবেন। এত করে স্থানীয় শিল্পকলার বিকাশে সহায়তা করা হল। এই শিল্পকলা একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে কাজ করে বহুদিন পর্যন্ত।

ক. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত?

১

খ. মুহাম্মদ ঘোরি কোন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন লিখুন।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্থাপত্য নিদর্শনের বর্ণনা দিন।

৩

ঘ. পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযান অপেক্ষা মুহাম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানের ফলাফল ব্যাপক ছিল-ব্যাখ্যা লিখুন।

৪



উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১. খ	২. ঘ	৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১. খ	২. গ	৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১. গ	২. ঘ	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১. গ	২. ক	৩. খ

দিল্লির সুলতানি আমল: (১২০৪-১৫২৬ খ্রি.)

ইউনিট
২

ভূমিকা

ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসে ‘প্রাচীন যুগ’ বলা হয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান ও আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকে ভারতে ‘মধ্যযুগের’ সূচনা কাল শুরু এবং মুঘল শাসনের শেষ পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতানি শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ, বলবন এবং তাঁদের বংশধরেরা শাসন করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ কুতুবউদ্দিন আইবেককে দাসত্ব থেকে মুক্তির ছাড়পত্র, রাজদণ্ড এবং সুলতান উপাধি প্রদান করেন। প্রথম জীবনে কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ এবং বলবন এই তিনজনই ছিলেন ক্রীতদাস। এক সময় এঁদের সবাইকে একই বংশের লোক বলে মনে করা হতো এবং তাঁদের বংশকে বলা হতো ‘দাস বংশ’। কারণ সিংহাসনে বসার আগে তাঁরা সবাই দাসত্ব থেকে মুক্তি পান। কিন্তু আসলে এঁরা তিনজনই ছিলেন আলাদা আলাদা বংশের লোক। তাঁদের বংশধরগণ শাসকের সন্তান-সন্ততি হিসেবেই সিংহাসনে বসেন। তাঁরা না ছিলেন একই বংশের, না কেউ সিংহাসনে বসার সময় দাস ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বংশকে ‘দাস বংশ’ বলা সমীচীন নয়। তাঁদের শাসনামল ছিল দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগ। আর তাঁরা সবাই ছিলেন জাতিতে তুর্কি। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাই তাঁদের শাসনামলকে “প্রাথমিক যুগে দিল্লির তুর্কি সালতানাত” (The Early Turkish Sultanate of Delhi) বলে অভিহিত করেছেন। এই যুগে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দিল্লির তুর্কি সালতানাত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগ ছিল সংহতির যুগ। এই যুগেই দিল্লি সালতানাতের শাসন-কাঠামো গড়ে ওঠে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- পাঠ- ১ : সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক
- পাঠ- ২ : সুলতান ইলতুৎমিশ
- পাঠ- ৩ : সুলতান ইলতুৎমিশের চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৪ : সুলতান রাজিয়া
- পাঠ- ৫ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন
- পাঠ- ৬ : আলাউদ্দীন খলজী: রাজ্য বিজয়
- পাঠ- ৭ : আলাউদ্দিন খলজির শাসন সংস্কার ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৮ : তুঘলক বংশ ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক
- পাঠ- ৯ : ফিরোজ শাহ তুঘলক
- পাঠ- ১০ : সৈয়দ বংশ
- পাঠ- ১১ : লোদী বংশ
- পাঠ- ১২ : সুলতানি আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস
- পাঠ- ১৩ : দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ ও ফলাফল

পাঠ-২.১

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক ‘দাস বংশ’ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের রাজ্য শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

আইবেক, সুলতান, দাস বংশ, কুতুব মিনার, চৌগান ও লাখ-বক্স



ভূমিকা

১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ভারতে পাঁচটি রাজবংশ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই পাঁচটি রাজবংশের অন্যতম হলো দিল্লির তথাকথিত দাস বংশ (So-called Slave Dynasty)। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রি.) জয়লাভকারী মুহাজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ ঘোরি নামে সমধিক পরিচিত মুহম্মদ বিন সামের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তৎকালীন ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা এবং উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ তরাইনের যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি এবং মুহাম্মদ ঘোরির আস্থাভাজন কুতুবউদ্দিন আইবেককে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সনদ ও ‘সুলতান’ উপাধি প্রদান করেন। এভাবে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের নেতৃত্বে ভারতে স্বাধীন সুলতানদের শাসনের সূচনা হয়। কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইসলামের ইতিহাসে তথাকথিত ‘দাস বংশ’ নামে সমধিক পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে এই বংশ ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে। উল্লিখিত সময়ে (৮৪ বছর) সর্বমোট ১১ জন সুলতান শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বংশের প্রথম সুলতান ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক এবং সর্বশেষ সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন কাইমুরস (১২৮৯-১২৯০ খ্রি.)।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.):

প্রাথমিক জীবন

দিল্লি সালতানাতের প্রথম সুলতান ভারতীয় উপমহাদেশের তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক তুর্কিস্থানের বাসিন্দা ছিলেন। তুর্কি ভাষায় ‘আইবেক’ শব্দের অর্থ ‘চন্দ্রদেবতা’। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তুর্কিস্থানের আইবেক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার কারণে কুতুবউদ্দিনকে ‘আইবেক’ বলা হতো। ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী, কুতুবউদ্দিনের জীবন শুরু হয়েছিল ক্রীতদাস হিসেবে। শৈশবে জনৈক ক্রীতদাস ব্যবসায়ী কুতুবউদ্দিনকে পারস্যের নিশাপুরের তৎকালীন কাজি ফখরুদ্দিন আব্দুল আজিজ কুফীর নিকট বিক্রয় করেন। কাজি তাঁর নিজ পুত্রদের সাথে কুতুবউদ্দিনকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কুতুবউদ্দিন ধর্মশাস্ত্র এবং সামরিক বিদ্যা পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু অচিরেই কুতুবউদ্দিনের পুণরায় ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। কাজি ফখরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ কুতুবউদ্দিনকে এক দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে দেয়। এ ব্যবসায়ী তাঁকে অন্য অনেকের সাথে গজনীতে নিয়ে আসেন। গজনির শাসক মুহাম্মদ ঘোরি কুতুবউদ্দিনকে ক্রয় করেন। বাহ্যিকভাবে অসুন্দর হলেও বিপুল প্রতিভার অধিকারী কুতুবউদ্দিন আইবেক স্বীয় মেধা, মনন, পরিশ্রম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বলে অল্প দিনের মধ্যে মালিক মুহাম্মদ ঘোরির অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরি কুতুবউদ্দিনের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে রাজকীয় অশ্বশালার প্রধান বা ‘আমির-ই-আকুর’ পদে নিয়োগ করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কুতুবউদ্দিন আইবেক সুলতান ঘোরির পক্ষে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক

ভারতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের শাসনামলকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো ১১৯২-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ ১২০৬-১২১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম ভাগে তিনি মুহাম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি হিসেবে এবং দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসন করেন। মুহাম্মদ ঘোরি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯২) পর ভারত ত্যাগ করার প্রাক্কালে বিজিত অঞ্চলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান

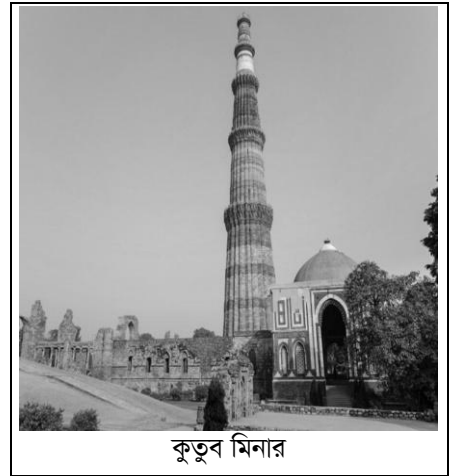
পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের ওপর সমর্পণ করেন। কুতুবউদ্দিন ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই হানসী, মীরাট, কোল, দিল্লি ও রণথম্বোর বিজয় সম্পন্ন করে লাহোর থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করেন। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের হাতে পরাজিত হয়। কুতুবউদ্দিন গুজরাটের শাসক দ্বিতীয় ভীমদেবকে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। ফলে গুজরাট দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন কনৌজ, বদাউন এবং চাঁদোয়ার অধিকার করতে সক্ষম হন। তিনি কালিঙ্গর ও মাহোবা ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে জয় করেন। ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের এক বিশাল অঞ্চলে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক

ঘোর বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং ভারত বিজেতা মুহাম্মদ ঘোরি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ঝিলাম জেলার সন্নিগটে এক গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। মুহাম্মদ ঘোরির সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে কিরমান ও সাদকুয়ানের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, উচ ও মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন অন্যতম। মুহাম্মদ ঘোরি মৃত্যুর পূর্বে কুতুবউদ্দিন আইবেককে বিজিত ভারত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে তাঁকে ‘মালিক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। মুহাম্মদ ঘোরির ঘুর রাজ্যের উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেককে দাসত্ব থেকে মুক্তির সনদ প্রদান করেন এবং ‘সুলতান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরে কুতুবউদ্দিন আইবেকের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। লাহোর জামে মসজিদে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং তাঁর নামেই মুদ্রা প্রচলন করা হয়। মুহাম্মদ ঘোরির কর্তৃক বিজিত ভারতীয় অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সার্বিক নিরাপত্তা বিধান এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে ঘোরির অনুচরবর্গের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি উচ ও মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে তাঁর ভগ্নীর বিবাহ দেন। স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দেন বদাউনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিশের সাথে। আর নিজেই বিবাহ করেন কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের কন্যাকে। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ক্ষমতা গ্রহণ করে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে দৃষ্টি দেন। আইবেকের শৃঙ্গর তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পারস্য ও মধ্য এশিয়া বিজয়ী খাওয়ারিজম শাহ কর্তৃক গজনি থেকে বিতাড়িত হয়ে ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব দখল করেন। আইবেক তাজউদ্দিনকে প্রথমে পাঞ্জাব থেকে এবং পরে গজনি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মাত্র ৪০ দিন পর তাজউদ্দিন পুনরায় গজনি দখল করে আইবেককে বিতাড়িত করেন। চান্দেলা রাজপুতগণ কালিঙ্গরে, গহরওয়ালাগণ ফরুখাবাদ ও বদাউনের কিছু অংশে এবং গোয়ালিয়রের প্রতিহারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলে কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের সেই চেষ্টাকে অতি সহজেই নস্যাত করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে বাংলায় আলী মর্দান খলজী কর্তৃক মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নিহত হওয়ার পর খলজী মালিকদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অর্ন্তদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কুতুবউদ্দিন আলী মর্দানকে লখনৌতি রাজ্য হিসেবে পরিচিত বাংলার শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। মাত্র চার বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর ১২১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লাহোরে চৌগান বা পোলো খেলার সময় হঠাৎ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং শেষ পর্যন্ত সেই আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সমাধি বর্তমানে লাহোরে অবস্থিত।

কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

দিল্লির দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, স্বাধীনচেতা এবং প্রজাকল্যাণকর শাসক। আইবেক রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন। চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য তিনি সমসাময়িককালে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী, প্রতিভাবান এবং উদার চিন্তের অধিকারী। ঐতিহাসিক এ বি এম হবিবুল্লাহ বলেন, “অসাধারণ কর্মশক্তি এবং উঁচুদের প্রতিভাবান সামরিক নেতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন তুর্কিদের অসম সাহসিকতার সাথে পারসিক মার্জিত রুচি ও উদারতার সমন্বয় সাধন করেন।” ঐতিহাসিক হাসান নিজামী কুতুবউদ্দিন আইবেকের উন্নত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দানশীলতার দিক থেকে কুতুবউদ্দিনকে হাতেম তাই-এর সাথে তুলনা করা হয়। তিনি প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করতেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে ‘লাখ বক্স’ উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণু এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। হাসান নিজামী গ্রীত হয়ে তাঁর বিখ্যাত



কুতুব মিনার

গ্রন্থটি (তাজুল মাসির) সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের যথেষ্ট সমাদর ছিল।

স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে ‘কুয়াত-উল-ইসলাম’ এবং আজমীরে ‘আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া’ মসজিদ নির্মাণ করেন। রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের মহিমা বিশ্বজনীনভাবে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে সুলতান কুতুবউদ্দিন ধর্মবেত্তা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে ‘কুতুব মিনার’ নির্মাণ আরম্ভ করেন। তবে তিনি এর নির্মাণ শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর জামাতা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) শাসনামলে মিনারটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	কুতুব মিনার সম্পর্কে একটি টিকা লিখুন।
---	-----------------	---------------------------------------

	সারসংক্ষেপ :
---	--------------

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সামান্য একজন দাস হিসেবে জীবনের প্রথম পর্ব শুরু করলেও নিজস্ব মেধা, মনন, বুদ্ধিবৃত্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বশে আনার অভিপ্রায়ে তিনি তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান এবং প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে তিনি একজন আদর্শ শাসকের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ফখরউদ্দিন কাজি ছিলেন—
ক. নিশাপুরের খ. ঘোরের গ. গজনীর ঘ. লাহোরের
- মুহম্মদ ঘোরি কুতুবউদ্দিনকে ক্রয় করেন—
ক. লাহোরে খ. ঘোরগ গ. গজনীতে ঘ. নিশাপুরে
- মুহম্মদ ঘোরি সুলতান হন—
ক. ১১৯২ সালে খ. ১২০৩ সালে গ. ১২০৬ সালে ঘ. ১২১০ সালে
- স্বাধীন দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়—
ক. ১২০০ সালে খ. ১২০২ সালে গ. ১২০৪ সালে ঘ. ১২০৬ সালে

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাফিসা পরিবারের সাথে দিল্লিতে বেড়াতে গেল। দিল্লির কুতুবমিনার দেখে সে তার পিতার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চায়। পিতা বললেন “এ মিনার তৈরি করেছেন লাখবকস নামে খ্যাত একজন সুলতান। তার মাধ্যমে দিল্লিতে স্থায়ী মুসলমান শাসন শুরু হয়। অসাধারণ কর্মশক্তি ও সামরিক যোগ্যতা ছাড়াও প্রজাকল্যাণ ও স্থাপত্য শিল্পে অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১. দিল্লি সালতানাতের প্রথম সুলতান কে? ১
২. লাখবকস বলা হয় কাকে এবং কেন? ২
৩. উদ্দীপকের আলোকে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উল্লেখপূর্বক স্বাধীন সুলতান হিসেবে মূল্যায়ন করুন। ৩
৪. একজন তেজস্বী, প্রতিভাবান ও প্রজাকল্যাণকর শাসক হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেকের অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-২.২

সুলতান ইলতুথমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শামসুদ্দিন ইলতুথমিশের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- শামসুদ্দিন ইলতুথমিশ কিভাবে দিল্লি সালতানাতের সংহতিসাধন করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ABC ✓	মূখ্য শব্দ	জুধ, মোঙ্গল, খাওয়ারিজম, ইকতা, রূপাইয়া, কুতুব মিনার ও বন্দেগান-ই-চেহেলগান
----------	------------	--



প্রাথমিক জীবন

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুথমিশ ছিলেন ইলবারী তুর্কি গোষ্ঠীর লোক। তিনি যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান, তেমনই ছিলেন দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী। এজন্য তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে একজন দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই দাস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বোখারার প্রধান কাজী তাঁকে কিনে নেন। কাজী ইলতুথমিশের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কাজীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ইলতুথমিশকে বিক্রি করে দেয়। ইলতুথমিশের নতুন মনিব হলেন জালালউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি। এই জালালের কাছ থেকে কুতুবউদ্দিন আইবেক ইলতুথমিশকে উচ্চমূল্যে কিনে নেন। ইলতুথমিশের গুণে কুতুবউদ্দিন অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে মুক্ত করে বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং নিজ কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ দিল্লির সুলতান হন। কুতুবউদ্দিনের সাথে আরাম শাহের সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আরাম শাহ ছিলেন কুতুবউদ্দিনের পুত্র। কিন্তু মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, কুতুবউদ্দিনের কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। তাঁর শুধু তিন জন কন্যা ছিলেন বলে মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজলের মতে, আরাম শাহ ছিলেন কুতুবউদ্দিনের ভাই।

সিংহাসনারোহণ

আরাম শাহ শাসক হিসেবে একেবারেই অযোগ্য প্রমাণিত হন। দিল্লির আমিরগণ তাই কুতুবউদ্দিনের জামাতা ও বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুথমিশকে সুলতান পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। ইলতুথমিশ এতে রাজী হন। দিল্লির অদূরে আরাম শাহের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইলতুথমিশ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজকীয় উপাধি হয় সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুথমিশ। তিনি সিংহাসনে বসার পর গজনির শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ও সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। বাংলার শাসনকর্তা আলী মর্দান খলজীও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমিরদের মধ্যেও রেষারেষী ছিল। তাঁরা ছিলেন তিনভাগে বিভক্ত। মুহম্মদ ঘোরির আমলের আমিরগণ “মুইজ্জী আমির”, কুতুবউদ্দিনের আমলের আমিরগণ “কুতুবী আমির” এবং ইলতুথমিশের আমলের আমিরগণ “শামসী আমির” নামে অভিহিত হতেন। কুতুবী আমিরগণ ইলতুথমিশকে সমকক্ষ এবং মুইজ্জী আমিরগণ তাঁকে তাঁদের চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন বলে গণ্য করতেন। ইলতুথমিশ বিদ্রোহী আমিরদের জুধের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং নিজের অবস্থান মজবুত করেন। ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইয়ালদুজকে তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি কুবাচাকেও পরাজিত করেন। ঠিক এই সময় আর একটা ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হয়। মধ্য এশিয়া দিক থেকে। দিগ্বিজয়ী বীর চেঙ্গিস খান সমগ্র মধ্য এশিয়া এ সময় পদানত করেন। খাওয়ারিজমের শাহ তাঁর নিকট পরাজিত হন। শাহের পুত্র জালাল উদ্দিন ইলতুথমিশের কাছে আশ্রয় চান। ইলতুথমিশ তখন পড়েন উভয় সঙ্কটে। আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় না দিলে রীতি রক্ষা হয় না। অপরদিকে আশ্রয় দিলে চেঙ্গিসের কোপানলে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিলেন। তিনি জালালকে বলে পাঠালেন যে ভারতের আবহাওয়া তাঁর জন্য তেমন সুখকর হবে না, সুতরাং তিনি যেন অন্যত্র আশ্রয় খুঁজে নেন। বাধ্য হয়ে জালালকে ভারত ত্যাগ করতে হয়। তবে যাওয়ার আগে তিনি লাহোর, মুলতান ইত্যাদি অঞ্চল লুট করে যান। এতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হন ইলতুথমিশের শত্রু কুবাচা। জালালের পর পরই চেঙ্গিস ভারতের সিন্ধুতে এসে উপনীত হন। ইলতুথমিশ তাঁকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। এভাবে ইলতুথমিশের চতুর বুদ্ধিমত্তায় সমূহ বিপদ থেকে ভারত রক্ষা পেল। ইলতুথমিশ অতঃপর বাংলার দিকে নজর দেন। বাংলায় তখন গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর শাসন চলছিল। আলী মর্দানকে

পরাজিত ও নিহত করে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী ১২১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি “সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী” উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং ‘খুতবায়’ তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। এ সবই রাজকীয় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ নিজের ইওয়াজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ইওয়াজ বশ্যতা স্বীকার করে রেহাই পান। ইলতুৎমিশ তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। কিন্তু সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসা মাত্র ইওয়াজ খলজী দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তাঁকে দমন করার জন্য ইলতুৎমিশ তাঁর বড় ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে প্রেরণ করেন। ইওয়াজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১২২৭ খ্রি.)। বাংলার উপর দিল্লির কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যের পশ্চিম এলাকাও ইলতুৎমিশের নিয়ন্ত্রণে আসে। ইয়ালদুজের মৃত্যুর পর লাহোরের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকী ছিল সিন্ধু ও মুলতান। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে বাক্বারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সিন্ধু নদ পার হতে গিয়ে কুবাচা মারা যান। ফলে সিন্ধু ও মুলতানের উপরও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল্-মুনতাসিরের কাছ থেকে “সুলতান-উল-আজম” খেতাব সহ রাজহুত্র ও রাজকীয় পোশাক উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন। এতে তাঁর গৌরব অনেক বেড়ে যায়। নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে একে দমন করার পর ইলতুৎমিশ হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ দমনে মনোযোগ দেন। তিনি রণথম্বোর পুনর্দখল করেন। গোয়ালিয়রও তাঁর দখলে আসে। মালবের ভিলসা এবং উজ্জয়িনীও তিনি জয় করেন। ইলতুৎমিশ অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পঁচিশ বছর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসন করার পর ১২৩৬ খ্রি. তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।



ইলতুৎমিশের মুদ্রা

	শিক্ষার্থীর কাজ	ইলতুৎমিশের “সুলতান-উল-আজম” খেতাব প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করুন।
--	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
ইলতুৎমিশ দাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। নানা প্রভুর হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি কুতুবউদ্দিনের অধীনে আসেন। কুতুবউদ্দিন তাঁর গুণে মুগ্ধ হন। তাঁকে মুক্তি দিয়ে সুলতান তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেন এবং তাঁকে বদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ সুলতান হন। আমিরদের অনুরোধে অযোগ্য আরাম শাহকে পরাজিত করে ইলতুৎমিশ সিংহাসনে বসেন। তিনি নব গঠিত দিল্লি সালতানাতকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি ইয়ালদুজ, কুবাচা ও ইওয়াজের বিরোধিতা নির্মূল করেন। এর ফলে লাহোর, সিন্ধু-মুলতান এবং বাংলার উপর দিল্লির কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কৌশলে চেঙ্গিস খানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকেও ভারতকে রক্ষা করেন। বিদ্রোহী হিন্দু রাজাদের দমন করে তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইলতুৎমিশ লোক ছিলেন—

ক. ইলবারি তুর্কি গোষ্ঠির খ. খলজী তুর্কি গোষ্ঠির গ. পাঠান গোষ্ঠির ঘ. দাস গোষ্ঠির

২। কুতুবউদ্দিন ইলতুৎমিশকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন—

ক. গজনীর খ. লাহোরের গ. বদায়ুনের ঘ. মুলতানের

৩। ইলতুৎমিশের আমলের আমিরগণকে বলা হতো—

ক. মুইজ্জী আমির

খ. শামসী আমির

গ. কুত্বী আমির

ঘ. হিন্দুস্তানী আমির



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ইব্রাহীম খলিল ছিলেন চৌধুরী এন্ড গ্রুপ কোম্পানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। তিনি বাল্যকালে একজন দাস হিসেবে জীবন শুরু করলেও রফিক চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিকে তিনি সুপরিচিত করান। নিজ দক্ষতা ও মেধার জোরে তিনি কোম্পানির প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তার দক্ষতায় কোম্পানির সুনাম বহুগুন বৃদ্ধি পায়।

১. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
২. ইলতুৎমিশের জন্মস্থান কোথায় ছিল-লিখুন? ২
৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তির সাথে দিল্লি সালতানাতের যে শাসকের মিল রয়েছে মোঙ্গল আক্রমণের উল্লেখপূর্বক কূটনৈতিক শাসক হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করুন। ৩
৪. “ইলতুৎমিশ ছিলেন একজন দক্ষ শাসক” উক্তিটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করুন। ৪

পাঠ-২.৩

সুলতান ইলতুৎমিশের চরিত্র ও কৃতিত্ব (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

‘ইকতা’, জালোর, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী ও বদাউন



সুলতান ইলতুৎমিশের চরিত্র

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ আরাম শাহকে পরাজিত করে ত্রয়োদশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে দিল্লি সালতানাতের মামলুক বা দাস (তুর্কি) বংশের তৃতীয় শাসক হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতানের দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা এবং দৃঢ় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আউলিয়া বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজী এবং খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। দানশীলতার কারণে দাস (তুর্কি) বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ‘লাখ বকশ’ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যুগের মাপকাঠিতে দেখা যায় সুলতান ইলতুৎমিশ আইবেকের চেয়েও অধিকতর দানশীল ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উস-সিরাজ, সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের প্রশংসায় বলেন- “ইলতুৎমিশের ন্যায় এত ধার্মিক, দয়ালু, বিদ্যানুরাগী, ও দরবেশগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান দিল্লির সিংহাসনে আর কখনও আরোহণ করেননি।” সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিকগণ সুলতান ইলতুৎমিশকে “আল্লাহর বান্দাগণের সাহায্যকারী” এবং “আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক” প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর দুর্বল ও অকর্মণ্য আরাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। আরাম শাহের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও অযোগ্যতার কারণে রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আরাম শাহের শাসন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট দিল্লির অভিজাত আমির উমরাহদের আমন্ত্রণে কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা এবং বদাউনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিশ দিল্লির উপকণ্ঠে জুধ নামক স্থানে এক বিশাল বাহিনী সহকারে আরাম শাহকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ মুস্জী ও কুতুবী আমিরগণের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অযোধ্যা, বেনারস, বদাউন, সিউয়ালিক প্রভৃতি অঞ্চলের উপর স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গজনির শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পাঞ্জাব থেকে থানেশ্বর পর্যন্ত দখল করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

উচ ও মুলতানের শাসক নাসিরউদ্দিন কুবাচা লাহোর দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁকে পরাজিত করে লাহোর দখল করেন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্ম গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি সুলতান উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশের বশ্যতা স্বীকার করলেও গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুবরাজ নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বিদ্রোহী গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করে পিতা সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক বাংলার শাসক নিযুক্ত হন। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ বাংলা দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন হয়ে পড়ে। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে রণথম্বোর মান্দাওয়ার, জালোর, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, বদাউন, বেনারস, কনৌজ, দোয়াব ও অযোধ্যা দিল্লি সালতানাতের অধিভুক্ত করে উপমহাদেশে একটি সুদৃঢ় এবং প্রজাকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান কর্তৃক বিতাড়িত খাওয়ারিজমের শাহ জালালউদ্দিন সুলতান ইলতুৎমিশের নিকট

রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেও তিনি কৌশলে আশ্রয়দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। মধ্যযুগীয় একজন সুলতানি শাসকের এই কূটনৈতিক মেধার কারণেই এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশে মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

রাজ্যে বিদ্রোহ দমন এবং শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর সুলতান ইলতুৎমিশ সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষে প্রকৃত তুর্কি শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তনকারী সুলতান ইলতুৎমিশ। বলা হয় সুলতান ইলতুৎমিশ যে শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন তার উপর ভিত্তি করে খলজিদের আমলে এক সামরিক সাম্রাজ্যবাদের সৌধ গড়ে উঠে। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লিতে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দপ্তর স্থাপন করেন। রাজস্বব্যবস্থা ও অর্থ পরিদপ্তর পুনর্গঠনের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমগ্র রাজ্যকে কতগুলো ‘ইকতা’ বা প্রদেশে বিভক্ত করে ইকতাদারদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। প্রজাসাধারণ যাতে সহজে ন্যায় বিচারের জন্য সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এই লক্ষ্যে তিনি রাজদরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন। সুলতান ইলতুৎমিশ এক ধরনের রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন যা ‘তংকা’ নামে পরিচিত। সুলতান ইলতুৎমিশ জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ব্যক্তি, কবি এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠাপোষকতা প্রদান করতেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুব মিনার নির্মাণ শুরু করলেও তা সমাপ্ত করেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ। এছাড়াও তিনি শ্বশুর কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত দিল্লির ‘কুয়াত উল-ইসলাম মসজিদ’ এবং আজমীরের ‘আড়াইদিন-কা-ঝোপড়া’ মসজিদ এর সংস্কার সাধন করেন। ইলতুৎমিশ ভারতীয় উপমহাদেশে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তিনি ৪০ জন তুর্কি ক্রীতদাসের সমন্বয়ে ‘বন্দেগান-ই-চেহেলগান’ নামক চল্লিশ চক্রের শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করলেও নানা বিদ্রোহ ও প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে একে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ। তাই ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন যে, ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।



শিক্ষার্থীর কাজ

‘বন্দেগান-ই-চেহেলগান’ সম্পর্কে লিখুন।



সারসংক্ষেপ :

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ছিলেন অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। মুঙ্গিজি-কুতুবী আমিরদের ষড়যন্ত্র, তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের বিদ্রোহ এবং গিয়াসউদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রতিহত করে এবং মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাব্যতা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে কৌশলে রক্ষা করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের মার্জিত কূটনীতি, সাহিত্যের প্রতি উন্নত রুচিবোধ, দানশীলতা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথার্থই তাঁকে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইলতুৎমিশ ছিলেন—

ক. ইলবারী তুর্কি

খ. ইলবারী তুর্কি

গ. পাটান তুর্কি

ঘ. দাস গোষ্ঠীর

২। ইলতুৎমিশ বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে সুলতান-উল-আজম খেতাব পান—

ক. ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১২২১ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে

২। ইলতুৎমিশের আমলের আমিরগণকে বলা হতো—

ক. মুইজ্জী আমির

খ. শামসী আমির

গ. কুতুবী আমির

ঘ. হিন্দুস্তানী আমির



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:



- | | |
|---|---|
| ১. আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক উপাধিটি কার? | ১ |
| ২. নাসিরুদ্দিন কুবাচা কে ছিলেন? | ২ |
| ৩. দিল্লি সালতানাতের বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপনে উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করুন। | ৩ |
| ৪. “ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা” উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দিন। | ৪ |

পাঠ-২.৪

সুলতান রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রিঃ)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতান রাজিয়ার সিংহাসন লাভের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুলতান রাজিয়া কর্তৃক বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- সুলতান রাজিয়ার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

তাজিক আফগান, আমির-ই-আখুর, কারামিতা, আমির-ই-হাজিব ও কাইথল



সুলতান রাজিয়ার সিংহাসন লাভের প্রেক্ষাপট

১২২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিদ্রোহী শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজির বিদ্রোহ দমন করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ নাসির উদ্দিন মাহমুদ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। দূরদর্শী সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর সুযোগ্য কন্যা, বুদ্ধিমতী ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়ন অস্বীকার করে কতিপয় অভিজাত সুলতান পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে আরোহণে সহায়তা প্রদান করেন। কিন্তু রুকনউদ্দিন ফিরোজ ছিলেন অদক্ষ। রুকনউদ্দিনের দুঃশাসনে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে চরম অরাজক পরিস্থিতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় রানীমাতা শাহ তুরকান শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তথাপিও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতির প্রেক্ষাপটে দিল্লির অভিজাত শ্রেণি, আমির উমারাহগণ রুকনউদ্দিন ফিরোজ এবং রানীমাতা শাহ তুরকানকে দিল্লির উপকণ্ঠে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করে কারাগারে বন্দি করেন। এই ঘটনার পর আমির উমারাহগণ রাজিয়াকে দিল্লির সিংহাসনে আমন্ত্রণ জানান।

বিদ্রোহ দমন:

সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান রাজিয়া একটি সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন। সুদূর বাংলা প্রদেশ এবং উচ্চের শাসকগণও সুলতান রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, “লক্ষণাবতী হতে দেবল এবং ডামরিলা পর্যন্ত দেশের সকল মালিক ও আমিরগণ তাঁর আনুগত্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেন।” রাজিয়ার পূর্ববর্তী শাসকদের সময় প্রশাসনের সকল পদে তুর্কি আমির-উমারাহদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু প্রশাসন থেকে ক্রমান্বয়ে তুর্কি প্রভাব হ্রাস করার অভিপ্রায়ে সুলতান রাজিয়া তাজিক আফগানদের অন্তর্ভুক্ত হাবসী অনুচর জামালউদ্দিন ইয়াকুতকে ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে ‘আমির-ই-আখুর’ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। তুর্কি আমিরগণ এই নিয়োগে অসন্তুষ্ট হয়ে সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জুনাইদিও তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কারামিতা ও মুলাহিদ সম্প্রদায় নূরউদ্দিন নামক জনৈক তুর্কির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান রাজিয়া এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। আমির-ই-হাজিব আইতিগিনের নেতৃত্বে তুর্কি আমিরগণও ক্রমাগত বিরোধিতা করতে থাকে। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে রাজিয়া পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শাসনকর্তা কবির খানকে দমন করেন। ভাতিন্দার শাসনকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়া সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। সুলতান রাজিয়া এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আলতুনিয়ায় বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জামাল উদ্দিন ইয়াকুত নিহত হন এবং সুলতান রাজিয়া আলতুনিয়ার হাতে বন্দী হন। অন্যদিকে সুলতান রাজিয়ার বন্দিত্ব ও অনুপস্থিতির সুযোগে দিল্লির অভিজাত আমিরগণ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র মুইজউদ্দিন বাহরামকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। সুলতান রাজিয়া কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে আলতুনিয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং বন্দিদশা থেকে সহজে মুক্তি লাভ করেন। এরপর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আলতুনিয়া ও রাজিয়া উভয়ে বাহরামের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু দিল্লির সন্নিকটে মুইজউদ্দিন বাহরামের বাহিনীর হাতে এই সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাইথল নামক স্থানে জনৈক হিন্দু আততায়ীর হাতে সুলতান রাজিয়া ও তাঁর স্বামী ইখতিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া নিহত হন।

সুলতান রাজিয়ার চরিত্র ও কৃতিত্ব:

সুলতান রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমতী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতে আরোহণকারী প্রথম এবং একমাত্র নারী শাসক। তিনি সুলতানের পোশাক পরিধান করে প্রকাশ্যে রাজদরবারে আবির্ভূত হতেন। যুদ্ধের মাঠে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বারোহণেও সুলতান রাজিয়া ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সাময়িকভাবে হলেও তিনি দিল্লির আমির-উমরাহদের উপর স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুলতান রাজিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং মুদ্রায় নিজেকে ‘উমদাদ-উল-নিসওয়ান’ বলে অভিহিত করেন। সুলতান রাজিয়া ছিলেন সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বিদ্যান ব্যক্তির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিস্তার বর্ণনানুযায়ী সুলতান রাজিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও চমৎকার ভঙ্গিহকাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান-বুদ্ধিমতী, ন্যায়বতী মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, সুবিচারক, প্রজাগণের রক্ষাকারী সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন এবং রাজাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। প্রশাসনে তুর্কিদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করার মানসে সুলতান রাজিয়া বিভিন্ন উচ্চ পদে তাজিক আফগানদের নিয়োগ করেন। তিনি কারামিতা ও মুলাহিদ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। পাঞ্জাবের শাসকনকর্তা কবির খানকেও সুলতান রাজিয়া দমন করতে সক্ষম হন।

**শিক্ষার্থীর কাজ**

সুলতান রাজিয়ার চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ সম্পর্কে লিখুন।

**সারসংক্ষেপ :**

দিল্লি সালতানাতে ইতিহাসে যে সকল শাসক সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এবং পরে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন সুলতান রাজিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। পিতা ইলতুৎমিশ কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী আমির উমরাহদের দৌরাভ্যের কারণে তিনি সিংহাসনে উপবেশনে করতে পারেননি। পরবর্তীতে সিংহাসনে আরোহণের পর সুলতান রাজিয়া বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তিনি ভাতিন্দার শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়ার নিকট পরাজিত ও বন্দি হন। পরবর্তীতে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুঙ্গজ উদ্দিন বাহরামের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত রাজিয়া এবং তাঁর স্বামী আলতুনিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪****বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- সুলতান রাজিয়া ছিলেন-
ক. কুতুবউদ্দিনে কন্যা খ. ইলতুৎমিশের কন্যা গ. রুকনউদ্দিনে কন্যা ঘ. বাহরামের কন্যা
- সুলতান রাজিয়ার স্বামীর নাম-
ক. ইখতিয়ার উদ্দিন খ. আলতুনিয়া গ. ইখতিয়ার উদ্দিন মাহমুদ ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন বাহরাম
- রাজিয়ার শাসনামলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন-
ক. আমির খান খ. কবির খান গ. আমিন খান ঘ. মামুন খান

**চূড়ান্ত মূল্যায়ন****সৃজনশীল প্রশ্ন:**

“মধ্যযুগে নারীর ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনা সভায় সকল বক্তা দিল্লি সালতানাতে একজন সুলতান সম্পর্কে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে তিনিই একমাত্র নারী যিনি পিতার মনোনয়নক্রমে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অন্যান্য পুরুষ শাসকের ন্যায় দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

- আলতুনিয়া কে ছিলেন? ১
- ‘উমদাদ-উল-নিসওয়ান’ কার উপাধি ছিল? ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বিদ্রোহ দমনে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরুন। ৩
- সুলতান রাজিয়া মধ্যযুগীয় ভারতীয় উপমহাদেশে একজন বিরল প্রতিভার নারী শাসক হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-২.৫

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিদ্রোহ দমনে বলবন কর্তৃক গৃহীত নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বলবন কর্তৃক মেওয়াটি দস্যুদের দমন ও বাংলার বিদ্রোহ প্রশমন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- বলবনের মোঙ্গলনীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	ইলবারি, বলবন, মোঙ্গল, খাসবরদার, আমির-ই-শিকার, আমির-ই-হাজীব ও উলুঘ খান
-----	------------	---



বলবনের প্রাথমিক জীবন

গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) শ্বশুর। গিয়াসউদ্দিন বলবন তুর্কিস্তানের বিখ্যাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বলবনের প্রকৃত নাম ছিল বাহাউদ্দিন। বলবন এবং উলুঘ খান এ দু'টো ছিল তাঁর উপাধি। বলবনের রাজ উপাধি ছিল গিয়াসউদ্দিন। শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের ন্যায় গিয়াসউদ্দিন বলবন যৌবনেই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। বাগদাদের খাজা জামালউদ্দিন বসরী নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট মোঙ্গলরা গিয়াসউদ্দিন বলবনকে বিক্রি করে দেন। খাজা জামাল উদ্দিন নিজেও ছিলেন একজন দাস ব্যবসায়ী। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্যান্য দাসদের সাথে গিয়াসউদ্দিন বলবনকেও দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং দিল্লির তৎকালীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের নিকট বিক্রি করে দেন। প্রথর মেধা এবং ধীশক্তি সম্পন্ন গিয়াসউদ্দিন বলবন অচিরেই তাঁর নানামুখী প্রতিভাবলে সুলতান ইলতুৎমিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিন বলবনকে তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিখ্যাত 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা 'চল্লিশ চক্রের' অন্তর্ভুক্ত করেন। বলবন ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের 'খাসবরদার' বা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।

সুলতান রাজিয়ার (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.) শাসনামলে বলবন ছিলেন আমির-ই-শিকার। সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র মুইজউদ্দিন বাহরামের সময় বলবন যথাক্রমে রেওরী এবং হানসীর ভূস্বামীর দায়িত্ব পালন করেন। মুইজউদ্দিন বাহরামের সময় তিনি 'আমির-ই-হাযীব' (রাজগৃহাধ্যক্ষ) পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদের (১২৪২-১২৪৬) শাসনামলেও বলবন 'আমির-ই-হাযীব' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রভাব প্রতিপত্তি মূলত: বৃদ্ধি পায় সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) শাসনামলে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের সময় পাঞ্জাবে মেঙ্গু খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা উপদ্রব শুরু করলে গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর হস্তে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই বিদ্রোহ দমন করেন। নাসির উদ্দিন মাহমুদ গিয়াসউদ্দিন বলবনকে 'উলুঘ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন বলবন 'নায়ব-ই-মামলিকাত' পদে নিযুক্ত হন এবং সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। নাসির উদ্দিন মাহমুদের দুর্বলতার সুযোগে শ্বশুর গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রকৃত সুলতানের ক্ষমতা চর্চা করতেন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করেন। বলবনের জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইমাম উদ্দিন রায়হান নামক জনৈক প্রভাবশালী আমিরের নেতৃত্বে তুর্কি আমিরদের ষড়যন্ত্রের কারণে বলবন ক্ষমতাচ্যুত হলেও ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় পূর্বপদে অধিষ্ঠিত হয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৪৯ ও ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে মুলতান ও অযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণ হতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং বাংলা ও বিহারের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়রের হিন্দু নরপতি এবং মেওয়াটের উপজাতিদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে বলবন দোয়াবে শান্তি স্থাপন করেন। এভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ভোগ করেন।

বলবনের সিংহাসনে আরোহণ

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) কোনো সন্তান ছিল না। তিনি ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের সর্বশেষ সন্তান। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ তাঁর শ্বশুর গিয়াসউদ্দিন বলবনকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বলবন ৬০ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণে

করেন। তিনি সালতানাতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, রাজা হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি রাজার দৈবসত্তায় বিশ্বাস করতেন। বলবন ‘জিল্লুলাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সালতানাতের প্রতি জন সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজদরবারে পারসিক রীতির প্রবর্তন করেন।

বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি অবলম্বন

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সাম্রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদ, গোলযোগ ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এক অভিনব ও নির্মম নীতি অবলম্বন করেন। সুলতান কর্তৃক গৃহীত এই নীতি ইতিহাসে ‘রক্তপাত ও কঠোরতার নীতি’ (Blood and Iron Policy) নামে পরিচিত। সুলতান ইলতুতমিশ তাঁর বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য চল্লিশজন ক্রীতদাসকে নিয়ে বিখ্যাত ‘বন্দেগান-ই-চেহেলগান’ বা চল্লিশ চক্র গঠন করেছিলেন। বলবন নিজেও ছিলেন এই দলের একজন সদস্য। কিন্তু তিনি সুলতান হওয়ার পর এই চক্র তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুলতান বলবন এই চল্লিশ চক্রের প্রভাব হ্রাস করার জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেমন, প্রথমত: তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা বাতিল করা, দ্বিতীয়ত: তাদের বন্ধাধীন স্বাধীনতা রহিত করা, তৃতীয়ত: তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা, চতুর্থত: রাজদরবারে তাদের হাসি-ঠাট্টা নিষিদ্ধ করা এবং পঞ্চমত: তাদের প্রদেয় জায়গীরদারি বাতিল করা। এমনকি সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও প্রয়োগ করেন। আমির খান, হায়বৎখান এবং বরবকসহ বহু প্রভাবশালী অভিজাতকে তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তিনি আপন চাচাতো ভাই ও চল্লিশ চক্রের অন্যতম সদস্য শেরখানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আধিপত্যবাদী স্বৈরশাসক। তার স্বৈরশাসন নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগ করেন। অত্যন্ত চৌকস, অনুগত এবং বিশ্বস্ত এসব গুপ্তচরেরা সমস্ত গোপন সংবাদ সুলতানকে সরবরাহ করত এবং শাসন ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করত। অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ গোলযোগ ও বিদ্রোহ দমন করার জন্য সুলতান বলবন সামরিক বাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলেন।

মেওয়াটি দস্যুদের দমন

দুর্ধর্ষ মেওয়াটি দস্যুরা ছিল মেওয়াট বা আলোয়ারের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। এই রাজপুত মেওয়াটি দস্যুগণ প্রকাশ্যে দিল্লির রাজপথে পথিকদের সবকিছু লুণ্ঠ করে নিয়ে যেত। সুলতান বলবন দিল্লির উপকণ্ঠ থেকে এসকল দস্যুদের বিতাড়িত করেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করেন। সুলতান নিজেই মেওয়াটি দস্যুদের প্রধান ঘাঁটি কাম্পিল, পাতিয়ালী, ভোজপুর প্রভৃতি স্থানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মেওয়াটি দস্যুদের ভবিষ্যত আক্রমণ থেকে দিল্লিকে রক্ষার জন্য সুলতান বলবন গোপালগীরের দুর্গ নির্মাণ করেন এবং জালালী দুর্গটি সংস্কার করেন।

বাংলার বিদ্রোহ দমন

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত সেই সুযোগে বিদ্রোহ প্রবণ বাংলার শাসক তুঘরিখ খান ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুঘরিখ ‘সুলতান মুঘিস উদ্দিন’ উপাধি ধারণ করে সার্বভৌমত্বের প্রতীক স্বরূপ খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন।

বলবনের মোঙ্গল নীতি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলে (১২৬৬-১২৮৭খ্রি.) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হয়। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। তিনি সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে পুনর্গঠিত করেন। সামরিক ঝাঁকপ্রবণ এলাকাগুলোতে নতুন নতুন দুর্গনির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলোর সংস্কার সাধন করেন। সুলতান বলবন সামানা, মুলতান এবং দিপালপুরকে একত্রিত করে সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করেন এবং সুযোগ্য শাসনকর্তাদের উপর সেগুলোর শাসনভার অর্পণ করেন। সুলতান বলবন সর্বদা রাজধানীতেই অবস্থান করার উদ্দেশ্যে দূরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন।

সুলতান বলবন অযোধ্যার শাসক আমিন খান, সেনানায়ক মালিক তারঘি ও শাহাব উদ্দিনের নেতৃত্বে উপর্যুপরি তিনবার বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাধ্য হয়ে সুলতান বলবন স্বয়ং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা আভ্যানে অগ্রসর হন। বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘরিখ খান বলবনের বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদে রাজধানী লক্ষণাবতী থেকে পলায়ন করে সোনারগাঁও এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তুঘরিখ খান বলবনের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন (১২৮১ খ্রি.)। বলবন বুঘরা খানকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করে বাংলার শাসক নিয়োগ করেন।

মুলতান ও দিপালপুরের প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন শের খান। তার মৃত্যুর পর বলবন তাঁর প্রথম পুত্র মুহম্মদকে মুলতান ও দিপালপুরের এবং দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে সামানা ও সুসানের শাসক নিযুক্ত করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলগণ শতদ্রু নদী পার হয়ে নৃশংসতা আরম্ভ করলে যুবরাজ মুহম্মদ ও বুঘরা খান এবং মালিক মোবারকের যৌথ আক্রমণে মোঙ্গলদের পরাজয় ঘটে। তবে সেনাপতি তামারের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করলে যুবরাজ মুহম্মদ তাদের সাথে সংঘঠিত এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত হন। শেষ পর্যন্ত বলবনের সৈন্যবাহিনী মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে লাহোর পুনঃদখল করেন। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে বলবন বাংলার শাসক দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাইলেও তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় বলবন যুবরাজ মুহম্মদের পুত্র কায়খসরুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

বলবনের মোঙ্গল নীতি ব্যাখ্যা করুন।



সারসংক্ষেপ :

গিয়াসউদ্দিন বলবন সামান্য একজন ক্রীতদাস হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশের দরবারে প্রাথমিক জীবন শুরু করলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় তাঁর নিজস্ব মেধা, মনন ও অনন্য প্রতিভাগুণে সুলতান ইলতুৎমিশের আস্থা অর্জন করেন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করলে গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে বলবন চল্লিশ চক্রের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেন, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন, দুর্ধর্ষ মেওয়ারি দস্যুদের দমন করেন এবং বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘরিখ খানের বিদ্রোহ দমন করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে সুলতান বলবন সচেষ্ট ছিলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজ্য বিজয় অপেক্ষা বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে বিশ্বাসী ছিলেন। মহান শাসক ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বলবনের প্রকৃত নাম ছিল-

ক. নাসির উদ্দিন

খ. সেলিম উদ্দিন

গ. বাহাউদ্দিন

ঘ. বাহার উদ্দিন

২। 'উলুঘ খান' উপাধিটি-

ক. সুলতান রুকন উদ্দিনের

খ. সুলতান মুইযউদ্দিনের

গ. সুলতান নাসির উদ্দিনের

ঘ. সুলতান গিয়াসউদ্দিনের

৩। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ বলবনকে ক্রয় করেন-

ক. ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিজয় ও অভি সুলতানি আমলের 'ক' শাসক সম্পর্কে আলোচনা করছিল। 'ক' শাসক সুলতান ইলতুৎমিশের বন্দেগান-ই-চেহেলগানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি শাসন ক্ষমতায় এসে বন্দেগান-ই-চেহেলগানের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেন। তিনি সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের শ্বশুর ছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১. গিয়াসউদ্দিন বলবন কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

১

২. বন্দেগান-ই-চেহেলগান কি?

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের মোঙ্গলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩

৪. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন- এর স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৪

পাঠ-২.৬ আলাউদ্দিন খলজি: রাজ্য বিজয়



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আলাউদ্দিন খলজির উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	আমীরে তুজুক, দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, জওহরত, খিজিরাবাদ, রায়-রায়ান ও দেবগিরি
--	------------	--



সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনারোহণের প্রেক্ষাপট

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন মুসলিম ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ও সফল শাসক। তিনি ছিলেন খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজির ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। তাঁর বাবার নাম ছিল শাহাবউদ্দিন। পিতৃ বিয়োগের পর আলাউদ্দিন খলজি পিতৃব্য জালাল উদ্দিন ফিরোজের স্নেহে লালিত পালিত হন এবং যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। পিতৃব্য জালালউদ্দিন সিংহাসনারোহণ করে আলাউদ্দিনকে ‘আমীরে তুজুক’ পদে অধিষ্ঠিত করেন। আলাউদ্দিন খলজি কারা প্রদেশ এবং অযোধ্যায় শাসকের পদও অলংকৃত করেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবগিরিতে অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর ধন-রত্ন হস্তগত করেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই আলাউদ্দিন খলজি নিজ পিতৃব্য ও শ্বশুর জালালউদ্দিন ফিরোজকে হত্যা করে নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খলজি

গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ন্যায় সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী সমরনায়ক। তিনি নিজে মুদ্রায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। ডব্লিউ হেগ-এর মতে, “আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল হতেই দিল্লি সালতানাতের যুগ শুরু হয় এবং অর্ধ শতাব্দির বেশীকাল তা বলবৎ ছিল।” সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৭ খ্রি. থেকে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের গুজরাট রণথম্বোর, মেবার, মালব, উজ্জয়িনী, ধর, চান্দেবীসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে তাঁর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে, ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামেশ্বর সেতু পর্যন্ত দক্ষিণাত্যের এক বিশাল অঞ্চলের উপর নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার:

গুজরাট অভিযান

১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি নিজ ভ্রাতা উলুঘ খান এবং মন্ত্রী নুসরাত খানকে গুজরাট অভিযানে প্রেরণ করেন। গুজরাটের তৎকালীন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব। সুলতানের বাহিনীর আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজা রায় কর্ণদেব তার কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে দক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানের বাহিনী রাজধানী আনহিলওয়ারাসহ সমগ্র গুজরাট ও ক্যাম্বে হস্তগত করেন। রানী কমলাদেবীসহ কাফুর নামক একজন খোজাকে বন্দি করে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রানী কমলাদেবীকে বিবাহ করেন। আর খোজা কাফুর-পরবর্তীতে মালিক কাফুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যের পদ অলংকৃত করেন।

রণথম্বোর বিজয়

দিল্লির দুর্বল শাসকদের অযোগ্যতার সুযোগে রাজপুতগণ পুনরায় রণথম্বোর দখল করে নেয়। এই সময় রণথম্বোরের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় চৌহানরাজ হামির দেব। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মুহাম্মদ শাহসহ অনেক নব মুসলমানকে তার রাজ্যে

আশ্রয় প্রদান করে হামির দেব সুলতান আলাউদ্দিন খলজির বিরাগ ভাজন হন। আলাউদ্দিন ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে উলুঘ খান ও নুসরাত খানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর সুলতান নিজে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রণথম্বোরের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। সুলতানের বাহিনী দীর্ঘ এক বছর রণথম্বোর অবরোধ করে রাখার পর ১৩০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রণথম্বোর দুর্গ জয় করে নেয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাজা হামির দেবকে সপরিবারে হত্যা করেন। নব-মুসলমানদেরকেও হত্যা করা হয়। সুলতান তাঁর বিশুদ্ধ সেনাপতি উলুঘ খানকে রণথম্বোরের শাসক নিযুক্ত করেন এবং বিপুল ধন রত্ন সহকারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

চিতোর বিজয়

রাজপুতনার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মেবার। আর মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট আলাউদ্দিন খলজি স্বয়ং এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুত রাণা রতন-সিংহের পদ্মিনী নামে এক অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নী ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, পদ্মিনীকে লাভের জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মেবার অভিযান করেন। কিন্তু ইতিহাসবিদেরা পদ্মিনী উপাখ্যানের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাজপুত বীর গোরা ও বাদল বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও রাণা রতন সিংহ রাজকীয় বাহিনীর হাতে পরাজিত এবং বন্দী হন। রাজপুত রমণীগণ আত্মসম্মত রক্ষার্থে ঝলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এই প্রথা ‘জহরব্রত’ নামে পরিচিত ছিল। আলাউদ্দিন খলজি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেন। যুবরাজ খিজির খানের নামানুসারে চিতোরের নামকরণ করেন খিজিরাবাদ। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ খিজিরখান চিতোর ত্যাগ করলে সুলতান জালোরের অধিপতি মালদেবকে চিতোরের শাসক নিয়োগ করেন। ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মৃত্যুবরণ করেন। ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে চিতোরের শাসক মালদেবকে বিতাড়িত করে রাজপুত রাণা হামির চিতোর পুনঃদখল করেন।

মালব বিজয়

উত্তর ভারতের গুজরাট, রণথম্বোর ও চিতোর বিজয়ের পর সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মালব বিজয়ে অগ্রসর হন। এসময় মালবের শাসক ছিলেন রায় মাহল দেব। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি আইন-উল-মুলককে সেনাবাহিনীসহ মালবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রাজকীয় বাহিনীর সাথে রায় মাহল দেবের বাহিনীর এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রায় মাহল দেব পরাজিত ও নিহত হন। এরপর উজ্জয়িনী, চান্দেরী, মাভু, ধর প্রভৃতি অঞ্চল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুলতান আলাউদ্দিন বিজয়ী সেনাপতি আইন-উল-মুলককে মালবের শাসক নিযুক্ত করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণ ভারত বিজয়

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ধনরত্নের প্রাচুর্য এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ প্রভৃতি সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে দক্ষিণ ভারত তথা দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উৎসাহিত করে। দাক্ষিণাত্য অভিযানে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সমর নায়ক ছিলেন মালিক কাফুর।

দেবগিরি অভিযান

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে দেবগিরির শাসক ছিলেন রাজা রামচন্দ্র দেব। রামচন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইলিচপুর প্রদেশের কর প্রেরণ করেননি এবং সুলতানের নিকট উপটোকন প্রেরণ বন্ধ করে দেন। তবে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল যে, তিনি গুজরাটের পরাজিত রাজা কর্ণদেবকে তাঁর কন্যা দেবলা দেবীসহ আশ্রয় প্রদান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরকে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা রামচন্দ্র দেব সুলতানের বাহিনীর নিকট পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। তার এরূপ ব্যবহারে খুশী হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাজা রামচন্দ্র দেবকে ‘রায়-রায়ন’ উপাধি প্রদান করেন। সেনাপতি মালিক

কাফুর বিপুল ধন সম্পদসহ গুজরাটের রাজকন্যা দেবলা দেবীকে নিয়ে রাজধানী দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খানের সাথে দেবলা দেবীর বিবাহ প্রদান করেন।

বরঙ্গল বিজয়

‘বরঙ্গল’ ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী। বরঙ্গলে এসময় কাকতীয় বংশের শাসন প্রচলিত ছিল। কাকতীয় বংশের শাসক রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেবের বিরুদ্ধে ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন সেনাপতি মালিক কাফুরকে প্রেরণ করেন। প্রায় দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর ১৩১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেব সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা সুলতানের জন্য বিপুল উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। দেবগিরি এবং বরঙ্গল রাজ্য বিজয়ের পর আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণাত্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

দ্বার সমুদ্র বিজয়

দাক্ষিণাত্যের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লালের রাজধানী ছিল দ্বার সমুদ্র। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর এর নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী তৃতীয় বীর বল্লালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মিত্র দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র, বরঙ্গলের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেব এবং মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানের বাহিনী সম্মিলিতভাবে হোয়সলরাজকে আক্রমণ করলে রাজা বীর বল্লাল অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে হোয়সল রাজ্য দিল্লির সালতানাতের সরকারের অধীনস্থ হয় এবং নিয়মিত করদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

পান্ডরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান

দ্বার সমুদ্রের দক্ষিণে অবস্থিত পান্ডরাজ্যের রাজধানী ছিল মাদুরা। পান্ডরাজ্যের রাজার মৃত্যুর পর বীর পান্ড ও সুন্দ পান্ডের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সেনাপতি মালিক কাফুরকে পান্ডরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে মালিক কাফুর অতিসহজেই পাণ্ডরাজ্য অধিকার করেন। সেনাপতি কাফুর রামেশ্বর পর্যন্ত দখল করেন। তিনি রামেশ্বরে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির নামানুসারে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মালিক কাফুর বিপুল ধনসম্পদসহ দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শংকর দেবের বিরুদ্ধে অভিযান

দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেব ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত। ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর পুত্র শংকর দেব সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লিতে কর প্রেরণ বন্ধ করে দেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে শংকর দেবের বিরুদ্ধে এক সমর অভিযান প্রেরণ করলে শংকর দেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে পুনরায় দেবগিরি রাজ্য দিল্লির শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত প্রায় সব অভিযান সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদের সুযোগে সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারত জয় করতে সক্ষম হন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যসমূহ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বিদ্রোহপ্রবণ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোকে সরাসরি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। নিয়মিত কর দেওয়ার শর্তে দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় শাসকদেরই ক্ষমতায় বহাল রেখেছিলেন তবে এই অভিযান থেকে সেনাপতি মালিক কাফুর বিপুল উপঢৌকন সহকারে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে আসেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বীরত্বের সেনাপতি মালিক কাফুরকে ‘মালিক নায়েব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। দাক্ষিণাত্য হতে আহরিত অগণিত ধন সম্পদ উত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতির সূচনা করে, বাধ্য হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণ ভারত বিজয় সংক্ষেপে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।



সারসংক্ষেপ :

দিল্লি সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সুলতান আলাউদ্দিন খলজি পিতৃব্য ও শ্বশুর জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি কে হত্যা করে ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য বিজয়ের এক দুর্বীর প্রত্যাশা নিয়ে ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের গুজরাট, রণথম্বোর, মেবার, মালব, উজ্জয়িনী, ধর, চান্দেরীসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুযোগ্য সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, পাণ্ডরাজ্য এবং শংকরদেবের রাজ্যসহ রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের এক বিশাল অঞ্চলের উপর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ উত্তর ভারতে আনেন ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করে। জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘব করার জন্য বাধ্য হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। খলজি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়-

ক. ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে

২। খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ছিলেন-

ক. সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি

খ. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি

গ. সুলতান শাহাবুদ্দিন ওমর খলজি

ঘ. সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক খলজি

৩। গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় রায় কর্ণদেবের স্ত্রীর নাম-

ক. রাণী দেবলাদেবী

খ. রাণী কমলাদেবী

গ. রাণী সুরমা দেবী

ঘ. রাণী সূর্য দেবী

৪। মালিক কাফুরকে নিয়ে আসা হয়-

ক. গুজরাট থেকে

খ. রণথম্বোর থেকে

গ. চিতোর থেকে

ঘ. মালব থেকে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সুরতানী আমলের 'ক' শাসক সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি শ্বশুরকে হত্যা করে নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী শাসক। দক্ষিণ ভারতে বিজয় অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

১. খলজি বংশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১

২. খলজি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার বর্ণনা দিন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে লিখুন।

৩

৪. আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযান সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৪

পাঠ-২.৭

আলাউদ্দিন খলজির শাসন সংস্কার ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আলাউদ্দিন খলজির শাসন সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- আলাউদ্দিন খলজির রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন
- আলাউদ্দিন খলজির সামরিক সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

মালিকা-ই-জাহান, আরিজ-ই-মামালিক, 'দাগ' ও 'হলিয়া'



শাসন সংস্কার

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬খ্রি:) ভারতের মধ্য যুগের ইতিহাসে শুধুমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতাই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক। বিজিত অঞ্চলে তিনি যুগোপযোগী সূচু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের ন্যায় সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল উলেমা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে অনুসরণ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বিজিত অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেকে 'ইয়ামিন-উল-খিলাফত' ও 'নাসিরী আমির-উল-মুমেনিন' হিসেবে অভিহিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি জালাল উদ্দিন খলজির বিধবা পত্নী মালিকা-ই-জাহান, পুত্র রুকনউদ্দিন ইব্রাহিম, হাজী মওলা, ভ্রাতুষ্পুত্র আকত খান, নও মুসলিম উমর খান ও মঙ্গু খান এবং অভিজাত শ্রেণির ব্যাপক বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর বিদ্রোহের চারটি কারণ উদ্ঘাটিত হয়। এগুলো হলো-

- (১) রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা এবং শাসনকার্য সম্পাদনে সুলতানের অমনোযোগিতা ও ঔদাসীন্য,
- (২) মাদক দ্রব্যের অপরিমিত প্রচলন,
- (৩) আমির, মালিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সুসম্পর্ক, পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং অবাধ মেলামেশা ও
- (৪) অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য।

বিদ্রোহের কারণ চিহ্নিত করার পর তার মূলোৎপাটন করতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথমত, শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কার্যাবলীর দায়িত্ব আমির ও উমরাহদের উপর ন্যস্ত না করে সুলতান নিজেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাদক জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং অবাধ সরবরাহ নিষিদ্ধ করেন। জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সুলতান নিজেই মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সমস্ত পান-পাত্র ভেঙে ফেলেন।

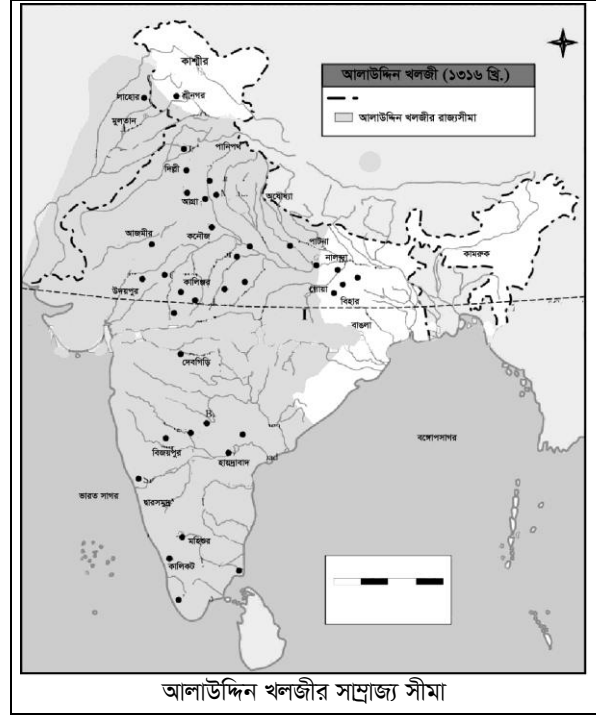
তৃতীয়ত, সুলতানের বিনা অনুমতিতে আমির, মালিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ভোজসভা এবং অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুলতান অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

চতুর্থত, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বিশ্বাস করতেন যে, সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের মনোবৃত্তি উদ্বেক করে। তিনি আমির, মালিক, অভিজাত সম্প্রদায় ও বিত্তবান হিন্দুদের জায়গীর ও নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং বখশিস, পেনশন, ভাতা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেন। ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব-

প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের কঠোর নীতি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় প্রচলিত ছিল আলাউদ্দিন খলজি সেই নীতিরই পুনঃপ্রচলন করেন।

রাজস্ব সংস্কার

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান এবং প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিকর (Land Revenue)। উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং রাজস্ব পুনঃ নির্ধারণের জন্য সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের প্রবর্তন করেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজি। রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করে চৌধুরী, খুত, মুকাদ্দাম প্রভৃতি রাজস্ব কর্মচারীগণ ইতোপূর্বে খাজনাবিহীন যেসব ভূমি ভোগ দখল করে আসছিল তা বাতিল করা হয়। রায়তদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করার জন্য নতুন নতুন রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করে তাদেরকে নগদ বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধিকল্পে ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গোচারণ ভূমি কর, গৃহকর এবং আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেন এবং জায়গীর প্রথা বিলুপ্ত করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নিরাপত্তা কর হিসেবে বিবেচিত জিজিয়া আরোপ করেন। দোয়াব ও অন্যান্য উপদ্রুত অঞ্চলে



আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্য সীমা

স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত কর ধার্য করেন। শুধুমাত্র দোয়াব অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা হতো। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, এভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সমগ্র দেশকে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় রাজস্ব প্রশাসনের আওতাভুক্ত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং নতুন নতুন করারোপ এবং আদায়ের ফলে সাম্রাজ্যব্যাপী আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং জনসাধারণের জীবন-মানের সমৃদ্ধি ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমি জরিপ পদ্ধতি পরবর্তীকালে শের শাহ এবং মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে নতুনরূপে বিকাশ লাভ করে।

সামরিক সংস্কার

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন, সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করণ এবং রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি এক বিশাল সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন। তিনি একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করে আরিজ-ই-মামালিক (সমরমন্ত্রী) এর নিকট তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। জায়গীরের পরিবর্তে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে অজস্র ধন-সম্পদ উত্তর ভারতে নিয়ে আসার ফলে সাম্রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী যাতে সেনাবাহিনীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে এজন্য সুলতান মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরাজমান দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে সুলতান আলাউদ্দিন মুসলিম ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম অশ্বচিহ্নিত করার প্রথা ‘দাগ’ এবং সেনাবাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত তালিকা করার রীতি প্রবর্তন করেন, যা ‘হলিয়া’ নামে সর্বজন পরিচিত। তিনি ছিলেন খলজি সামরিক পদ্ধতির গোড়াপত্তনকারী। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে সেনা বাহিনীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা- অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং হস্তী বাহিনী। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন খলজির অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,৭৫,০০০। সুলতানের পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর প্রায় দ্বিগুণ।



শিক্ষার্থীর কাজ

আলাউদ্দিন খলজির রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করুন।



সারসংক্ষেপ:

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি আমির, মালিক, অভিজাত সম্প্রদায় এবং উলামাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে মধ্যযুগীয় দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কায়েম করে তিনি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি এবং নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বিদ্রোহ দমন এবং সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তিনি এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একাধারে রাজ্য বিজেতা, সুদক্ষ যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক এবং সমসাময়িককালের একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

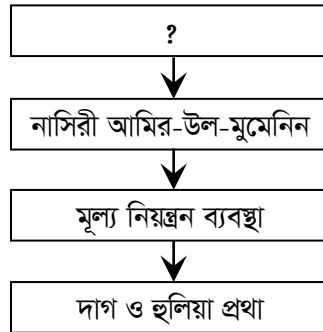
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন কোন সুলতান?
ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক খ. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ গ. গিয়াস উদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি
- ‘ইয়ামিন-উল-খিলাফত’ ও ‘নাসিরী আমির-উল-মুমেনিন’ হিসেবে অভিহিত হতেন কে?
ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক খ. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ গ. গিয়াস উদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি
- ‘মালিকা-ই-জাহান’ ছিলেন-
ক. খলজির পত্নী খ. খলজির পত্নী। গ. ওমর খলজির পত্নী ঘ. মুবারক খলজির পত্নী
- ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন-
ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক খ. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ গ. জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি ঘ. আলাউদ্দিন খলজি



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:



- ‘নাসিরী আমির-উল মুমেনিন’ হিসেবে অভিহিত হতেন কে? ১
- আলাউদ্দিন খলজির সময়ে উদঘাটিত অভিজাত শ্রেণির বিদ্রোহের কারনগুলো লিখুন। ২
- উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের শাসন সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা দিন। ৩
- সমসাময়িক একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আলাউদ্দিন খলজিকে মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-২.৮

তুঘলক বংশ ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাঁচটি পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কার্যাবলি মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

কারাউনা তুর্কি, উলুঘ খান, আমির-ই-আখুর, আমির-ই-কোহী ও দিওয়ান-ই-কোহী



শ্রেণীপট

১৩১৬ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর ‘মালিক তাজ-উল-মালিক কাফুরী’ উপাধি প্রাপ্ত এবং ‘হাজার দিনারী’ খ্যাত প্রধানমন্ত্রী মালিক কাফুর সুলতানের পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুপুত্র শিহাবউদ্দিন ওমরকে দিল্লির মসনদে বসান এবং নিজে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। তিনি সুলতানের অপর দুই পুত্র খিজির খান ও সাদী খানের চক্ষু উৎপাটন করে তাদেরকে কারারুদ্ধ করেন এবং আলাউদ্দিনের বিধবা স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিবাহ করেন। কিন্তু মালিক কাফুরের স্বৈরাচারী শাসন সকল সীমা অতিক্রম করলে অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সহায়তায় সুলতানের দেহরক্ষীরা ৩৬ দিন পর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির তৃতীয় পুত্র মুবারক ‘কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ’ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মুবারক শাহ ছিলেন অলস, অকর্মণ্য ও ভোগবিলাসী। তিনি বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার দক্ষিণাত্যের শাসন কর্তা খসরু খানের উপর ন্যস্ত করেন। এমনকি তিনি পিতা আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থার কঠোর নীতি শিথিল করেন। তিনি অনেক আইন কানুন বাতিল করে উদারতার পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হন। তিনি ‘খলিফা’ উপাধিও ধারণ করেন। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে খসরু খান মুবারক শাহকে হত্যা করে দিল্লির মসনদে আরোহণ করেন। তিনি নাসিরউদ্দিন খসরু শাহ উপাধি ধারণ করেন। সমসাময়িককালের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ খসরু শাহের শাসনকালকে সন্ত্রাসের রাজত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন।

খসরু খানের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে দিল্লির অভিজাত আমির উমরাহগণ পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসক গাজী মালিককে দিল্লির মসনদ দখলের জন্য আহ্বান করেন। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে গাজী মালিক দিল্লির উপকণ্ঠে সংঘটিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে খসরু খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। গাজী মালিক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধি ধারণ করে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি ছিলেন তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তুঘলক বংশকে ‘কারাউনা তুর্কি’ বংশ নামেও অভিহিত করা হয়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজশাহ তুঘলক ছিলেন এই বংশের তিনজন শ্রেষ্ঠ সুলতান। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের সর্বমোট ৯জন শাসক প্রায় ৯৩ বছর যাবৎ ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫খ্রি.)

গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের বাল্য নাম ছিল গাজী তুঘলক। তিনি ছিলেন কারাউনা তুর্কি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের পরিবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলে দিল্লিতে আসেন। তার পিতা বলবনের অধীনে একজন তুর্কি দাস হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পাঞ্জাবের এক জাঠ রমণীকে বিবাহ করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ধর্মনীতে তাই তুর্কি ও রাজপুত রক্তের যৌথ উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও স্বীয় মেধা, প্রতিভা, দৃঢ় মনোবল এবং প্রবল আত্মবিশ্বাসের গুণে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অধীনে ‘সেনাবাহিনীর প্রধান রক্ষক’ পদে নিযুক্ত হন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাঁকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এসময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ২৯ বার মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা করে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মন:তৃপ্তি অর্জন করেন। এতে খুশি হয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে ‘মালিক উল গাজি’ বা ‘গাজী মালিক’ উপাধি প্রদান করে। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর নাসিরউদ্দিন খসরু শাহকে পরাজিত ও নিহত করেন।

গাজী মালিক সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধি ধারণ করে ভারতীয় উপমহাদেশে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লির ছয় মাইল অদূরে আফগানপুর নামক স্থানে তোরণ ধ্বংসের কারণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.):

মুহম্মদ বিন তুঘলকের ঘটনাবল্ল রাজত্বকাল

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জ্যেষ্ঠপুত্র ফখরুদ্দিন মুহম্মদ জুনা খান বাল্যকালে সামরিক ও বেসামরিক উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। খলজি বংশের শাসনামলে সুলতান নাসির উদ্দিন খসরু শাহ জুনা খানকে ‘আমির-ই-আখুর’ তথা রাজকীয় অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠায় জুনা খান পিতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে সহায়তা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পুত্র জুনা খানকে ‘উলুঘ খান’ উপাধি প্রদান করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে জুনা খান মুহম্মদ বিন তুঘলক উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি পরিকল্পনা হলো-

১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৬-১৩২৭খ্রি.);
২. খোরাসান অভিযান (১৩২৭-১৩২৮ খ্রি.);
৩. প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রচলন (১৩২৯-১৩৩০ খ্রি.);
৪. কারাচিল অভিযান (১৩৩২-১৩৩৩ খ্রি.) এবং
৫. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি (১৩৩৪ খ্রি.)।

১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৬-১৩২৭ খ্রি.)

কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা, দাক্ষিণাত্যের ধন-দৌলত, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থানের কারণে ১৩২৬-২৭ খ্রি. সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি হতে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরির নতুন নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। প্রায় ৮ বছর দৌলতাবাদে অবস্থানের পর সুলতান সবাইকে নিয়ে পুনরায় দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে সুলতানের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২. খোরাসান অভিযান (১৩২৭-১৩২৮ খ্রি.)

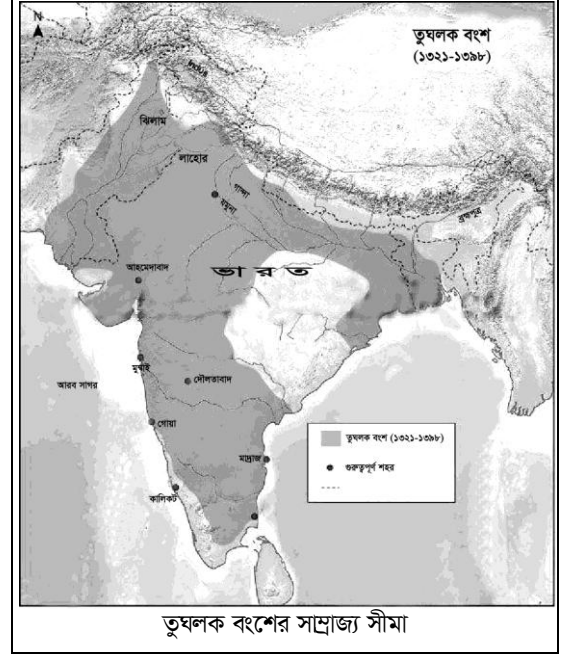
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির ন্যায় সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকও ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সমসাময়িক পারস্যের ইলখানি শাসক ছিলেন আবু সাঈদ। ১৩২৭-১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক বিভিন্ন কারণে খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সুলতানের দরবারে আশ্রয়প্রাপ্ত কতিপয় বিদ্রোহী আমিরের প্ররোচনা, ট্রান্সঅক্সিয়ানার মোঙ্গল শাসক তারমাশিরিন এবং মিসরের মামলুক সুলতান আল নাসিরের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার আশ্বাস এবং ইলখানি শাসক আবু সাঈদের দুর্বলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুলতান ৩,৭০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং পূর্ণ এক বছর তাদের বেতন ভাতাদি প্রদান করেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, উপযুক্ত সামরিক শক্তির অভাব, ভৌগোলিক অসুবিধা, ট্রান্সঅক্সিয়ানার তারমাশিরিনের ক্ষমতাচ্যুতি, মিসরের সুলতান আল-নাসির ও ইলখানি সুলতান আবু সাঈদের মধ্যে সুস্পর্ক স্থাপন এবং সর্বোপরি হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথে সৈন্য প্রেরণের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক খোরাসান অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হন।

৩. প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রচলন (১৩২৯-১৩৩০খ্রি.)

বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় সংকুলান, সুলতানের দানশীলতা, শাসনকার্যে অত্যাধিক ব্যয়, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ, রাজ্য বিজয় পরিকল্পনা, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরজনিত ব্যয়ভার প্রভৃতি কারণে রাজকোষে আর্থিক সংকট দেখা দিলে ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতীক তাম্র-মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতান ২০০ গ্রেনের স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) এবং ১৪০ গ্রেনের রৌপ্যমুদ্রার (আদালী) প্রবর্তন করেন। এডওয়ার্ড থমাস সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলককে ‘Prince of Moneyers’ বা ‘মুদ্রা প্রবর্তকদের রাজকুমার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতানের এই পরিকল্পনাও বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

৪. কারাচিল অভিযান (১৩৩২ খ্রি. ১৩৩৩ খ্রি.)

চীন ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কারাচিল ছিল একটি অন্যতম শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য। কারাচিল কারাজল বা কুর্মাচল নামেও পরিচিত ছিল। সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত কারাচিল রাজ্যটি ছিল দিল্লি সালতানাতের জন্য হুমকিস্বরূপ। ১৩৩২-১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক খসরু মালিকের নেতৃত্বে কারাচিলে এক বিশাল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য কারাচিলে পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত স্থানীয় গোত্রগুলো প্রায় সময় উত্তর দিক থেকে সুলতানি সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নানা প্রকার উপদ্রব সৃষ্টি করে সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। সুলতান কর্তৃক প্রেরিত খসরু মালিকের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজকীয় বাহিনী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও পার্বত্য সর্দাররা সন্ধি স্বাক্ষর করে বাৎসরিক কর প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।



৫. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি (১৩৩৪খ্রি.)

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর ভূমি দোয়াব অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল। রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযান এবং তাম্র মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি পরিকল্পনা ব্যর্থতার ফলে শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার মানসে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লি সালতানাতের 'শস্যভান্ডার' নামে পরিচিত উর্বর দোয়াব অঞ্চলে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে কর বৃদ্ধির নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসময় অনাবৃষ্টিজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক জনগণের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করেন, কৃপা খনন এবং সরকারি লঙ্গরখানা স্থাপন করে দৈনিক ৫০০ ক্ষুধার্ত লোককে খাদ্য সরবরাহ করেন। তথাপি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা দূরীভূত হতে অনেক সময় লেগে যায়। প্রজাসাধারণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। রায়তরা কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে পলায়ন করে। কেউ কেউ দস্যুতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এভাবে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি পরিকল্পনা নানাবিধ কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ

মুহম্মদ বিন তুঘলকের পঞ্চ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ক্রমাগত দূরাবস্থার প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেবারের সৈয়দ জালাল উদ্দিন এবং ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসক ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা আইন-উল-মুলক বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক তাকে বন্দি করেন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করে সাতগাঁও অধিকার করেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে দৌলতাবাদে বিদেশী আমিরগণ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান এ বিদ্রোহ দমন করলেও হাসান নামক জনৈক আমির 'আবুল মুজাফফর বাহমান শাহ' উপাধি ধারণ করে দৌলতাবাদে স্বাধীন বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ হরিহর ও বুদ্ধা রাওয়ের নেতৃত্বে বিজয়নগর রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধুর থাট্টায় বিদ্রোহ দমনরত অবস্থায় জুরে আক্রান্ত হয়ে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী। প্রতিভাধর ও অনন্য সাধারণ চরিত্রের অধিকারী সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন। তিনি শুধু একজন উচ্চাভিলাষী শাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্বান ও সুপণ্ডিত। দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, তর্কশাস্ত্র জীববিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে সুলতান ছিলেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সুবক্তা, সুলেখক, কবি এবং লিপিবিদ্যায় পারদর্শী। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নিজ ধর্মে প্রবল বিশ্বাস থাকলেও তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তার শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজকীয় উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করে। কৃষক ও

কৃষিকাজের উন্নতি সাধনের জন্য সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ‘দিওয়ান-ই-কোহী’ নামক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করে ‘আমির-ই-কোহী’র নিকট এর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। এই বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদেরকে ‘তাকাভি’ ঋণ প্রদান করা হত। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সুলতান অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অপরাধী উচ্চ বংশীয় কিংবা শাসক পরিবারের অন্তর্গত হলেও তাকে শাস্তি দিতে কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করা হতো না।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি পরিকল্পনা লিখুন।
---	------------------------	--

 সারসংক্ষেপ :
‘কারাউনা তুর্কি’ বংশোদ্ভূত গাজী মালিক (গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ঘটনাবল্ল রাজত্বকালে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান অভিযান, প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রচলন, কারাচিল অভিযান এবং দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি তথা পঞ্চ পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাপি নানাবিধ কারণে সুলতানের এসমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মেবারের সৈয়দ জালাল উদ্দিন ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে, পূর্ব বাংলার শাসক ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে এবং উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে স্বাধীন বাহমণী রাজ্য এবং বিজয় নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান বিদ্রোহদমনরত অবস্থায় ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা সম্পন্ন শাসক।

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮
---	-------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ‘হাজার দিনারী’ নামে খ্যাত ছিলেন-

ক. আলাউদ্দিন খলজি

খ. মালিক কাফুর

গ. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

ঘ. মুহম্মদ বিন তুঘলক

২। খলজি বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন-

ক. আলাউদ্দিন খলজি

খ. শিহাব উদ্দিন ওমর খলজি

গ. কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ খলজি

ঘ. নাসির উদ্দিন খসরু

৩। গাজী মালিক (গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) ছিলেন-

ক. দীপনপুরের শাসক

খ. দৌলতাবাদের শাসক

গ. দ্বারসমুদ্রের শাসক

ঘ. দীপালপুরের শাসক

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	---------------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

দেশভাগের পর শাহরিয়ার ভারতে চলে যান। তিনি ভারতে গিয়ে সুলতানি আমলের এমন এক শাসক সম্পর্কে অবগত হন যিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো ছিল যুগের চেয়ে অগ্রবর্তী। ঐতিহাসিক গণ সেই সুলতানকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে অভিহিত করেছেন।

১. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
২. প্রতীক তাম্রমুদ্রা বলতে কী বোঝায়? ২
৩. উপরের উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে তুঘলক বংশের যে শাসকের মিলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। ৩
৪. আপনি কি মনে করেন, উক্ত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছিল যুগের চেয়ে অগ্রবর্তী? এর মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেন। ৪

পাঠ-২.৯

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলী মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

একডালা দুর্গ, মাতামহী সুলভ ব্যবস্থাপনা, দিওয়ান-ই-খয়রাত ও ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী



ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসন লাভ

ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল রজব। তিনি ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত আবোহরের ভাটি রাজপুত রায়মলের কন্যা লায়লা (কাদবানু) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ফিরোজের ধর্মনীতি ছিল তুর্কি ও রাজপুত রক্তের সংমিশ্রণ। মাত্র ৭ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের ফলে ফিরোজ পিতৃব্য গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের নিকট লালিত পালিত হন। সুলতান তাঁকে ধর্মীয়, যুদ্ধবিদ্যা, শাসন সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধুর তাঘির বিদ্রোহ দমনরত অবস্থায় ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ খাটায় অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। সুলতানের মৃত্যুর পর রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং উপস্থিত আমির ও অভিজাতবর্গের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফিরোজ ‘ফিরোজ শাহ তুঘলক’ উপাধি ধারণ পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান হওয়ার অব্যবহিত পরই ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজকীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। গোলযোগ পূর্ব মুহুর্তে মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময় খাজা জাহান নামে একজন নায়েব, এক শিশুকে সুলতানের পুত্র বলে ঘোষণা করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে নিজে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। কিন্তু আমির উমরাহগণের ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে খাজা জাহান সুলতানের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন। তখন সুলতান তাকে সামান্য শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যবশত খাজা জাহান সামান্য ও সুনাম অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ শের খানের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

বাংলায় অভিযান

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হাজী ইলিয়াস ‘শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ’ উপাধি ধারণ করে বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা, ত্রিভুত, নেপালের কিয়দংশ এবং উড়িষ্যা বিজয় করে বেনারস পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ৭০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বয়ং বাংলা অভিযান করেন। ইলিয়াস শাহের রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। দিল্লির সুলতানের আগমনের কারণে রাজধানী পাণ্ডুয়া হতে ১০/১২ মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত একডালা দুর্গে ইলিয়াস শাহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ এ ডালা দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু কয়েক মাস একডালা দুর্গ অবরুদ্ধ থাকার পর বর্ষার আগমনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাধ্য হয়ে সৈন্যে রাজধানী দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজদরবারের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে বাংলার আমির জাফর খানের অনুরোধে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৭০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। সিকান্দার শাহ পিতৃ কৌশল অবলম্বন করে সৈন্যে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাধ্য হয়ে দীর্ঘকাল অবরোধের পর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সিকান্দার শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলী

ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন রণকুশলী যোদ্ধা এবং সুদক্ষ সেনাপতি না হলেও তিনি একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের পঞ্চ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় সুলতান ফিরোজ শাহ

তুঘলকের প্রচেষ্টার ফলে তা অনেকটাই প্রশমিত হয়। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সুলতান প্রায় ২৩ প্রকার অবৈধ কর রহিত করেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকার কারণে সুলতান কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে চার ধরনের কর ধার্য করেন। এগুলো হলো- (১) খারাজ (২) যাকাত, (৩) জিজিয়া ও (৪) খুমস। ঐতিহাসিক বারানী ফিরোজ শাহ তুঘলককে ভারতের প্রথম সত্যিকারের মুসলিম রাজা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। জনসাধারণের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে দ্রব্য মূল্যের সহনীয় মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সুলতান ৪টি খাল এবং ১৫০টি কূপ খনন করেন। ফলশ্রুতিতে অনেক অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসে। এছাড়াও তিনি কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদান করে কৃষির উন্নতিতে সহযোগিতা প্রদান করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক ধাতু ও রূপার সংমিশ্রণে ‘আধা’ (অর্ধ জিতল) এবং ‘বিক’ (জিতলের এক চতুর্থাংশ) নামক দু’ধরনের মুদ্রার প্রবর্তন করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বিচার ব্যবস্থায় মানবোচিত সংস্কার সাধন করেন। বিচার ব্যবস্থায় শারীরিক অঙ্গচ্ছেদসহ প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তি প্রথা রহিত করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন উদার ও জনকল্যাণকর শাসক। জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সুলতান বেশ কয়েকটি মানব কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ইতিহাসে ‘মাতামহী সুলভ ব্যবস্থাপনা’ (Grand-Motherly Legislation) নামে পরিচিত। এই বিভাগ থেকে এতিম ও অসহায় মুসলিম মেয়েদের বিবাহের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করা হতো। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে ‘কর্মসংস্থান সংস্থা’ নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করেন। দিল্লির কোতোয়ালের মাধ্যমে বেকার যুবকদের খুঁজে বের করে তাদেরকে যোগ্যতানুযায়ী চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দরিদ্র, এতিম, অসহায় বৃদ্ধদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে সুলতান ‘দিওয়ান-ই-খয়রাত’ নামক সরকারি সাহায্য দপ্তর স্থাপন করেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা প্রদানের জন্য সুলতান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা দারুল শেফা বিমারিস্তান নামে সর্বজন পরিচিত। এই দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ সরবরাহ করা হত। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক নির্মাতা হিসেবেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাংলা অভিযানের সময় তিনি এলাকার নামকরণ করেন আজাদপুর এবং পাণ্ডুয়ার নামকরণ করেন ফিরোজাবাদ। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি নতুন শহর স্থাপন করেন যেগুলোর মধ্যে ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর, ফিরোজপুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও সুলতান ৪টি মসজিদ, ৩০টি প্রাসাদ, ২০০টি সরাইখানা, ৫টি খাল, ৪টি হাসপাতাল, ১০০টি কবর, ১০টি স্নানাগার, ১৫৩টি কূপ, ১০টি স্মৃতিস্তম্ভ এবং ১০০টি সেতু নির্মাণ করেন। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন। নিয়মিত সৈন্যদেরকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রদান করা হতো এবং অনিয়মিত সৈন্যদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নগদ বেতন দেওয়া হত। সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল আশি থেকে নব্বই হাজার। ক্রীতদাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ নামক একটি ক্রীতদাস বিভাগ সৃষ্টি করেন। তাঁর সময়ে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৮০,০০০ জন। সুলতান ক্রীতদাসদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ছিলেন। সুলতানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী’ রচনায় লেখকের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর ৮০ বছর বয়সে ফিরোজ শাহ তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে লিখুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
---	--------------

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন প্রজাদরদী মহান শাসক। রাজ্য বিজয় অপেক্ষা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য একটি কল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন। সুলতান প্রজার উপকারে ২৩ প্রকারের কর রহিত করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ৪ ধরনের কর প্রবর্তন করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুলতান আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন। ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রদান দেশ এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন খাল ও কূপ খনন করেন এবং কৃষকদেরকে প্রয়োজনে কৃষিঋণ প্রদান করেন। বিচার ব্যবস্থায় মানবোচিত সংস্কার সাধন করে বিচার ব্যবস্থাকে উদার ও জনকল্যাণকর হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সুলতান ‘মাতামহী সুলভ ব্যবস্থাপনা’র অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। ফিরোজ শাহ তুঘলকের পিতার নাম ছিল

ক. গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	খ. মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ. রজব	ঘ. জাফর খান
- ২। ‘জৌনপুর’ নামক শহরের গোড়াপত্তন করেন

ক. গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	খ. মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ. ফিরোজ শাহ তুঘলক	ঘ. নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ
- ৩। সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্রের নাম-

ক. আলী শাহ	খ. সিকান্দার শাহ
গ. নাসির উদ্দিন শাহ	ঘ. আকবর শাহ



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সম্রাট ক্লাইভ সিংহাসনে আরোহণ করে বেশ কিছু জনহিতকর কার্যাবলী সম্পন্ন করলেন। জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তিনি ক্লাইভকে কয়েকটি কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, যে সব (কার্যাবলি) জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেইগুলিই বিশেষভাবে তার সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে দুর্বল করেছিল।

১. তুঘলক বংশ দিল্লি সালতানাতের কততম রাজবংশ ছিল? ১
২. মাতামহী সুলভ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝেন? ২
৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের জনহিতকর কার্যাবলীর সাথে তুঘলক বংশের সাদৃশ্য আলোচনা করুন। ৩
৪. উক্ত শাসকের কার্যাবলি দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী ছিল? এই মতের স্বপক্ষে বর্ণনা দিন। ৪

পাঠ-২.১০

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সৈয়দ বংশের পরিচয় দিতে পারবেন ও
- সৈয়দ বংশের শাসকদের শাসনকাল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

সৈয়দ, তৈমুর লঙ, রায়াত-ই-আলা, মোবারকবাদ ও তারিখ-ই-মোবারকশাহী



সৈয়দ বংশের পরিচয়

দিল্লি সালতানাতের পাঁচটি রাজবংশের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী রাজবংশ ছিল সৈয়দ বংশ। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে খিজির খান এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিবাসী দুর্ধর্ষ বিজেতা তৈমুর লঙ এক বিশাল তুর্কি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ অগণিত লুণ্ঠিত দ্রব্য, যুদ্ধবন্দী এবং কতিপয় বিখ্যাত শিল্পীসহ সমরকন্দের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে খিজির খানকে লাহোর, মুলতান ও দিপালপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। অর্থাৎ সমরকন্দের অধীনে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন খিজির খান। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন তুঘলক বংশের সর্বশেষ সুলতান। তিনি ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতান ছিলেন। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের পতনের পর প্রায় দুই শত বছরের তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। দিল্লির অভিজাত শ্রেণি, আমির, উমরাহ এবং মালিকগণ দৌলত খান নামক জনৈক ব্যক্তিকে দিল্লির শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে আমির তৈমুর লঙ কর্তৃক নিযুক্ত মুলতান, লাহোর এবং দিপালপুরের শাসক খিজির খান অকস্মাৎ দিল্লি আক্রমণ করে দৌলত খানকে পরাস্ত করলে তিনি খিজির খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে খিজির খান সুলতান হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খিজির খান, মুবারক শাহ, মুহাম্মদ শাহ এবং আলাউদ্দিন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের চারজন সুলতান। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বছর সৈয়দ বংশের শাসকেরা শাসন করে। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান খিজির খান নিজেকে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশধর বলে দাবি করতেন। তাই ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।

খিজির খান (১৪১৪-১৪২১ খ্রি.)

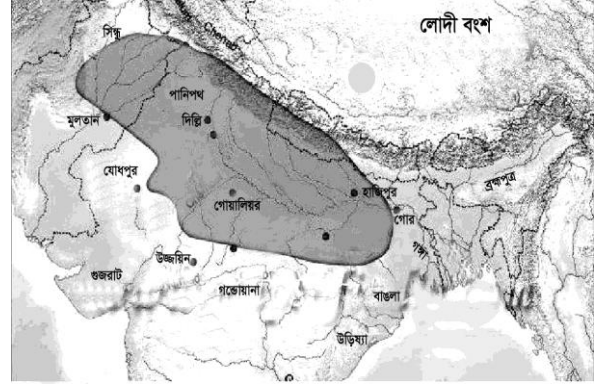
সৈয়দ বংশের ইতিহাসে অন্যতম সফল শাসক ছিলেন খিজির খান। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী খিজির খান মুলতানের শাসক মালিক নাসির উল মুলক এর নিকট লালিত পালিত হন। খিজির খান ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দৌলত খানকে পরাজিত করে সৈয়দ বংশের গোড়াপত্তন করেন। কোন ধরনের রাজকীয় উপাধি গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ‘রায়াত-ই-আলা’ উপাধি গ্রহণ করে খিজির খান প্রথমে আমির তৈমুরের এবং তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহরুখের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করেন। তিনি কামপিল, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, এটোয়া এবং মেওয়াট প্রভৃতি অঞ্চলে সফলতার সাথে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। খিজির খান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল, ধার্মিক, দয়ালু এবং ন্যায় পরায়ণ শাসক। এই সফল শাসক ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ পুত্র মুবারক শাহকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেন।

মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রি.)

খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়ন অনুযায়ী তাঁর পুত্র ‘মুবারক শাহ’ উপাধি ধারণ পূর্বক ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর সাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবের খোঙ্কার উপজাতির বিদ্রোহী নেতা জাসরাত রাজধানী দিল্লি অধিকার করার দুরভিসন্ধি করেন। উল্লিখিত সময়ে ভাতিন্দা ও দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হলে মুবারক শাহ তা

কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন। পাঞ্জাব, রোহিলাখন্ড এবং দোয়াবে আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে মুবারক শাহ দিল্লি সালতানাতের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। প্রশাসনে নিযুক্ত আমির, মালিক এবং জায়গীরদারদের বিদ্রোহী মনোভাব দূরীভূত করার মানসে মুবারক শাহ শাসনে ব্যাপক রদবদল করেন। তিনি কামাল-উল-মুলককে সহ-উজির হিসেবে নিযুক্ত করে উজির সারোয়ার-উল-মুলক এর বিরাগভাজন হন। উজির সারোয়ার-উল-মুলক এর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম, আমির-মালিক ও জায়গীরদারদের সম্মিলিত বিরোধী শক্তির গভীর ষড়যন্ত্রে মুবারক শাহ ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি মোবারকবাদের এক মসজিদে নামাজরত অবস্থায় জনৈক আততায়ীর হস্তে নির্মমভাবে নিহত হন।

মুবারক শাহ ছিলেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর শাসনামলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ‘তারিখ-ই-মুবারক শাহী’। মুবারক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটি রচনা করে মুবারক শাহের নামে উৎসর্গ করে নামকরণ করেন ‘তারিখ-ই-মুবারক শাহী’। মুবারক শাহ আমির তৈমুরের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আনুগত্য অস্বীকার করে বরং মিশরের খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তিনি স্বাধীন শাসক হিসেবে ‘মুইজ-উদ-দীন মুবারক শাহ’ উপাধি ধারণ করে নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। সুদক্ষ শাসক এবং নির্মাণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক মুবারক শাহ যমুনা নদীর তীরবর্তী স্থানে মোবারকবাদ নামক একটি শহর নির্মাণ করেন।



লোদী বংশের রাজ্য সীমা

মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রি.)

মুবারক শাহের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় ভ্রাতা ফরিদের পুত্র এবং মুবারক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ পরবর্তীতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুবারক শাহের রাজত্বকালে এবং মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের প্রথমার্ধে প্রভাবশালী উজির ছিলেন সারোয়ার-উল-মুলক। উজির সারোয়ার-উল-মুলকের মৃত্যুরপর মুহম্মদ শাহ কামাল-উল-মুলককে উজির হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ শাহের শাসনামলে তার দুর্বলতার সুযোগে অভিজাত শ্রেণি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময় মালবের শাসনকর্তা মাহমুদ খলজি এবং সিরহিন্দ ও লাহোরের শাসক বাহলুল খান লোদী দিল্লি অধিকার করার চেষ্টা করেন। তবে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর শাসনামলে গোয়ালিয়র সুলতানের নিকট কর প্রদানে অস্বীকার করে এবং এ সময়কালে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শরকী দিল্লির কয়েকটি পরগণা অধিকার করে নেন। ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন।

আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১ খ্রি.)

সুলতান মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন দিল্লির আমির, উমরাহ ও অভিজাত শ্রেণির সমর্থনপুষ্ট হয়ে ‘আলাউদ্দিন আলম শাহ’ উপাধি ধারণ করে সৈয়দ বংশের সর্বশেষ শাসক হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও অকর্মণ্য সুলতান। সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী হামিদ খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। সুলতান ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাধ্য হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ পাঞ্জাবের শাসক বাহলুল খান লোদীর সহায়তা গ্রহণ করেন। বাহলুল লোদী সুলতানের সহায়তায় হামিদ খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু তারপর বাহলুল লোদী নিজেই দিল্লি দখল করে নিলে সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ তাঁর হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে স্বেচ্ছায় তাঁর প্রিয় স্থান বদাউনে গমন করেন। বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং লোদী বংশের গোড়াপত্তন করেন। আর এভাবেই দিল্লির ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সৈয়দ বংশের পতন লিখুন।
---	-----------------	------------------------

	সারসংক্ষেপ :
১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙের ভারত অভিযানে সাহায্যকারী খিজির খান পুরস্কার স্বরূপ লাহোর, মুলতান ও দিপালপুরের শাসক নিযুক্ত হন। সমরকন্দের অধীনস্থ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শাসক খিজির খান ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দের দৌলত খানকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা করে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন। এ বংশের সর্বমোট ৪ জন শাসক প্রায় ৩৭ বছর ধরে উপমহাদেশে শাসন করেন। এই বংশের চারজন শাসকের মধ্যে প্রথম তিনজন যোগ্যতার পরিচয় দিলেও সর্বশেষ শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ ছিলেন দুর্বল এবং অযোগ্য। তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করলে সৈয়দ বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০
---	-------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ছিলেন-

ক. খিজির খান	খ. মুবারক শাহ
গ. মুহম্মদ শাহ	ঘ. আলাউদ্দিন আলম শাহ
- সমরকন্দের অধীনে খিজির খান ছিলেন ভারতের-

ক. পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা	খ. পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা
গ. উত্তরাঞ্চলের শাসনকর্তা	ঘ. দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তা
- তুঘলক বংশের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন-

ক. হুমায়ুন শাহ	খ. নসরত শাহ
গ. নাসির উদ্দিন মাহমুদ	ঘ. দৌলত খান
- তৈমুর লঙ ভারত অভিযান করেন-

ক. ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে	খ. ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে	ঘ. ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

দিল্লি সালতানাতের একটি রাজবংশের শাসক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ্কে ভারত অভিযানে সাহায্য করেছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ বেশ কিছু জায়গা লাভ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের সর্বশেষ শাসকের সাথে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলুল লোদী এক যুদ্ধের মাধ্যমে এ বংশটির শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

- দিল্লি সালতানাতের পঞ্চম রাজবংশ কোনটি? ১
- রায়াত-ই-আলা উপাধি গ্রহণকৃত শাসকের পরিচয় লিখুন? ২
- “খিজির খানের বংশে মুবারকশাহ ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম শাসক” এ মন্তব্যটি সম্পর্কে ধারণা দিন। ৩
- উদ্দীপকে উল্লেখিত রাজবংশের সাথে আপনার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট রাজবংশের পতনের কারণগুলো বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-২.১১ লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লোদী বংশের পরিচয় ও বাহলুল লোদী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সিকান্দার লোদীর শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন; ও
- ইব্রাহিম লোদী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

লোদী, খান-ই-খানান, নিজাম খান, জালালী শহর ও তিকরী সিকান্দারী



লোদী বংশের পরিচয়

দিল্লি সালতানাতের অন্যতম প্রভাবশালী এবং সর্বশেষ রাজবংশ ছিল লোদী বংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাহলুল খান লোদী। তিনি সুলতানি শাসন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সৈয়দ বংশের সর্বশেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ এবং প্রধান মন্ত্রী হামিদ খানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সুলতান পাঞ্জাবের প্রতাপশালী শাসনকর্তা বাহলুল খান লোদীকে আমন্ত্রণ জানান। বাহলুল লোদী ও সুলতানের সম্মিলিত শক্তি হামিদ খানকে পরাজিত ও নিহত করে। এই ঘটনার পর শক্তিশালী শাসক বাহলুল লোদী দিল্লি দখল করে নেন। বাধ্য হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ বাহলুল লোদীর হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা অর্পণ করে তাঁর প্রিয় স্থান বদাউনে গমন করে সেখানে অবসর জীবন যাপন করেন। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল বাহলুল লোদী নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে মধ্যযুগীয় ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম প্রভাবশালী রাজবংশ লোদী বংশের গোড়াপত্তন করেন। বাহলুল লোদী, সিকান্দার লোদী এবং ইব্রাহিম লোদী ছিলেন এই বংশের তিনজন সুলতান। তাঁরা ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইব্রাহিম লোদী ছিলেন লোদী বংশের এবং সেই সাথে দিল্লি সালতানাতের সর্বশেষ সুলতান। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঐতিহাসিক পানি পথের প্রথম যুদ্ধে কাবুলের অধিপতি ও পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে লোদী বংশসহ দিল্লি সালতানাতের অবসান ঘটে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে আবির্ভূত হয় মুঘল বংশ।

বাহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রি.)

বাহলুল লোদীর পিতামহের নাম মালিক বাহরাম। তুঘলক বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে মালিক বাহরাম মুলতানের তৎকালীন শাসক মালিক মর্দান দৌলতের নিকট চাকরি গ্রহণ করেন। খিজির খান ছিলেন সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান। তাঁর শাসনামলে বাহলুল লোদীর পিতা মালিক খান এবং পিতৃব্য ইসলাম খান (সুলতান শাহ) রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলাম খান মৃত্যুবরণ করলে বাহলুল লোদীকে সিরহিন্দ ও লাহোরের শাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সৈয়দ বংশের তৃতীয় শাসক মুহম্মদ শাহের শাসনামলে মালব অঞ্চলের বিখ্যাত শাসনকর্তা মাহমুদ শাহ খলজী বিদ্রোহ করলে সিরহিন্দ ও লাহোরের শাসনকর্তা বাহলুল লোদী তাঁকে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। এতে সুলতান মুহম্মদ শাহ সন্তুষ্ট হয়ে বাহলুল লোদীকে ‘খান-ই-খানান’ উপাধি প্রদান করেন। সৈয়দ বংশের সর্বশেষ শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করলে বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল দিল্লির মসনদে আরোহণ করে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, বাহলুল লোদী ছিলেন আফগান জাতির লোদী উপদলভুক্ত লোক। বাহলুল লোদী জৌনপুরের শাসক মাহমুদ শাহ শরকীর দিল্লি আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাম্রাজ্যের দরিয়া খান লোদী, সুকেতের মুবারক খান, মেওয়াটের আহমদ খান, রেওয়াবীর কুতুব খান, ঈশা খান প্রমুখ এবং চান্দওয়া, এটোয়া ও দোয়াবের সামন্ত রাজগণ সুলতান বাহলুল লোদীর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। বাহলুল লোদী জৌনপুরকে দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বরবক শাহকে জৌনপুরের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি পাঞ্জাবকে দিল্লি সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়রের রাজা কিরাত সিংহও বাহলুল লোদীর নিকট আনুগত্য

স্বীকার করেন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ অবস্থায় সুলতান বাহলুল লোদী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতি একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। সুলতান বাহলুল লোদী ছিলেন লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বহুমুখী প্রতিভা এবং রাজ্যশাসন পদ্ধতি বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে উপবেশনকারী সুলতানদের মধ্যে বাহলুল লোদী ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক।

সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭খ্রি.)

লোদী বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার লোদী ছিলেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল নিজাম খান। সুলতান বাহলুল লোদীর মৃত্যুর পর এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এসময় আমির উমারাহদের প্রাথমিক বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজাম খান 'সিকান্দার শাহ লোদী' উপাধি ধারণ করে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে জৌনপুরের শাসক এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরবক শাহ সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করে জৌনপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিকান্দার লোদী বিদ্রোহী ভ্রাতাকে অপসারণ করে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং তদস্থলে নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ প্রদান করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সুলতান সিকান্দার লোদী ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসক সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সাথে সুলতান সিকান্দার লোদী এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ আত্মা নগরীর গোড়াপত্তন করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। সুলতান সিকান্দার লোদী ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। লোদী বংশের অন্যতম সফল শাসক সুলতান সিকান্দার লোদী ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, ন্যায় পরায়ণ সমরকুশলী এবং প্রজাবৎসল শাসক। তিনি ছিলেন দরিদ্র প্রজা সাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক এবং সদা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে সুলতান সিকান্দার লোদী শস্যকর এবং অভ্যন্তরীণ শুল্ক রহিত করেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য সুলতান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এমনকি সাহিত্য ও চিকিৎসা শাস্ত্রেরও একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'তিকরী সিকান্দারী' ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬খ্রি.)

ইব্রাহিম লোদী ছিলেন সুলতান সিকান্দার লোদীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর সুলতান সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী, সুলতান 'ইব্রাহিম শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর কুচক্রী অভিজাত শ্রেণির একটি দল সুলতানের কনিষ্ঠ ভাই জালাল উদ্দিনকে জৌনপুরের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদী প্রভাবশালী অভিজাত ফতেহ খান ও খান জাহানের সাহায্যে বিদ্রোহী ভ্রাতা জালাল উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইব্রাহিম লোদীর উদ্ধত ব্যবহার ও কঠোর নিয়মনীতির ফলে আফগান অভিজাত শ্রেণি ক্ষুব্ধ হয়। সুলতান আফগান অভিজাতদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর কঠোরনীতি ও নিষ্ঠুর আচরণে অসন্তুষ্ট আফগান আমির উমারাহদের বিশেষ অনুরোধে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদী, ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান এবং রাজপুতনার মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের সম্মিলিত শক্তি কাবুলের অধিপতি বিখ্যাত সমরনেতা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে আহবান করেন। বাবর এই আহবানে সাড়া দিয়ে ভারত আক্রমণ করেন এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের গোড়াপত্তন করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদী ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, নির্ভীক এবং সাহসী সুলতান। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক এবং দানশীল শাসক। পিতা সিকান্দার লোদীর ন্যায় সুলতান ইব্রাহিম লোদীও ছিলেন সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত। মানুষ হিসেবে তিনি উদার ও দয়ালু হলেও শাসক সুলতান দুর্বলতার কারণে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রি.) বাবরের হাতে তাঁর পতন ঘটে। আর এর ফলে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে।



শিক্ষার্থীর কাজ

ইব্রাহিম লোদী ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, নির্ভীক এবং সাহসী সুলতান-ব্যাক্ষা করুন।



সারসংক্ষেপ:

বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল দিল্লি সালতানাতের চতুর্থ রাজবংশ সৈয়দ বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে লোদী বংশের গোড়াপত্তন করেন। লোদী বংশের প্রথম শাসক বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর পুত্র সুলতান সিকান্দার লোদী এই বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। লোদী বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬খ্রি.) কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের নিকট পানি পথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলে দিল্লি সালতানাতের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের শাসন শুরু হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ছিলেন-

ক. বাহলুল লোদী

খ. সিকান্দার লোদী

গ. ইব্রাহিম লোদী

ঘ. আশরাফ লোদী

২। বাহলুল লোদীর পিতার নাম ছিল-

ক. সালিক কালান

খ. মালিক খান

গ. মালিক বাহরাম

ঘ. মালিক গফুর

৩। বাহলুল লোদীকে 'খান-ই-খানান' উপাধি প্রদান করেন-

ক. খিজির খান

খ. মোবারক শাহ

গ. মুহম্মদ শাহ

ঘ. আলাউদ্দিন আলম শাহ



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

উজানীনগরের 'কাসিমী' বংশের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। স্থানীয় শাসক ইরহামউদ্দিন স্বেচ্ছায় শক্তিশালী শাসক কাসিম বিন হাফিজের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দেন। তিনি একাধারে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ শাসক। এ বংশের শেষ শাসক মুহজাবউদ্দিন বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হন। যুদ্ধে বহিঃশত্রু কামান ব্যবহার করে। তিনি পরাজিত হন এবং এ বংশের পতন ঘটে।

১. লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১

২. সিকান্দার লোদীর পরিচয় লিখুন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাসিম বিন হাফিজের সাথে বাহলুল লোদীর সাদৃশ্য মূল্যায়ন করুন।

৩

৪. ইব্রাহিম লোদীর কঠোর নীতি ও নিষ্ঠুর আচরণ লোদী বংশের পতন ত্বরান্বিত করে- ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরুন।

৪

পাঠ-২.১২

সুলতানি আমলে ভারতের অর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উৎস সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- সুলতানি আমলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

‘রিহালা-ই-ইবনে বতুতা’, আশরাফ, আতরাফ, বর্ণভেদ প্রথা, জিম্মি ও জিজিয়া



সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উৎস অপ্রতুল। তবে সুলতানি আমলে আগমনকারী বিদেশী পর্যটকদের মনোভঙ্গ ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ থেকে ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা যায়।

সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারত মূলত: একটি কৃষি প্রধান দেশ। সুলতানি আমলে ভারতের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দিল্লির সুলতানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ) কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৫টি খাল এবং ১৫৩টি কূপ খনন করেন। এর ফলে অসংখ্য পতিত ও অনাবাদী ভূমি কৃষির আওতাধীনে আসে। এছাড়াও কৃষিক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষি সহায়তা প্রদান করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃষির প্রভূত উন্নতি বিধান করেন। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনানুযায়ী সুলতানি আমলে ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুলতানদের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সুলতানি আমলে ভারতে তাঁতশিল্পের বিকাশ ঘটে। সুলতান ও অভিজাত শ্রেণীর চাহিদানুযায়ী শুধুমাত্র দিল্লিতে সরকারি কারখানায় প্রায় চার হাজার তাঁতী নিয়োগ করা হয়েছিল। এ সময় ভারতের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন শহর, নগর এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরির জন্য শিল্প ও কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল কাপড়, শাড়ী, ধুতি, রেশম ও পশমের বস্ত্র, চিনি এবং কাগজ প্রভৃতি। সুলতানি আমলে বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য, বস্ত্র এবং নানা রকম মসলা ছিল প্রধান রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। বিলাসজাতীয় সামগ্রী, ঘোড়া ও অন্যান্য ভারবাহী পশু বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। বাংলা ও গুজরাট হতে সর্বাধিক পরিমাণ সুতি দ্রব্য এসময় বিদেশে রপ্তানি হতো বলে বিদেশী পর্যটকরা উল্লেখ করেছেন। সুলতানি আমলে ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ন্যায্য বহির্বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। জল এবং স্থল উভয় পথে তৎকালীন সময় বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দেশের সঙ্গে জলপথে এবং মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, তিব্বত ও ভুটান এর সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা ও গুজরাটের বন্দর। তুলা, আদা, চিনি, খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন রকমের মাংসের প্রাচুর্যের কারণে বিদেশী পর্যটক বারংবার বাংলাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মরক্কোবাসী মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইবনে বতুতার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী ‘রিহালা-ই-ইবনে বতুতা’ নামক গ্রন্থে সুলতানি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতার মতে, তখন বাংলায় ৩ টাকায় ১টি ভালো গরু এবং ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। সুলতানি আমলে ভারতের গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জন্য গ্রামের অধিবাসীদেরকে অন্যত্র যেতে হতো না।

সুলতানি আমলে সামাজিক অবস্থা

সুলতানি আমলে ভারতের প্রধান হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করত। এ আমলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক সংমিশ্রণের পথ নানাবিধ কারণে রুদ্ধ ছিল। ভারত জয় করার মাধ্যমে মুসলিমগণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে নিজস্ব সংস্কৃতি লালন করতে শুরু করেন। অপরদিকে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হিন্দু সমাজেও রক্ষণশীলতা প্রসূত সংকীর্ণতা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রণের পরিবর্তে পার্থক্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমান সমাজের অবস্থা

সুলতানি আমলে ভারতে মুসলমান সমাজ দু'টো শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা (১) অভিজাত শ্রেণি- যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত এবং (২) সাধারণ শ্রেণি-স্থানীয় অধিবাসী যারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত। অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল তুর্কি, ইরানি, তুরানি, আরব ও আফগানদের নিয়ে। এই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই নিজেদেরকে শেখ, সৈয়দ, পাঠান ও গাজী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন। অভিজাত শ্রেণি ছিল শাসক শ্রেণী। যারা 'আশরাফ' নামে পরিচিত ছিল। আর সাধারণ শ্রেণি ছিল শাসিত শ্রেণি। যারা 'আতরাফ' নামে পরিচিত ছিল। দিল্লি সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে সাধারণত অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের নিয়োগ দেয়া হত। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন- আমির, উজির, কাজি, মুফতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সেনাপতি প্রভৃতি পদে তারা নিযুক্ত হতেন। কোনো সুলতান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে আন্তঃকোন্দল দেখা দিত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরীদের শাসনামলে অভিজাত শ্রেণি উপদ্রব শুরু করলে বাধ্য হয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ও সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। দিল্লি সালতানাতের সর্বশেষ রাজবংশ লোদী বংশের শাসনামলে অভিজাত শ্রেণীর একটি দল কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। লোদী বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু সমাজের অবস্থা

মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট উদার ও মানবিক ব্যবহার করতেন। ভারতে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা (Caste system) প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ নীতি দ্বারা আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। সুলতানগণ হিন্দুদেরকে জিম্মির মর্যাদা প্রদান করে তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ও উদার নীতি গ্রহণ করেন। দিল্লির সুলতানি শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত ও রাজকীয় উচ্চ পদে দায়িত্বপালন করত। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। মুসলিম শাসকরা সামরিক কার্য হতে অব্যাহতি দেওয়ার বিনিময়ে হিন্দুদের উপর জিজিয়া নামক এক ধরনের নিরাপত্তা কর আরোপ করেন। কিন্তু সামরিক কার্যে যোগদানকারীদের জিজিয়া প্রদান করতে হতো না। ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে হিন্দুরাও মুসলমানদের পাশাপাশি সমানভাবে অংশগ্রহণ করত। দীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে সুলতানি আমলে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজ পরস্পরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুদের শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ঐতিহ্য ও দর্শন মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।

দাস প্রথা

সুলতানি আমলে ভারতে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। জিনিসপত্রের ন্যায় হাট-বাজারে দাস-দাসী বিক্রি হত। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক, শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রাথমিক জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ তাঁর বিশ্বস্ত ৪০ জন তুর্কি ক্রীতদাসের সমন্বয়ে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে ৫০ হাজার এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে প্রায় ৪০,০০০ ক্রীতদাস সুলতানের প্রাসাদে বসবাস করত। সুলতান এমনকি ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' নামক একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করেন।

নারীর অবস্থা

সুলতানি আমলে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে নারীদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসারে জীবনযাপন করতেন। অভিজাত পরিবারে মেয়েরা সাধারণত শিল্প ও

বিজ্ঞান চর্চা করতেন। গ্রামীণ রমণীরা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পর্দা প্রথা মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিজাত রমণীদের মধ্যেও দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ এবং ‘জহরব্রত প্রথা’ হিন্দু সমাজে পালন করা হত।

সুলতানি আমলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস

সুলতানি আমলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে ভারতের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ আমলে ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের সংস্কৃতি বহুলাংশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের ফলে মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির মধ্যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ও সংমিশ্রণে পরস্পর প্রভাবের আদান প্রদানের ফলে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে আচার-আচরণ, ধর্মকর্ম, ভাবভাষা, রীতি-নীতি নিয়মকানুন প্রভৃতির বিনিময় ঘটেছিল। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে হিন্দু ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান শুধুই যে উপাদান গ্রহণ করেছিল এমনটি নয় বরং হিন্দু সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং মানসিক গঠনেও পরিবর্তন এসেছিল, মুসলমানরাও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের ধারায় সমানভাবে সাড়া দিয়েছিল।



শিক্ষার্থীর কাজ

সুলতানি আমলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখুন।



সারসংক্ষেপ :

সুলতানি আমলে ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে মুসলমানদের সংস্কৃতি বহুলাংশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের ফলে মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফলে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, ভাব-ভাষা, রীতি-নীতি নিয়মকানুন প্রভৃতির বিনিময় ঘটেছিল। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে হিন্দু ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান শুধুই যে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছিল এমনটি নয়; এমনকি হিন্দু সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং মানসিক গঠনেও পরিবর্তন এনেছিল, মুসলমানরাও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের ধারায় সমানভাবে সাড়া দিয়েছিল।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। চীনা পর্যটক মাছুয়ান আগমন করেন-

- ক. সিকান্দার শাহের রাজদরবারে
গ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজদরবারে

- খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের রাজদরবারে
ঘ. গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের রাজদরবারে

২। বারবোসা ভারতে আগমন করেন-

- ক. ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে

- খ. ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে
ঘ. ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে

৩। ইবনে বতুতা ছিলেন-

- ক. চীন দেশীয় পর্যটক
গ. জাপানের পর্যটক

- খ. মরক্কোর পর্যটক
ঘ. ইংল্যান্ডের পর্যটক

৪। ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন-

- ক. ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে

- খ. ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে
ঘ. ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

দিল্লি নগরীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ‘ক’ আমলের ইতিহাস। এসময় ভূমি রাজস্ব ছাড়াও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম পরিচায়ক ছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল পার্থক্য। সমাজে ছিল উচ্চ-নিচু স্তরবিন্যাস। তবে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১. সুলতানি আমলে আয়ের প্রধান উৎস কি ছিল? ১
২. সুলতানি আমলে আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার উৎস সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসনামলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিন। ৩
৪. সামাজিক স্তরবিন্যাস সকল সমাজে বিদ্যমান-এই উক্তি়র আলোকে সুলতানি আমলে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চিত্র উপস্থাপন করুন। ৪

পাঠ-২.১৩

দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দিল্লি সালতানাতের অবক্ষয়ের প্রত্যেকটি কারণ আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- দিল্লি সালতানাতের পতনের সামগ্রিক কারণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বন্দেগান-ই-চেহেলগান, দিওয়ান-ই-বন্দেগান ও পানি পথের যুদ্ধ



দিল্লি সালতানাতের পতন

১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরের অধিপতি মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম ওরফে মুহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজ চৌহান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। মুহম্মদ ঘোরি গজনীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁর সুযোগ্য এবং বিশুদ্ধ সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের বিজিত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে অপূত্রক অবস্থায় মুহম্মদ ঘোরি মৃত্যুবরণ করলে কুতুবউদ্দিন আইবেক মুহম্মদ ঘোরি ভ্রাতুষ্পুত্র ও ঘুর রাজ্যের অধিপতি গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক ‘সুলতান’ উপাধি এবং মুক্তির ছাড়পত্র লাভ করে এবং দিল্লি সালতানাতের প্রথম সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করে তথাকথিত দাস বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মামলুক বংশ (দাস বংশ), খলজি বংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ এবং লোদী বংশ এই পাঁচটি রাজবংশ ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সালতানাতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক বংশের পতনের সাথে সাথেই তুর্কি সাম্রাজ্য অর্থ্যাৎ দিল্লি সালতানাত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তুঘলক বংশের পর সৈয়দ ও লোদী বংশ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতানি শাসন পরিচালনা করেছিল। অবশেষে লোদী বংশের দুর্বল শাসক ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে এবং দিল্লি সালতানাতের অবসান ঘোষণা করে ভারতবর্ষে মুঘল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণসমূহ:

সুলতানদের স্বেচ্ছাতন্ত্র

ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লির সুলতানদের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাতন্ত্রের উপর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান ছিলেন রাজ্য শাসনের সর্বশক্তি ও ক্ষমতার উৎস। সুলতানদের নিজস্ব ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের উপর দিল্লি সালতানাতের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল ছিল। শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুলতানদের শাসনামলে সাম্রাজ্যব্যাপী সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো এবং সর্বত্র নিয়ম-কানুন মেনে চলা হতো। কিন্তু দুর্বল ও অকর্মণ্য শাসকদের শাসনামলে সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ ও অরাজকতা বিরাজমান থাকত। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক, শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি ও ফিরোজ শাহ ব্যতীত দিল্লির অধিকাংশ সুলতান ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য ও অকর্মণ্য। এসমস্ত দুর্বল সুলতানদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব

সুলতানি আমলে ভারতে কোন সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। ফলে সালতানাতকে কেন্দ্র করে গোলযোগ দেখা দিত। সিংহাসনের দাবীকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব গৃহ-বিবাদ, অন্তর্কলহ, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ার কারণে সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব। দিল্লি সালতানাতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে অভিজাত শ্রেণী হস্তক্ষেপ করত। সুলতানদের উত্থান-পতনে তাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা স্পৃহা

দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা স্পৃহা। তুর্কি-আফগান শাসনামলে দিল্লির অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসকগণ নিজ নিজ প্রদেশে ছিলেন সব ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রায়শই বিদ্রোহ করতেন এবং মাঝে মাঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। দুর্বল ও অযোগ্য সুলতানদের শাসনামলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিভিন্ন প্রদেশে গোলযোগ সৃষ্টি করতেন।

সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা

দিল্লির সুলতানগণ ছিলেন অতিমাত্রায় সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। এর ফলে প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য ও জাতীয়তাবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নির্লিপ্ত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সামরিক শক্তি নির্ভর দিল্লি সালতানাত বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

সাম্রাজ্যের বিশালতা

দিল্লি সালতানাত সমগ্র উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে দিল্লি সালতানাতের আয়তন বিশাল আকার ধারণ করে। বিশাল সাম্রাজ্যে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত। শক্তিশালী ও সুদক্ষ সুলতানগণ এসকল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অদক্ষ সুলতানদের শাসনামলে এসকল বিদ্রোহ দমন ছিল প্রায় অসম্ভব।

অভিজাত শ্রেণির দৌরাত্ম

অভিজাত শ্রেণীর দৌরাত্ম ও দিল্লি সালতানাতের পতনে ভূমিকা পালন করেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র কায়কোবাদের শাসনামলে তাঁর উজির নিজামউদ্দিনের কুশাসন, আলাউদ্দিন খলজির দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে মালিক কাফুরের নির্যাতন, দুঃশাসন এবং কটরপন্থী খসরু খানের অপশাসন প্রভৃতির ফলে সাম্রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সূচিত হয়েছিল। এর ফলে সালতানাতের অন্তর্নিহিত শক্তির অবক্ষয় ঘটেছিল।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রসূত পরিকল্পনা

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী এবং যুগের চেয়েও অগ্রগামী শাসক। তাঁর অবাস্তব আদর্শবাদিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রসূত বার্থ পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে দিল্লি সালতানাতের সংহতি ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল হতে থাকে। তাঁর শাসনামলে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন উদার ও ধার্মিক শাসক। দিল্লি সাম্রাজ্যের পূর্বের গৌরব পুনরুদ্ধার করার মত শক্তি তাঁর ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে, জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, উত্তরাধিকারসূত্রে সামরিক পদ লাভ, অযৌক্তিক উদারতা প্রদর্শন এবং ক্রীতদাস প্রথা প্রবর্তন করে তিনি দিল্লি সালতানাতের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

নৈতিক অধঃপতন

দিল্লি সালতানাতের শেষ পর্বের সুলতানগণ ও অভিজাতশ্রেণীর নৈতিক স্বলন সালতানাতের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। অধিকাংশ সুলতান মদ, নারী ও বিলাসিতায় ডুবে থাকার ফলে একজন আদর্শ রাষ্ট্র নায়কের মহান গুণাবলী ছিল তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রনায়কের তেজস্বিতা, কর্মক্ষমতা ও সাহস হারিয়ে ফেলার কারণে সাম্রাজ্যের ভিত ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। সুলতান, অভিজাতশ্রেণী এবং রাজকর্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী জীবন যাপনের ফলে দিল্লি সালতানাত ক্রমাগতভাবে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল।

ক্রীতদাস প্রথার কুফল

দিল্লির সুলতানগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্রীতদাস প্রথা বিদ্যমান রেখেছিলেন। ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে কয়েকজন পরবর্তীতে সুলতানের মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ তাঁর বিশৃঙ্খল ৪০ জন ক্রীতদাসদের নিয়ে ‘বন্দেগান-ই-চেহেলগান’ বা ‘চল্লিশ চক্র’ গঠন করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন এই চল্লিশ চক্রের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। তিনি সুলতান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর চল্লিশ চক্রের কিছু সদস্য তাঁর বিরোধিতা করেছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ নামক একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করেন।

তাঁর শাসনামলে ক্রীতদাসদের সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০০ এ উন্নীত হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় হতো। তদুপরি ক্রীতদাসদের মধ্যকার অন্তর্কলহ ও বিবাদের ফলে দিল্লি সালতানাত পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল।

অমুসলিমদের বিরোধিতা

ভারত ছিল একটি হিন্দু অধ্যুষিত দেশ। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ ও বৈরী মনোভাব এবং অমুসলিম প্রজাবর্গের প্রতিবন্ধকতার ফলে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘনীভূত হয়েছিল। উত্তর ভারতের রাজপুত শক্তি এবং দাক্ষিণাত্যের হিন্দু সম্প্রদায় পরিস্থিতি অনুকূল পেলেই দিল্লি সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কুণ্ঠিত হতো না। কোন কোন সুলতান হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান এবং স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকার প্রদান করলেও রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম শাসন মনে প্রাণে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ

ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দ্রাস ও দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লঙ ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে দিল্লি দখল করেন। তিনি দিল্লিতে ১৫ দিন লুণ্ঠন, ধ্বংস এবং ১,০০,০০০ নিরীহ অধিবাসীকে হত্যা করে সিরি, পুরাতন দিল্লি, জাহানপানাহ, ফিরোজাবাদ, মীরাট, হরিদ্বার, নগরকোট প্রভৃতি স্থানেও ব্যাপক হত্যাकाণ্ড ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লি সালতানাতের পতনোন্মুখ সময়ে তৈমুরের ভারত আক্রমণ এবং পৈশাচিক হত্যাकाণ্ড ও নজিরবিহীন লুণ্ঠন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারঘাত করেছিল।

বাবরের আক্রমণ ও সালতানাতের পতন

দিল্লি সালতানাতের সর্বশেষ রাজবংশ লোদী বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদীর উদ্যত আচরণ ও কঠোর দমন নীতির ফলে অসন্তুষ্ট আফগান অভিজাত শ্রেণি, পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান এবং মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান। উচ্চাভিলাষী এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর বাবর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণগুলো লিখুন।



সারসংক্ষেপ :

ইব্রাহিম লোদীর উদ্যত আচরণ ও কঠোর দমন নীতির ফলে অসন্তুষ্ট আফগান অভিজাত শ্রেণি, পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান এবং রাজপুতনার মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান। উচ্চাভিলাষী এবং সাম্রাজ্যবাদী বাবর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের সর্বশেষ শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘোষণা করেন এবং ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন-

ক. সুলতান মাহমুদ

খ. মুহম্মদ ঘোরি

গ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

ঘ. শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

২। দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-

- ক. ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে খ. ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে

৩। দিল্লি সালতানাতের সর্বমোট রাজবংশ ছিল-

- ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

৪। দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটেছিল-

- ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে
গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

কোনো রাজবংশই চিরকাল টিকে থাকে না। এ উক্তিই বাস্তব প্রমাণ ভাতুরিয়ার জমিদার বংশের ইতিহাস। শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্থাপত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখলেও একসময় এ শাসনের অবসান ঘটে। পরপর পাঁচটি বংশ এ সময় ক্ষমতায় আসে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ ও বিশ্লেষণে জানা যায় অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ এ শাসনের পতন ইতিহাস রচনা করে। কাবুলের শাসক অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এ রাজ্য আক্রমণ করে। তার হাতে এ শাসনামলের পতন ঘটে।

১. সুলতানি আমলের পাঁচটি রাজবংশের নাম লিখুন। ১
২. দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের ঘটনা উল্লেখ করুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বংশের পতনের আলোকে আপনার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শাসনামলের পতনের কারণ উল্লেখ করুন। ৩
৪. কোন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রসূত পরিকল্পনা দিল্লি সালতানাতের পতন ত্বরান্বিত করেছিল তা লিখুন। ৪



উত্তরমালা

- পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। খ ২। ঘ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। খ ২। খ ৩। খ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। ঘ ২। গ ৩। ক
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ : ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ক
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮ : ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯ : ১। গ ২। গ ৩। খ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১ : ১। ক ২। খ ৩। গ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২ : ১। ২। ৩। খ ৪। গ
পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩ : ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। গ

ভারতবর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)

ইউনিট

৩

ভূমিকা

ভারতবর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি:)

ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের সূচনা ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ১৫২৬ খ্রি. জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশ কয়েক শতাব্দি ধরে শাসন পরিচালনা করে। জানা যায় যে, মুঘল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গ' বা 'মোঙ্গল' শব্দ হতে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন পিতার দিক থেকে চেঙ্গিস খান এবং মাতার দিক হতে তৈমুর লঙ এর বংশধর। মুঘল বংশ প্রাথমিকভাবে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি নিয়ে ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা হারালে পরবর্তী ১০০ বছর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসকগণ নামমাত্র শাসক হিসেবে পরিণত হয়। তবে গৌরব ও আধিপত্যের যুগে মুঘলরা ছিল পারস্যের সাফাভী ও তুরস্কের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দী। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব প্রমুখ। আকবর ছিলেন রাজ্যবিজেতা, সমরকুশলী এবং প্রজাবান ও কূটনৈতিক শাসক। শিল্পকলা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও স্থাপত্য বিদ্যায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান। গোঁড়া সুন্নী মতবাদ ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য আওরঙ্গজেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অবসানের আগ পর্যন্ত মুঘল বংশই ছিল ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং শক্তি ও সংহতির উৎস, এই বংশের অবসানের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- পাঠ- ১ : ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ২ : সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব
- পাঠ- ৩ : শূর বংশ: শেরশাহের শাসন সংস্কার
- পাঠ- ৪ : শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৫ : সম্রাট আকবর: রাজ্য বিজয়, ধর্মনীতি ও রাজপুত নীতি
- পাঠ- ৬ : সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা, সংস্কারসমূহ ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৭ : সম্রাট জাহাঙ্গীর: নূরজাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৮ : সম্রাট শাহজাহান: স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৯ : সম্রাট আওরঙ্গজেব: দক্ষিণাত্য নীতি, ধর্মনীতি, শাসন পদ্ধতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ১০ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল
- পাঠ- ১১ : মুঘলদের প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
- পাঠ- ১২ : মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন

পাঠ-৩.১

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাবরের প্রাথমিক জীবন ও অভিযানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন ও
- বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	ফারগানা, সমরকন্দ, কাবুল, পাদশাহ (বাদশাহ), পানিপথ, রাজপুত, গাজী ও আফগান
-----	------------	--



বাবরের প্রাথমিক জীবন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ছিলেন দুর্ধর্ষ সমর নেতা তৈমুরের বংশধর এবং ফারগানা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। তাঁর মাতা কুতলুঘ নিগার খানম ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের অধস্তন বংশধর ইউনুস খানের কন্যা। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ১১ বছর বয়সে বাবর পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর বাবর তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন বিশেষত উজবেক নেতা সাইবানী খানের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। উল্লেখ্য মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও সৌন্দর্যময় নগরী ছিল সমরকন্দ। বাবরের পিতৃব্য আহমদ মির্জার মৃত্যুর-পর ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো তিনি (বাবর) সমরকন্দ অধিকার করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধে সাইবানী খান বাবরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত করেন। একই সময়ে বাবর পিতৃরাজ্য ফারগানা থেকেও বিতাড়িত হন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কাবুলের শাসক আর্থুনকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। বাবর অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র আফগানিস্তানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ‘পাদশাহ’ (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাবুলের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উজবেকদের সাথে সংঘটিত এক যুদ্ধে বাবর পরাজিত হয়ে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হন। অতঃপর মধ্য এশিয়ায় রাজ্য স্থাপন অসম্ভব মনে করে বাবর ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করেন।

বাবরের ভারত অভিযান

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পূর্বে ভারতে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন যা সাধারণত পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান নামে সমধিক পরিচিত। বাবর ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে বাদাখসান এবং ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার হস্তগত করেন। স্থায়ী পুত্র হুমায়ুন ও কামরানকে যথাক্রমে বাদাখসান ও কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর অত্যাচার ও নির্মম আচরণে অসন্তুষ্ট আফগান আমির ওমরাহদের বিশেষ অনুরোধে পাঞ্জাবের তৎকালীন শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী, ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে আহ্বান জানালে উচ্চাভিলাষী বাবর তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোর দখল করেন। এ সময় বাবর শিয়ালকোট, দিপালপুর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানও অধিকার করেন। এমতাবস্থায় দৌলত খান লোদী ও আলম খান বাবরের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর বিরোধিতা শুরু করলে বাধা হয়ে বাবর পূর্ণোদ্যমে ভারত অভিযান আরম্ভ না করে সসৈন্যে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রি.)

পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুল থেকে আগমন করে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদীকে পরাজিত করে লাহোর তথা সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মধ্যে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ‘তুঘলক-ই-বাবুরী’ বা ‘বাবরনামা’র বিবরণ অনুযায়ী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সেনাবাহিনীতে ছিল ১২,০০০ পদাতিক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ১,০০,০০০ সৈন্য ও ১০০ হস্তী। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে কামানের ব্যবহার করেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে লোদী বংশের পতন ঘটে। ফলে উপমহাদেশে সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল। যথা-

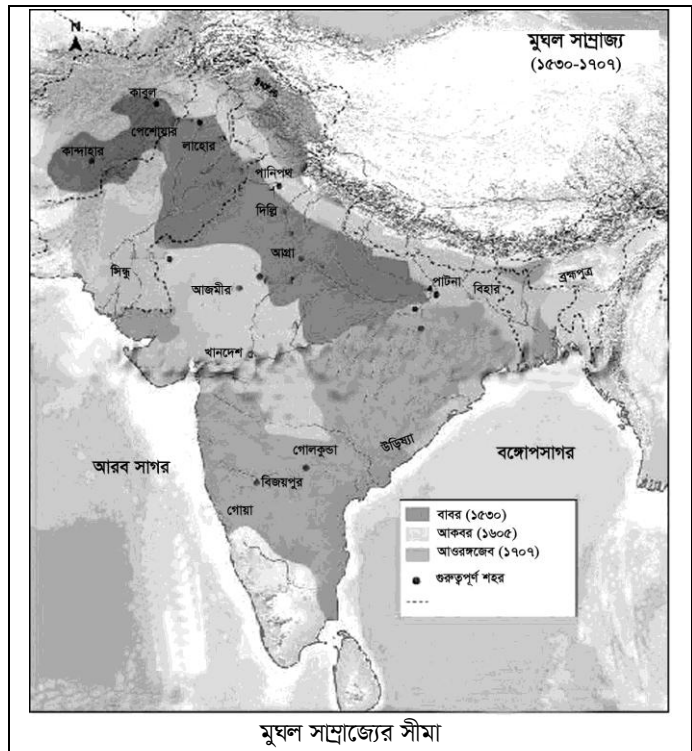
১. বাবরের তুলনায় ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাবরের সৈন্য বাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল।
২. বাবর এই যুদ্ধে কামানসহ অন্যান্য উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেন, যা ইব্রাহিম লোদীর কাছে অজানা ছিল।
৩. বাবর ছিলেন একজন দৃঢ় চরিত্রবান ও কুশলী সৈন্যাধ্যক্ষ। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদী ছিলেন সৈন্য পরিচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।
৪. সেনাপতি ওস্তাদ আলী ও মোস্তফার নেতৃত্বে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুনিপুণ যুদ্ধ কৌশল বাবরের সফলতার অন্যতম কারণ।
৫. নানা জাতির অভিজ্ঞ সৈন্যদের নিয়ে গঠিত আফগান বাহিনীর মধ্যে কোন একতা ছিল না। অন্যদিকে বিভিন্ন জাতির সৈন্যদের সমন্বয়ে বাবরের সেনাবাহিনী গঠিত হলেও তারা ছিল বাবরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।
৬. ইব্রাহিম লোদীর নিষ্ঠুর আচরণের ফলে আমির ওমরাহ ও আত্মীয় স্বজন ছিল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, যা বাবরের অনুকূলে ছিল।

পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে তিন শতাব্দির অধিককাল স্থায়ী দিল্লি সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলেই ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ভারতবর্ষের বিপুল ধন-সম্পদ বাবরের হস্তগত হয়। ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনী নামে একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলেন।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ)

মেবারের রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিং বাবরকে ভারত আক্রমণে পর্যাপ্ত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তিনি তা রক্ষা করেন নি। রানা সংগ্রাম সিংহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাবর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুর লঙের ন্যায় ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তখন রানা সংগ্রাম সিংহ ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লি সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের উপর হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের



মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা

অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের গোড়াপত্তন করলে রাজপুত শক্তি মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে বাবরের বিরোধিতা করে। রানা সংগ্রাম সিংহ বিলসার সিলহদা, ধুনগড়ের উদয়সিংহ, মারবাড়ের ভীমসিংহ, চান্দেবীর মেহেদী রাও প্রমুখ অসংখ্য রাজপুত সর্দার এবং হাসান খান মেওয়াটির সাহায্যে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট গঠন করেন। সম্মিলিত সামরিক জোটে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে ১২০ জন রাজপুত সর্দার, ৮০ হাজার অশ্বারোহী (মতান্তরে ১,২০,০০০ অশ্বারোহী) ৫ শত হস্তী বাহিনী (মতান্তরে ১,০০০ হস্তীবাহিনী) এবং বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে বাবর মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল বাহিনীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র বাহিনীকে বাবর ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) ন্যায় এক অনলবর্ষী ও তেজোদীপ্ত ভাষণ দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ আগ্রার অনতিদূরে ফতেহপুর সিক্রির নিকট খানুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও যুদ্ধ কৌশলের অপকর্ষতার ফলে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধ নামে পরিচিত সেগুলোর মধ্যে খানুয়ার যুদ্ধ অন্যতম। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধের পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ নামমাত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজপুত শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রানা সংগ্রাম সিংহের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রাজপুত শক্তির প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাবরের প্রাধান্য ও ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁর ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তর করেন। খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত শক্তির পুনরুজ্জীবনের আশা স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করে বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর 'গাজী' উপাধি ধারণ করেন।

গোগরার যুদ্ধ (৬মে, ১৫২৯ খ্রি.)

খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত শক্তিকে পর্যুদস্ত করার পর জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর দুর্ধর্ষ আফগান দলপতিদের দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা জৌনপুরের তৎকালীন শাসক মাহমুদ লোদী, বিহারের শের খান বাবরের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠন করেন। বাবর নিজ পুত্র আসকারীকে পাঠিয়ে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। মাহমুদ লোদীর বিরুদ্ধে আসকারীর নেতৃত্বে প্রেরিত এই বাহিনী পথিমধ্যে এলাহাবাদ, চুনার, বেনারস হস্তগত করে পাটনার সন্নিকটে গোগরা নদীর তীরে বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জৌনপুরের শাসক মাহমুদ লোদী ও বাংলার শাসক নুসরত শাহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত আফগান সেনাবাহিনী ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে ঐতিহাসিক গোগরার যুদ্ধে বাবরের নেতৃত্বাধীন মুঘল সেনাবাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে গোগরার যুদ্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধের পর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের গোগরার যুদ্ধ পরিপূরক যুদ্ধ হিসেবে সমধিক পরিচিত। এই যুদ্ধই ছিল বাবরের বর্ণাঢ্য জীবনের সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে আফগানদের পুনঃ সংঘটিত হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক। বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী বাবর এশিয়ার ইতিহাসে এক আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। বাবর ছিলেন সমসাময়িক এশিয়ার শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্তিমান চরিত্রের অধিকারী। বাবরের চরিত্রে সামরিক প্রতিভা, বীরসুলভ দুঃসাহসিকতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অদম্য অধ্যবসায়, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অনন্যসাধারণ দুঃসাহসিকতা, অটুট মনোবল, অতুলনীয় রণনিপুণতা, দূরদর্শী রাজনৈতিক মেধা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পিতৃবাৎসল্য এবং গভীর মমত্ববোধ প্রভৃতি গুণাবলির এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। বাবরের ধর্মনীতি বিশ্ব ভ্রাস সৃষ্টিকারী তৈমুর লঙ ও দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খানের শোণিত ধারা প্রবাহিত ছিল। বাবরের মধ্যে তুর্কীদের সাহস ও কর্মদক্ষতার সাথে সাথে মোঙ্গলদের তেজস্বিতা ও সমর নিপুণতার এবং দুর্ধর্ষ যাযাবর তাতারদের বীরত্ব ও অস্থিরতার

সঙ্গে পারসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বাবর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে, ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিংহকে, ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে চান্দেরী অভিযানের সময় মেদেনী রাওকে এবং সর্বশেষ ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান শক্তিকে পরাস্ত করার মধ্যে বাবরের উন্নত সামরিক কৌশল, রণনিপুণতা এবং একজন সফল সমর নায়কের কৃতিত্ব ফুটে উঠে। ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর এক নতুন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর সময় মুঘল সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে বাবর বিশাল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় স্বল্পতার কারণে বিজিত অঞ্চলব্যাপী চলমান শাসনব্যবস্থাকেই অব্যাহত রাখেন। তবে বাবর খলিফার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে স্বয়ং ‘বাদশাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ববর্তী আমলে প্রচলিত সামন্ত প্রথা ও জায়গীরদারী প্রথা চালু রাখলেও তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত করেন। বাবরের শাসনামলে বিভাগীয় প্রধান এবং বাদশাহের সাথে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন খলিফা। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত ওয়ালী (প্রাদেশিক গভর্নর) দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), সিকদার (সমর কর্মকর্তা) ও কোতয়াল (নগর কর্মকর্তা) প্রমুখ কর্মকর্তাদের দ্বারা। বাবর সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী ১৫ মাইল অন্তর অন্তর ডাকচৌকির ব্যবস্থা করেন।

শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী এবং একজন রুচিশীল শাসক। তিনি দিল্লি ও আগ্রায় ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্দমা, সেতু ও অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। বীরযোদ্ধাও সমরকুশলী বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তিনি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত তুর্কি কবিতার সংকলন ‘দিওয়ান’ নামে পরিচিত। ফার্সি ভাষায় বাবর এক প্রকার নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন যা সাধারণত ‘মুবইয়ান’ নামে সুপরিচিত। জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নির্দশন তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুয়ুক-ই-বাবরী’। ‘তুয়ুক-ই-বাবরী’ মুঘল ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
---	--------------

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১১ বছর বয়সে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণকারী বাবর কালের পরিক্রমায় পিতৃরাজ্য ফারগানা ও সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে কাবুল দখল করেন। বাবর ভারতবর্ষে কয়েকটি পর্যবেক্ষণমূলক অভিযানে সফলতা লাভের পর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে হত্যা করে দিল্লি সালতানাতের স্থলে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাবরের পিতার নাম ছিল-

ক. শায়বানী খান

খ. উমর শরীফ

গ. উমর শেখ মির্জা

ঘ. আহমদ মির্জা

২। বাবর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন-

ক. মাত্র ৮ বছর বয়সে

খ. মাত্র ৯ বছর বয়সে

গ. মাত্র ১০ বছর বয়সে

ঘ. মাত্র ১১ বছর বয়সে

৩। বাবর কান্দাহার হস্তগত করেন-

ক. ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে

৪। পানিপথ বর্তমান ভারতের-

ক. তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত

খ. গুজরাটে অবস্থিত

গ. তেলঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত

ঘ. হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সিরাজ আলী শাহ সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তীতে এক যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মর্যাদা লাভ করেন। এই রাজবংশটি সুদৃঢ় করতে তাকে রাজপুতদের সাথে এক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল, যেটি ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসের পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের অনুরূপ ছিল।

১. মুঘল বংশ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের রাজপুতদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন। ৩
৪. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্ব পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৩.২

সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব ও সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-৪০; ১৫৫৫-৫৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুমায়ুনের প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- সম্রাট হুমায়ুনের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

আফগান, মুঘল, বারলাস, দাদরাহ, চুনार, দুর্গ, সুরুজগড়, জান্নাতাবাদ ও বিলগ্রাম



প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে শিয়া মাতা মাহিম বেগমের গর্ভে কাবুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অপর তিন ভ্রাতা ছিলেন কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। বাল্যকালেই হুমায়ুন আরবি, ফার্সী ও তুর্কী ভাষাসহ কাব্য ও সাহিত্যের পাশাপাশি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাবরের শাসনামলে হুমায়ুন বাদাখশান, হিসার ফিরোজা এবং সম্বলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিতা বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতৃ মনোনয়ন অনুসারে হুমায়ুন 'নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর সম্রাট হুমায়ুন পিতৃ নির্দেশ অনুসারে তাঁর ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহারের, হিন্দালকে আলওয়ার ও মেওয়াটে এবং আসকারীকে সম্বলের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এছাড়াও পিতৃব্য পুত্র মির্জা সুলায়মানকে তিনি বাদাখশানের শাসনভার অর্পণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে ১৫৩০-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যখানে ১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শের খান (শের শাহ) কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজদরবারে আশ্রিত ছিলেন।

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

আফগান শক্তির বিরোধিতাই ছিল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীকে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করার ষড়যন্ত্রে আফগান অভিজাত শ্রেণির সাথে বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্তাও লিপ্ত ছিলেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বুন্দেলখণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কালিঙ্গের দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু অদূরদর্শী সম্রাট হুমায়ুন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে আফগানরা জৌনপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে জৌনপুরের মুঘল শাসক জুনাইদ বারলাসকে বিতাড়িত করেন। আফগান বাহিনীর বিশৃঙ্খলার সুযোগে হুমায়ুন ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীর সন্নিকটে দাদরাহ বা দৌরাহর যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান শক্তিকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। নিরুপায় হয়ে মাহমুদ লোদী পাটনা এবং কয়েকদিন পর বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহমুদ লোদী বাংলায় মৃত্যুবরণ করলে লোদী আফগান বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। আফগান বাহিনীর একটি বিরাট অংশ আফগান নেতা শের খানের নেতৃত্বে বারানসীর দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার তীরে অবস্থিত চুনার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হুমায়ুন দীর্ঘ ৪ মাস ধরে চুনার দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু ইতোমধ্যে গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ আত্মা অভিযান করেন। এ সংবাদে বিচলিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন শেরখানের মৌখিক আনুগত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে বিহার ও চুনার দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে আত্মা প্রত্যাবর্তন করেন। চুনার দুর্গটি শেরখানের হস্তে সমর্পণ করে সম্রাট হুমায়ুন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কেননা এই দুর্গকে কেন্দ্র করে শেরশাহ নিজের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হন।

হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের সংঘর্ষ

গুজরাটের বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও প্রভাবশালী শাসক। তিনি ছিলেন পাঠান শক্তির উৎস। প্রবল প্রতাপশালী সুলতান বাহাদুর শাহের রাজত্বকালকে গুজরাটের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর শাসনামলেই গুজরাটের সমধিক বিস্তৃতি সাধিত হয়েছিল। বাহাদুর শাহ ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে মালব, ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে রায়সীন দখল এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে চিতোরের শিশোদীয় নেতৃবৃন্দকে পরাস্ত করেন এবং বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগরের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাহাদুর শাহ দিল্লি অধিকারের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ জামান মীর্জাকে আশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করে সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচনা দান করেন। এছাড়া ও তিনি আফগান নেতা আলম খান লোদীর পুত্র তাতার খানকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত বিয়ানা অঞ্চল অধিকার করার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এছাড়া সুলতান বাহাদুর শাহ অসংখ্য বিদ্রোহী আফগান নেতৃবৃন্দকে তার রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করে সম্রাটের ক্রোধের উদ্বেক করেন। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সম্রাট হুমায়ুন মালব গমন করার সময় গুজরাটীদের দ্বারা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে মেবারের রাণী কর্ণাবতী সম্রাট হুমায়ুনের সাথে রাখী বন্ধনের (দ্রাতৃত্বের বন্ধনের) প্রস্তাবসহ সাহায্য কামনা করলে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রযাত্রা করেন।

মান্দাসোর যুদ্ধ (১৫৩৫ খ্রি.)

উপরোল্লিখিত কারণ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মান্দাসোর নিকট একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরবর্তী স্থানে সুলতান বাহাদুর শাহ ও সম্রাট হুমায়ুনের সেনাবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং মুঘল সেনাবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে একপর্যায়ে পর্তুগীজদের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। হুমায়ুন অতঃপর মালব, চাম্পানের দুর্গ এবং দ্রুতগতিতে গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ হস্তগত করেন। এসময় মুঘল বাহিনী গুজরাট এবং চাম্পানের দুর্গ থেকে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে। সম্রাট হুমায়ুন গুজরাটের শাসন ভার তার ভাই আসকারীর উপর ন্যস্ত করে অগ্রায় চলে আসেন। কিন্তু আসকারী ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য। তার অপশাসনে গুজরাটে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এই অরাজকতা ও গোলযোগের সুযোগে বাহাদুর শাহ পর্তুগীজদের সহায়তায় মুঘলদের হাত থেকে পুনঃরায় গুজরাট উদ্ধার করেন।

হুমায়ুনের সাথে শেরখানের সংঘাত

শেরখানের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তিনি ছিলেন আফগান জাতির গুর উপদলভুক্ত। তাঁর পিতা হাসান ছিলেন বিহারের সাসারামের জায়গীরদার। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে চান্দেরী দুর্গবিজয়ের সময় সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে শেরখান (শেরশাহ) সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। প্রীত হয়ে সম্রাট বাবর পুরস্কারস্বরূপ শেরখানকে পিতৃ জায়গীর সাসারামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বারানসীর নিকটবর্তী চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদ মালিকাকে বিবাহ করার মাধ্যমে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন। শেরখানের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন।

কিন্তু অত্যন্ত কটকৌশলী এবং রাজনীতিতে দূরদর্শী শেরখান হুমায়ুনের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ইতবৎসরে শেরখানের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে বিহারের অভিজাত শ্রেণি ও শাসক জালালখান বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের সহায়তায় শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনী এবং শের শাহের নেতৃত্বে আফগান বাহিনীর মধ্যে মুঙ্গেরের নিকটবর্তী কিউল নদীর তীরে অবস্থিত সুরুজগড় নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত এই যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে শের খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর শের খান প্রকৃতপক্ষে বিহারের অবিসংবাদিত অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। শেরখান বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে অগ্রসর হলে দুর্বল শাসক মাহমুদ শাহ তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হতে সক্রিয়গিলি পর্যন্ত অঞ্চলটি শের খানের অধীনে ন্যস্ত করে নিজে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। শেরখান ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড় অবরুদ্ধ করলেন। এ সময়কালে সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। শেরখানের উত্তরোত্তর ও ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তিনি গুজরাট অভিযান অসম্পন্ন রেখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেরশাহের প্রধান ঘাঁটি চুনার দুর্গ অবরুদ্ধ করেন। এটি ছিল সম্রাটের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে শেরখান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে গৌড় জয় করেন এবং একই সাথে গৌড়ের শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। এছাড়াও তিনি রোটার্স দুর্গটি ও দখল করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গ জয় সম্পন্ন করে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এটি ছিল সম্রাটের একটি বিলম্বিত পদক্ষেপ। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সসৈন্যে গৌড়ে প্রবেশ করেন। গৌড়ের মনোরম আবহাওয়া হুমায়ুনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রীত হয়ে এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। অত্যন্ত কুশলী এবং দূরদর্শী শেরখান সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে হুমায়ুনকে গৌড় দখল করার সুযোগ দেন এবং স্বয়ং অগ্রসর হয়ে সমগ্র বিহার দখল করেন। তিনি এমনকি জৌনপুর ও কনৌজ অধিকার করে হুমায়ুনের বাংলা থেকে আত্মীয় প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেন।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)

সম্রাট হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করার পূর্বে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। হুমায়ুন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আত্মা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরখান ও তাঁর আফগান অনুচররা সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন চৌসায় উভয়পক্ষের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। শেরখানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী মুঘল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অনেক সৈন্য অনন্যোপায় হয়ে গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতে অনেকেরই সলিল সমাধি ঘটেছিল নিজাম নামের এক ভিত্তিওয়ালার সাহায্যে সম্রাট হুমায়ুন জীবন রক্ষা করলেন। চৌসার যুদ্ধে শের খানের জয়লাভ ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর ফলে শের খানের রাজ্য পশ্চিম দিকে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তর দিকে রোটার্স হতে দক্ষিণ দিকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই যুদ্ধের পর শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও পাঠের নির্দেশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের মাধ্যমে মুঘলদের সামরিক ও কূটনৈতিক দুর্বলতা প্রস্ফুটিত হয়।

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০)

চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি দূরীভূতকরণ এবং হত গৌরব পুনরুদ্ধার করার মানসে সম্রাট হুমায়ুন পুনরায় সৈন্যবাহিনী সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি নিজ ভ্রাতাদের কাছে প্রয়োজনীয় সৈন্য সাহায্যের আবেদন করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে সম্রাট হুমায়ুন গোলন্দাজ বাহিনীসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে মুঘল ও আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে শের শাহের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্রাট হুমায়ুন এই যুদ্ধেও আফগানদের হাতে পরাজিত হন। কনৌজের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরাজয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এই যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভের ফলে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটেছিল। শেরশাহ ভারতবর্ষে আফগান শূরী বংশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ:

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত; সম্রাট হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

শেরশাহের নিকট হুমায়ুনের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সম্রাটের অদূরদর্শিতা। পিতা সম্রাট বাবরের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হুমায়ুন সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পর তাঁর অপর তিন ভ্রাতা কামরান, আসকারী ও হিন্দাল এবং নিজ পিতৃব্যপুত্র সোলেমান মীর্জার মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করে রাজনৈতিক অপরিপক্বতার প্রমাণ দেন। চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সম্রাট হুমায়ুন যখন কনৌজের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিজ ভ্রাতাদের নিকট সৈন্য সাহায্য কামনা করেন তখন তিনি তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। ফলশ্রুতিতে সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের নিকট পরাজিত হয় এবং দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়ত; সূষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব

সূষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব সম্রাট হুমায়ূনের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। একজন সুদক্ষ এবং নির্ভীক যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুপরিকল্পনার বড়ই অভাব ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অযথা সময় নষ্ট করেন। অথচ শের শাহের শক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। চুনার দুর্গ জয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন দীর্ঘ সময় নষ্ট করেন। বাংলাকে ‘জান্নাতাবাদ’ নামকরণ করে তিনি বাংলায় প্রায় ৮ মাস আরাম-আয়েশে ডুবে থাকেন। এমনি পরিস্থিতিতে দূরদর্শী শেরশাহ চুনার দুর্গ পুনরায় দখল করে বেনারস, জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত গমন করেন।

তৃতীয়ত; সুযোগ্য সেনাবাহিনীর অভাব

সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করেন। যারা ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ এবং অনুপযুক্ত। মুঘল সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন জাতির লোকদের সংমিশ্রণে। যাদের মাঝে ছিনা ছিল কোনো একতা, না ছিল কোন নিয়মশৃঙ্খলা। অন্যদিকে শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান সৈন্যবাহিনী ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভূত।

চতুর্থত; স্বীয় ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা

সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন সহজ সরল মানুষ তিনি ভ্রাতৃদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু চরম বিপদের সময়েও হুমায়ুন তাদের কাছ থেকে কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা পান নি। উপরন্তু সম্রাট হুমায়ুন নিজ ভ্রাতাদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হন। এছাড়াও হুমায়ুন আত্মীয়-স্বজনদের ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। অন্যদিকে শেরশাহ ছিলেন আফগান জাতির আশা-আকাজক্ষার প্রতীক। হুমায়ূনের বিরুদ্ধে আফগানরা শের শাহকে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা এবং একনিষ্ঠ সমর্থন প্রদান করেন।

পঞ্চমত; হুমায়ূনের চারিত্রিক দুর্বলতা

সম্রাট হুমায়ূনের চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার অভাব, মানুষকে অহেতুক বিশ্বাস করা, হেরেমের সুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া এবং অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম সেবন প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা সম্রাট হুমায়ূনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এসব চারিত্রিক দুর্বলতার ফলে তিনি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং কূটকৌশলের অধিকারী শের শাহের মৌখিক আনুগত্যকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণেই সম্রাট হুমায়ুন পর পর দুটি যুদ্ধ যথাক্রমে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধ এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ষষ্ঠত; শেরশাহের যোগ্যতা

শেরশাহ ছিলেন সমসাময়িককালের অন্যতম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। নিঃসন্দেহে তিনি হুমায়ুন অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিলেন। রাজনৈতিক মেধা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামরিক নৈপুণ্যতার কারণেই শেরশাহ সফল হতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে শেরশাহ অপেক্ষা সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। কাজেই শেরশাহের নিকট সম্রাট হুমায়ূনের পরাজয় যুগের মাপকাঠিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

সম্রাট হুমায়ূনের চরিত্র

সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ছিলেন একজন আদর্শস্থানীয় পুত্র, স্বামী, পিতা ও ভ্রাতা। তিনি ভ্রাতাদের ক্রমাগত বিরোধিতা সত্ত্বেও কখন ও তাদের প্রতি রুষ্ট হননি। নম্রতা, বদান্যতা, মহানুভবতা এবং উদারতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী। প্রখর সৃতিশক্তির অধিকারী হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। সম্রাট বাবরের ন্যায় তাঁর পুত্র সম্রাট হুমায়ুনও সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, “হুমায়ুন আলেকজান্ডারের ন্যায় উদ্যমী ও এরিস্টটলের ন্যায় জ্ঞানী ছিলেন।” খুদামীর, সাহাবউদ্দিন, কাফা, জৌহর প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়। পারস্য থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার গুণ সূচনা হয়েছিল। নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ুন কখনও ধর্মান্ধ ছিলেন না। নিঃসন্দেহে হুমায়ুন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পিতা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাথে হুমায়ুন

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানি পথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। এছাড়াও তিনি গুজরাট ও মালব হয়। সঠিক পরিকল্পনা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার দরুণ হুমায়ুন চৌসী এবং কনৌজের যুদ্ধে শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। শাসক হিসেবে হুমায়ুন বিশেষ কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। কেননা ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পিতা বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব রক্ষায় তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন। ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।



শিক্ষার্থীর কাজ

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণগুলো লিখুন।



সারাংশ

সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আফগান নেতা শেরশাহের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধ এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন পারস্যের শাসক শাহ তাহমাস্পের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। নিঃসন্দেহে হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।



পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন-৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় হুমায়ুনের বয়স ছিল-

ক. ২১ বছর

খ. ২২ বছর

গ. ২৩ বছর

ঘ. ২৩ বছর

২। চুনাব দুর্গ অবস্থিত-

ক. পদ্মার তীরে

খ. যমুনার তীরে

গ. বুড়িগঙ্গার তীরে

ঘ. গঙ্গার তীরে

৩। মান্দাসোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল-

ক. ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে

৪। গৌড়ের নাম 'জান্নাতাবাদ' রাখেন-

ক. বাহাদুর শাহ

খ. মাহমুদ শাহ

গ. হুমায়ুন

ঘ. শেরশাহ



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শামসুজ্জামান বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ভ্রাতাদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি নিজ কার্যের দ্বারা নিজেই নিজের হস্তকে দুর্বল করেন। শূর বংশের শাসকের সাথে তার বিভিন্ন কারণে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে যেটি ইতিহাসে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনার সাক্ষ্য করে তোলে।

১. মুঘল বংশের দ্বিতীয় শাসকের নাম কি?

১

২. চৌসার যুদ্ধের বর্ণনা দিন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে শূর বংশের শাসকের দ্বন্দের পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করুন।

৩

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক ছিলেন ইতিহাসে 'ভাগ্যবিড়ম্বনার সাক্ষ্য' এ মতের পক্ষে আপনার যুক্তি দিন।

৪

পাঠ-৩.৩

শূর বংশ: শেরশাহের রাজ্য বিজয় ও শাসন সংস্কার



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শূর বংশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের শাসন সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

পরগণা, কবুলিয়ত, পাট্টা, রায়তওয়ারী, তস্কা, দাম, গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড, ডাক-টোঁকি ও হুলিয়া



শূর বংশ

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে শূর বংশের রাজত্বকাল (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) স্বল্প সময়ের হলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল চিত্তের শাসক। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে কনৌজের সন্নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের মাত্র ১৫,০০০ সৈন্যের সম্মুখীন হন। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। ফলে জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে মুঘল বংশের সাময়িক পতন ঘটে। শেরশাহ ভারতবর্ষে শূর শাসন প্রবর্তন করে পুনরায় আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান 'শাহ' (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করে প্রকাশ্যভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর পর তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কনের নির্দেশ জারি করেন। বিজয়-অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। কালিঙ্গের দুর্গ অধিকার কালে বারুন্দের গুদামে আকস্মিক বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২২মে শেরশাহ মৃত্যুবরণ করেন। শেরশাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ পূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইতিহাসে সাধারণত 'সলিম শাহ' নামে পরিচিত। ইসলাম শাহ ছিলেন সুশিক্ষিত, সাহসী ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। পিতা শেরশাহের রাজত্বকালে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ইসলাম শাহের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা খাক্কারদের ধ্বংসসাধন। কিন্তু অভিজাতদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম শাহ ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ মাত্র বার বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের মামা মুবারিজ খান তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। অতঃপর মুবারিজ খান 'মুহম্মদ আদিল শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু দুর্বল ও অকর্মণ্য আদিল শাহে স্বৈরশাসনে রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রাদেশিক শাসকগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এমনি পরিস্থিতিতে শূর পরিবারের ইব্রাহিম খাঁ শূর আদিল শাহকে পরাস্ত করে আত্মা ও দিল্লি দখল করেন। এসময় আদিল শাহ অনন্যোপায় হয়ে চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের শাসক সিকান্দার শাহ ইব্রাহিম খাঁ শূরকে বিতাড়িত করে দিল্লি ও আত্মা অধিকার করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আফগান নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক কলহ বিবাদের সুযোগে হুমায়ুন তাঁর হত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য মনঃস্থ করেন। তিনি ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল থেকে ভারত অভিযানে রওয়ানা দেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে শাসক সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ফলে ভারতে শূর বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

শেরশাহের শাসন সংস্কার

শেরশাহ মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ শাসন সংস্কারক। শেরশাহের চরিত্রে সামরিক নিপুণতার সাথে সুষ্ঠু শাসন দক্ষতার যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু ও মুসলিম শাসন পদ্ধতির মৌলিক নীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। শেরশাহ মূলত সাম্রাজ্যে জনকল্যাণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেন।

প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

শেরশাহ দক্ষ, প্রগতিশীল ও প্রজাকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শেরশাহ সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন শেরশাহ। ঐতিহাসিকদের মতে, শের শাহের সাম্রাজ্যে মোট ১,১৩,০০০ পরগণা ছিল। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট ছিল গ্রাম। শেরশাহ প্রত্যেক পরগণায় একজন করে শিকদার, আমীন, মুনসিফ, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ, দুইজন কারকুন-একজন হিন্দু ও আর একজন ফারসী হিসাব লেখক নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক সরকারে শিকদার-ই-শিকদারান ও মুনসিফ-ই-মুনসিফান নামক দু'জন সর্বোচ্চ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা পরগণাগুলোর শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন।

রাজস্ব সংস্কার

শেরশাহ রাজস্ব সংস্কার সাধন করে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে শেরশাহ সর্বপ্রথম সমস্ত আবাদী জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর জমির উৎপাদন শক্তির তারতম্য অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যে কিংবা নগদ অর্থে কৃষকরা রাজস্ব প্রদান করতে পারত। রাজস্ব আদায়ের জন্য শেরশাহ পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকাদ্দাম প্রভৃতি পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করেন।

শেরশাহ সর্বপ্রথম 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও নির্ধারিত কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিত। আর সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব ও কর স্থির করে পাট্টা প্রদান করা হত। 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শেরশাহ ভারতবর্ষে প্রকৃত পক্ষে আধুনিক রাজস্ব-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। বলা হয়ে থাকে যে, সম্রাট আকবরের ভূমি বন্টন ও রাজস্ব নীতি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে 'রায়তওয়াসী' বন্দোবস্ত প্রথা বহুলাংশে শেরশাহ প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠেছিল।



শেরশাহ

শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য শেরশাহ আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। তিনি অবাপ্তিহীন শুল্ক কর রহিত করে বিক্রয় কেন্দ্রে অথবা সীমান্তে শুল্ক কর ধার্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শেরশাহের শাসনামলে ভারতে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন পরিমাপের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ফলে মুদ্রা ব্যবস্থায় কেন জটিলতা দেখা দেয়। এই সংকট নিরসনকল্পে শেরশাহ পুরানো এবং মিশ্র ধাতুর প্রচলিত মুদ্রাগুলো বাতিল ঘোষণা করে মুদ্রার আকৃতি, মূল্যমান ও পরিমাপের বৈষম্য দূরীভূত করে রূপার তৈরি তঙ্কা এবং তামার তৈরি 'দাম' নামে এক নব মুদ্রার প্রচলন করেন। এছাড়াও শেরশাহ ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিময় ব্যবস্থা সহজ করার জন্য আধুলি, সিকি, দু-আনি ও এক-আনি খুচরা মুদ্রার প্রচলন করেন। শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা ধাতুর বিশুদ্ধতায়, সৌন্দর্যে, অক্ষরের স্পষ্টতায় ও মুদ্রামানের উৎকর্ষতায় ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা উপমহাদেশে আদর্শ মুদ্রার স্থান লাভ করেছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

শেরশাহের শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য শেরশাহ অনেক সুন্দর সুন্দর ও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেন। শেরশাহ নির্মিত সড়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড'। এই সড়কটি বর্তমান বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে আত্মা হয়ে দিল্লি এবং পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও শেরশাহ পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপন এবং দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত শেরশাহ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 'ঘোড়ার ডাক'এর প্রচলন করেন। যা সাধারণত 'ডাক-চৌকি' নামে সুপরিচিত।

সামরিক সংস্কার

শেরশাহের পূর্ববর্তী শাসকগণ সাধারণত সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৈন্য সরবরাহ পেতেন। কিন্তু শেরশাহ এই সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির মূলোৎপাটন করে আলাউদ্দিন খলজির অনুকরণে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। শেরশাহ বিভিন্ন

জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন এবং স্বয়ং এর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। আফগানরাই ছিল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড। শেরশাহের সেনাবাহিনীতে পঁচিশ হাজার পদাতিক, দেড়লক্ষ অশ্বরোহী, তিনশত হস্তী বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। সেনাবাহিনীকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। শেরশাহের সামরিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন। শেরশাহ জায়গীর প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে সৈন্যদেরকে নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনীর দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে শেরশাহ সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অনুকরণে ‘দাগ’ বা চিহ্নিত করণ ও ‘হুলিয়া’ অর্থাৎ সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করেন।

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার

শেরশাহ বিচার ব্যবস্থায় মানবোচিত সংস্কার সাধন করেন। তিনি সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিচার ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র পার্থক্য দূরীভূত করে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতিতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত। শেরশাহের শাসনামলে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ন্যায়বিচার পেতেন। শেরশাহ এমনকি তার অপরাধী নিকট আত্মীয়-স্বজনকেও বিচারের আওতায় আনতে কুণ্ঠিত হতেন না। প্রত্যেক পরগণার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার কাজী ও মীর আদল উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। হিন্দুদের পৈতৃক বিষয় বা অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ তথা দেওয়ানী মামলা তাদের পঞ্চায়েতেই নিষ্পত্তি করা হত। কিন্তু ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ-বিচারালয়ের শরণাপন্ন হতে হতো। শেরশাহের শাসনামলে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। কয়েকটি পরগণায় উপর একজন করে মুনসিফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করা হয়েছিল প্রধান কাজী বা কাজী উল কুজ্জাত এর উপর। সর্বোপরি শেরশাহই ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক।

ধর্মীয় নীতি

শেরশাহ ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন ধর্মভীরু ও ধর্মপরায়ণ আদর্শ মুসলমান। তিনি অন্য ধর্মের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত উদার। তার শাসনামলে সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সকল ধর্মের লোকজন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার নিদর্শনস্বরূপ শেরশাহ বহু হিন্দুকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়।



শিক্ষার্থীর কাজ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহের ভূমিকা লিখুন।



সারাংশ

আফগান জাতির শূর-উপদল ভুক্ত শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশে শূর বংশ প্রতিষ্ঠা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পর এই বংশ ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেরশাহ ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক। তিনি শাসন ব্যবস্থায় বিবিধ সংস্কার সাধন করে শাসন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং প্রগতিশীল করে গড়ে তুলেন। শেরশাহের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তিনি ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে ‘কবুলিয়ত ও পাট্টা’ নামক এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এছাড়াও সৈন্যবাহিনীর দুর্নীতি দূর করার মানসে শেরশাহ সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাগ ও হুলিয়া প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-

ক. শেরশাহ

খ. ইসলাম শাহ

গ. ফিরোজ শাহ

ঘ. মুহম্মদ আদিল শাহ

২। ইসলাম শাহ (জালাল খান) ইতিহাসে সাধারণত পরিচিত-

ক. মুবারক শাহ নামে

খ. মহিউদ্দিন শাহ নামে

গ. সলিম শাহ নামে

ঘ. বুঘরা শাহ নামে

৩। শূর বংশের শাসনের অবসান ঘটে-

ক. ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে

খ. ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে

ঘ. ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে

৪। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট ছিল-

ক. সরকার

খ. পরগণা

গ. গ্রাম

ঘ. তালুক

৫। 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন-

ক. বাবর

খ. হুমায়ুন

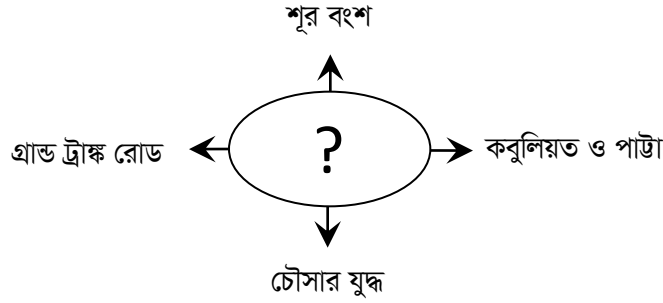
গ. শেরশাহ

ঘ. আকবর



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:



১. শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১

২. কবুলিয়ত ও পাট্টা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজস্ব ব্যবস্থা আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন।

৩

৪. উক্ত শাসকের জনহিতকর কার্যাবলিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

৪

পাঠ-৩.৪

শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শেরশাহের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

শিকদার-ই-শিকদারান, মুনসিক-ই-মুনসিফান, কবুলিয়ত, পাট্টা, রায়তওয়ারী ও তক্ষা



মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসে শেরশাহ ছিলেন সুযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী শাসক। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ শেরশাহকে মধ্যযুগের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। শেরশাহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন অসামান্য যুদ্ধকৌশলী, পারদর্শী সমরনায়ক, দ্বিধা-বিভক্ত ও হতাশাগ্রস্ত আফগান জাতির একজন দক্ষ সংগঠক, একজন প্রগতিশীল সংস্কারক এবং প্রজাবৎসল শাসক। ধুমকেতুর ন্যায় ভারতের ভাগ্যাকাশে শেরশাহের আবির্ভাব ঘটে। সামান্য একজন জায়গীরদারের পুত্র হয়ে এবং প্রাথমিক জীবনে বিমাতার গভীর ষড়যন্ত্রে নানামুখী ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও নিজস্ব মেধা, মনন, প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা ও কর্মনিপুণতার দ্বারা শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেরশাহের চরিত্রে আকর্ষণীয় গুণাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতিবিদ হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন উদারপন্থী এবং আদর্শ রাজনীতিবিদ। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্ম পরায়ণ ছিলেন কিন্তু ধর্মাত্ম ছিলেন না। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ন্যায় শেরশাহ কখনও উলেমা সম্প্রদায় দ্বারা অথবা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। শেরশাহ হিন্দু, মুসলিম, তুর্কি, আফগান, খলজি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের লোকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের জন্য শেরশাহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপের ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় হেনরীর ন্যায় শেরশাহ সাম্রাজ্যে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শেরশাহ নিজে আইন মান্য করতেন এবং জনসাধারণকে ও আইন মেনে চলতে বাধ্য করতেন। সম্রাট আকবরের পূর্বে কেবলমাত্র শেরশাহ ছাড়া অন্য কেউ জনসাধারণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এরূপ আইন প্রণয়ন করতে পারেননি। সম্রাট আকবরের শাসনামলে কয়েকটি আইন শেরশাহের কানুনের আদর্শে গঠিত হয়েছিল।

সমর-নায়ক হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন সুযোগ্য সময় নায়ক। তিনি ছিলেন সামরিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন সুযোগ্য নরপতি। রণচাতুর্য ও ব্যুহ-রচনা কৌশলে নিঃসন্দেহে তিনি তুর্কী মুঘলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। মুঘলদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে শেরশাহ নজিরবিহীন বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বাংলা, মালব, বৃন্দেল খণ্ড ও রাজপুতনায় অভিযান পরিচালনা করে তিনি সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করেন। সামরিক নেতা শেরশাহের সমরকূটকৌশল ছিল অতুলনীয়। শৌর্য-বীর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যে শেরশাহ ছিলেন বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের সমতুল্য। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত তদারকি করতেন এবং তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে উদ্বীপ্ত করতেন।

শাসক হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন সুযোগ্য প্রশাসক। তাঁর শাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও জনহিতকর করে গড়ে তোলা। শেরশাহ বিজ্ঞানসম্মত এবং জনকল্যাণমূলক রাজস্বনীতি গ্রহণ করেছিলেন। শেরশাহ অত্যন্ত দূরদর্শী শাসক ছিলেন। ইতিপূর্বে প্রচলিত ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি গ্রহণ করে নিজস্ব মেধা-মনন, প্রতিভা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এক অনুপম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট

আকবর শেরশাহের শাসন প্রণালী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। শেরশাহ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার, সামরিক বাহিনীর উন্নতি বিধান, পুলিশ ও গুপ্তচর ব্যবস্থার সংগঠন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, ঘোড়ার ডাক প্রচলন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করে একটি গতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

জাতি গঠনকারী হিসেবে

শেরশাহ বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদের নিয়ে একটি 'ভারতীয় জাতি' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেরশাহের উদ্দেশ্য ছিল সকল ধর্ম ও মতবাদের লোকদের সমন্বয়ে তাদের ঐকান্তিকতা ও সাহায্য সহযোগিতার ভিত্তিতে এক বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা শেরশাহের চিন্তা ও স্বপ্ন পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের কর্মের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শেরশাহ নিরলসভাবে কাজ করে জাতি গঠনের প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

একটি 'ভারতীয় জাতি' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেরশাহ-ব্যাখ্যা করুন।



সারাংশ

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক শেরশাহ ছিলেন অন্যতম আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তিনি মুঘল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনকে কনৌজ বা বিলখামের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং বিতাড়িত করেন। শেরশাহের রাজত্ব কাল মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-১৫৪৫) স্থায়ী হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে শেরশাহ নিজেকে একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদের নিয়ে গঠন করতে চেয়েছিলেন-

ক. একটি আফগান জাতি খ. একটি পাকিস্তানি জাতি গ. একটি ভারতীয় জাতি ঘ. একটি মুসলমান জাতি

২। শেরশাহের পিতা ছিলেন একজন-

ক. রাজস্ব কমকর্তা খ. জায়গীরদার গ. সাধারণ সৈনিক ঘ. রাজগৃহাধ্যক্ষ

৩। শেরশাহ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন-

ক. মাত্র ৩ বছর খ. মাত্র ৪ বছর গ. মাত্র ৫ বছর ঘ. মাত্র ৬ বছর



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শাকিল মাহমুদ বহুবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে ভারত সম্রাটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি মুঘল বংশের অন্তর্বর্তী একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর তার ধর্মনিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বৈরাচারী হলেও স্বৈরাচারী ছিলেন না। বহুবিধ জনহিতকর কার্যাবলির জন্যও তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

১. কত সালে শূর বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?

১

২. গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সম্পর্কে লিখুন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের সাথে সম্পৃক্ত তা বর্ণনা করুন।

৩

৪. আপনি কি মনে করেন, উক্ত শাসক ছিলেন সম্রাট আকবরের অগ্রদূত? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।

৪

পাঠ-৩.৫

সম্রাট আকবর; রাজ্যবিজয়, ধর্মনীতি ও রাজপুত নীতি



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আকবরের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- আকবরের রাজপুত নীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

দ্বীন-ই-ইলাহী, রাজপুত, ইবাদাতখানা, চাঁদ সুলতানা ও দাক্ষিণাত্য



সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধক্ষেত্র, সমরনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুঘলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসে তাই তিনি 'Akbar the Great' নামে পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুন যখন শেরশাহ এর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী হামিদাবানুকে নিয়ে পারস্য অভিমুখে যাত্রাকালে, রাজস্থানের অমরকোটে ২৩ নভেম্বর, ১৫৪২ সালে আকবর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর হুমায়ুন শিশুপুত্রের নামকরণ করেন জালালউদ্দিন। প্রথমে কয়েকবছর আকবর তার চাচা হিন্দাল, শামছুদ্দিন খান ও মাহম আনগার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হুমায়ুন তার পুত্রের প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকবর খুব অল্প বয়সেই মল্লযুদ্ধ, অশ্বচালনা, তীরন্দাজ ইত্যাদি যুদ্ধকৌশল সহজেই রপ্ত করেন। ১৫৫১ খ্রি: মাত্র ৯ বছর বয়সে সম্রাট আকবর তার চাচা হিন্দালের কন্যা রুকাইয়া বেগমকে বিবাহ করেন।

সিংহাসন আরোহণ

১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৫৫ খ্রি: আত্মার লাইব্রেরির সিড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রাক্কালে আকবর পাঞ্জাবে বৈরামখানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করছিলেন। বৈরাম খান এখানেই আকবরকে পরবর্তী মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার রাজ্য অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশ্বস্ত বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রি: পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন।

রাজ্যবিজয়

শেরশাহের মৃত্যু ও হুমায়ুনের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে এক বিশৃংখল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। গুর বংশীয় সিকান্দার গুর পাঞ্জাবে এবং আদিল শাহ গুর উত্তর ভারতে শক্তি সঞ্চয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধীতা করতে থাকে। মেবার, বুদ্ধি, সিদ্ধ, গুজরাট, মুলতান মালব ও যোধপুর ইত্যাদি রাজ্য দিল্লির নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। একইভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ গোলকুন্ডা, বিদর, বিজাপুর, আহমেদনগর মুঘল শাসনকে অবহেলা করছিল। এই সকল পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে সম্রাট আকবর রাজ্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। সম্রাট আকবরের রাজ্য বিজয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

পানিপথের ২য় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি:)

রাজ্যবিস্তারের প্রথম ধাপে আকবর আদিল শাহ গুরের সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিমুর মুখোমুখি হন। হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লি ও আত্মা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। আকবরের সাথে হিমুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে হিমুকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের সময় হিমুর একটি চোখে তীর বিদ্ধ হয় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। পানিপথের ২য় যুদ্ধ মুঘল

ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে মুঘলরা হারানো আত্মবিশ্বাস খুজে পায় এবং ভারতে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসে।

আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান

পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ের পর আকবর পাঞ্জাবের আফগান নেতা সিকান্দার শাহ শুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। মানকোট দুর্গে সিকান্দার শুরের পতন ঘটে। আদিল শাহ শুর ১৫৫৭ খ্রি. মুঙ্গেরে নিহত হন এবং অপর আফগান নেতা ইব্রাহিম শুর উড়িষ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

মালব ও গন্ডোয়ানা অধিকার (১৫৬১-৬৪ খ্রি.)

আকবর তার দুধভ্রাতা মাহম আনগার-পুত্র আদম খানের নেতৃত্বে ১৫৬১ খ্রি. মালব অধিকার করেন। ১৫৬৪ সালে আসফ খান মধ্যভারতের চান্দেল বংশীয় রাজা বীর নারায়ণ ও রাজমাতা দুর্গাবতীকে যুদ্ধে পরাজিত করে গন্ডোয়ানা রাজ্য অধিকার করেন।

চিতোর অধিকার (১৫৬৭-৬৮ খ্রি.)

ভারতের প্রাচীন যোদ্ধাজাতি রাজপুত শক্তি খানুয়ার যুদ্ধে ১৫২৭ খ্রি. চিরতরে শেষ হয়ে যায়নি। রাজপুত রাজাদের মধ্যে শক্তিশালী ও উদ্ব্যত প্রকৃতির রাজা ছিলেন উদয় সিংহ। তিনি মালবের রাজা রাজবাহাদুরকে আশ্রয় দিয়ে এবং আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জা হাকিমকে সাহায্য করে আকবরের বিরাগজাজন হন। ১৫৬৮ খ্রি. আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। রাজা উদয়সিংহ পালিয়ে যান কিন্তু তার সেনাপতি জয়মল ও পাট্টা প্রায় চারমাস যুদ্ধ করে পরাজিত হন। অবশেষে চিতোর মুঘল অধিকারে আসে।



আগ্রা দুর্গ

রণথম্বোর ও কালিঞ্জর বিজয়

রনথম্বোরের রাজা ছিলেন চৌহান বংশীয় সুরজন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবরের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা সুরজন আকবরের সাথে একটি সন্ধি করেন। আকবর তাকে দুইহাজারী মনসব প্রদান করেন এবং বারানসী ও চুনারের শাসক নিয়োগ করেন। সুরক্ষিত কালিঞ্জর দুর্গের অধিপতি ছিলেন রাজা রামচন্দ্র। আকবরের আক্রমণে রাজা রামচন্দ্র ১৫৬৯ খ্রি. মুঘল বাহিনীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন।

রানা প্রতাপ এর বিদ্রোহ দমন

মেবারের উত্তরাধিকারী উদস সিংহের পুত্র রানা প্রতাপ সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৭৬ সালে গোলকুন্ডার নিকট হলদিঘাটে মুঘল রাজপুত বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রানা প্রতাপ পালিয়ে যান।

গুজরাট বিজয় (১৫৭২ খ্রি.)

ভারতের সম্পদশালী ও বাণিজ্যকেন্দ্র গুজরাট সম্রাট আকবরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গুজরাটের শাসক তৃতীয় মুজাফফর শাহেব দুর্বলতার সুযোগে তার মন্ত্রী ইতিমাদ খান আকবরকে গুজরাট অভিযানের আমন্ত্রণ জানান। আকবর ১৫৭৩ সালে সুরাট দখল করেন এবং আজিজ কোকোকে আহমদাবাদের শাসক নিযুক্ত করেন। গুজরাটের বিদ্রোহী ও পলাতক আমিরগণ সুরাট, ক্যাম্বে ও আহমদাবাদ দখল করলে আকবরও পুনরায় গুজরাট জয় করে টোডরমলকে এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

বাংলা বিজয় (১৫৭৬ খ্রি.)

এই সময় বাংলার শাসক ছিলেন দাউদ খান কররানি। তিনি তার পিতা সুলায়মান কররানীর মত মুঘলদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেননি। তিনি নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা জারি করেন। আকবর প্রথমে জৈনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। দাউদ খানের বিচক্ষণ উজির লোদী খানের মধ্যস্থতায় দাউদখান মুনিম খানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৭৪ খ্রি. আকবর হাজিপুর ও পাটনা অধিকার করেন এবং মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার ও টোডরমলকে বাংলা অভিযান এর দায়িত্ব অর্পণ করে রাজধানীতে ফিরে যান। মুঘল বাহিনী একে একে ভাগলপুর, কোলগাও, তেলিয়াগিরি হয়ে তাড়া ও সপ্তগ্রাম অধিকার করে। মুঘলদের সাথে দাউদ খান ১৫৭৫ খ্রি. কটকের সন্ধি স্থাপন করে।

অবশেষে রাজা টোডরমল ও হোসেন কুলি খান-এর নেতৃত্বে ১৫৭৬ খ্রি. ১০ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা বিজয় সম্পন্ন হয়।

কাবুল, কাশ্মীর ও কান্দাহার বিজয়

আকবরের বৈমায়েয় ভ্রাতা মির্জা হাকিম আত্রার সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে আকবর ১৫৮১ খ্রি. মির্জা হাকিমকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। অপরদিকে রাজা ভগবান দাস এর নেতৃত্বে কাশ্মীরের শাসক ইউসুফ শাহের বিরুদ্ধে আকবর অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৮৬-৮৭ খ্রি. মধ্যে কাশ্মীর মুঘল অধিকারে আসে। ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন কান্দাহার ১৫৯৫ খ্রি. মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

সিন্ধু বিজয় (১৫৯১ খ্রি.)

আকবর ১৫৯০ সালে মির্জা আব্দুর রহিমকে মুলতানের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করেন। আব্দুর রহিম ১৫৯১ খ্রি. জানি বেগকে পরাজিত করে সিন্ধু ও বেলুচিস্তান দখল করেন।

আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি

উত্তরপূর্ব ও উত্তর পশ্চিম ভারত বিজয়ের পর সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের দিকে নজর দেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশ ব্যতীত অন্যরাজ্যগুলো (আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা) মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৫৯৫ খ্রি. আহমেদ নগরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। আহমেদ নগরের শাসক বাহাদুর নিজাম শাহের অভিভাবিকা বীরাজনা চাঁদ সুলতানা ১৫৯৬ খ্রি. সন্ধি স্থাপন করেন। ১৬০১ খ্রি. মুঘল বাহিনীর নিকট আসিরগড় দুর্গের পতন ঘটে। এতে বুরহানপুরসহ খান্দেশ রাজ্যের পতন ঘটে।

আকবরের ধর্ম নীতি

আকবর তার শাসনকালে ধর্মীয়ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রবর্তনের কারণে ইতিহাসে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। আকবর নিজে সুনী ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’ নামক এক নতুন ধর্মমত প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। তাই আকবরের ধর্মীয় নীতি মূলত দ্বীন-ই-ইলাহীকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।

দ্বীন-ই-ইলাহী

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রি. দ্বীন-ই-ইলাহী নামক এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। প্রকৃত অর্থে এটি ছিল একটি ভ্রাতৃত্বের সংঘ। আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে একটি ইবাদাতখানা তৈরী করেন। এখানে হিন্দু পন্ডিত, আলেম-উলেমা, জেসুইট মিশনারী ও অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতেন ও তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আকবর সকলের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং এই সকল ধর্মের দ্বন্দ্বকে একপাশে রেখে সকল ধর্মের ভাল দিকগুলো একত্রিত করে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটিই দ্বীন-ই-ইলাহী নামে পরিচিত। আকবর নিজে ‘ইমাম-ই-আদিল’ উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাটের ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা “সুলহ-ই-কুল”। প্রতি রবিবার সম্রাট নিজে এই ধর্মের দীক্ষা দিতেন। এর কতগুলো নিয়ম ও আচার পদ্ধতি ছিল। এই ধর্মের অনুসারীদের চারটি জিনিস যথা ধন, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম উৎসর্গ করতে হত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকে দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও এটি জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় হতে পারেনি। হিন্দু রাজা বীরবলসহ মাত্র ১৮ জন ব্যক্তি এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে দ্বীন-ই-ইলাহীরও অবসান ঘটে।

আকবরের রাজপুতনীতি

ভারত একটি বহুধা বিভক্ত দেশ। এতে নানা জাতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ বসবাস করে। এই বিভক্ত জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি একক ভারত সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য সম্রাট আকবর অনেকগুলো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার অন্যতম ছিল রাজপুতনীতি। সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা ও ভারতের এই যোদ্ধা ও কূটনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সম্রাট রাজপুতদের সহিত সহনশীল ও মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই লক্ষ্যে ১৫৬২ খ্রি. আকবর আম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। নিজ পুত্র সেলিমের বিবাহ তিনি ভগবান দাসের কন্যার সাথে সম্পন্ন করেন। সম্রাট সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ রাজপদে রাজপুতদের নিয়োগ দেন। রাজা মান সিংহ, ভগবান দাস, রাজা বিহারীমল, বীরবল ও টোডরমল প্রমুখ সবাই ছিলেন উচ্চ রাজপদ অধিকারী ও মনসবদার। সম্রাট হিন্দুদের তীর্থকর ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি হিন্দু মেলা ও মন্দির প্রদর্শন করতেন। সম্রাটের এই রাজপুত নীতি পরবর্তী কয়েকশ বছর মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে এনেছিল। এটি ছিল মধ্যযুগীয় রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।



শিক্ষার্থীর কাজ

আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি লিখুন।



সারাংশ

সম্রাট আকবর শুধু ভারতের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক নন, তিনি ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ গুপতি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে আহমেদনগর ও মধ্য এশিয়ার কাবুল কান্দাহার হতে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত একচ্ছত্র মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি একক ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতের প্রাচীন, সমরকুশলী ও মেধাবী রাজপুত শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ধর্মীয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। তাই ইতিহাসে তিনি ‘আকবর দ্যা গ্রেট’ নামে অভিহিত।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন?
(ক) ১৪ (খ) ১২ (গ) ১৩ (ঘ) ১৫
- আকবর আহমেদ নগরের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন?
(ক) সুলতান রাজিয়া (খ) চাঁদ সুলতানা (গ) নূরজাহান (ঘ) সালিমা বেগম
- ‘দীন-ই-ইলাহী’ কত সনে প্রবর্তিত হয়?
(ক) ১৫৮০ (খ) ১৫৮১ (গ) ১৫৮২ (ঘ) ১৫৮৩
- ‘দীন-ই-ইলাহী’ এর কতজন সদস্য ছিলেন?
(ক) ১৩ (খ) ১৪ (গ) ১৫ (ঘ) ১৬



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সম্রাট ফিরোজ মাহমুদ নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সব ধর্মের নির্যাস নিয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যে বহুবিধ রাজ্য বিজয় সম্পন্ন করেন এবং রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

- পানিপথের ২য় যুদ্ধ কতসালে সংঘটিত হয়? ১
- দীন-ই-ইলাহী মতবাদ সম্পর্কে ধারণা দিন। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের গৃহীত রাজপুতনীতির সাথে মুঘল বংশের যে শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা তুলে ধরুন। ৩
- পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত শাসকের দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৩.৬

সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা, সংস্কারমূহ ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আকবরের শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আকবরের সংস্কার সম্পর্কে জানবেন ও
- আকবরের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।



মুখ্য শব্দ

মনসবদারি ব্যবস্থা, মীর বকশী, কাজী-উল-কুজ্জাত, রাজা টোডরমল ও সুবাদার



শাসনব্যবস্থা:

মুঘল শাসকদের মধ্যে সম্রাট আকবরই সর্বপ্রথম সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। রাজ্যবিস্তারের পাশাপাশি সাম্রাজ্যে শাসন সুদৃঢ়করণে মহামতি আকবর ছিলেন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি উদারনীতি অনুসরণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ভারতীয়, পারসিক, তুর্কি ও সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী দুই শাসক সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ুন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণে কোন শাসন প্রণালী প্রবর্তন করতে পারেননি। কিন্তু সম্রাট আকবর শুরু থেকেই তার প্রতিভাবান শাসননীতি ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মাধ্যমে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীগণ যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা:

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সম্রাট নিজে। সম্রাট নিজেই রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা ও সর্বপ্রধান ব্যবস্থাপক। আকবর সকল ধর্মীয় গোড়ামীমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। রাজকার্যে তিনি তার সভাসদ, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের মতামত গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কতগুলো বিভাগের মাধ্যমে তিনি শাসনপ্রণালী কার্যকর করতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা:

সুবিশাল ভারতকে শাসন করার জন্য আকবর তার সাম্রাজ্যকে ১৫৮২ খ্রি. ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং সুবার শাসক হিসেবে ১ (এক) জন সুবাদার নিয়োগ করেন।

সুবাগুলো হচ্ছে-

১) দিল্লি (২) আখরা (৩) আজমির (৪) বাংলা (৫) বিহার (৬) এলাহাবাদ (৭) অযোধ্যা (৮) মুলতান (৯) লাহোর (১০) কাবুল (১১) গুজরাট (১২) মালব (১৩) খান্দেশ (১৪) বেরার ও (১৫) আহমেদনগর।

সুবাদার ছাড়াও প্রদেশের এ শাসনকার্যে একজন দিওয়ান, আমিল, ফৌজদার, কাজি ইত্যাদি পদের রাজকর্মচারি ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সুবাকে কতগুলো সরকার ও প্রত্যেক সরকারকে কতগুলো পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন।

শাসন সংস্কার:

রাজস্ব সংস্কার

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আকবর শের শাহের রাজস্ব নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মোজাফফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। টোডরমল 'ইলাহীগঞ্জ' নামক রাশের চেইন ব্যবহার করে আবাদ যোগ্য জমির সঠিক পরিমাণ করেন। তিনি জমিকে উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী পোলাজ, পারউতি, চাচর ও বন্জর এ চারভাগে বিভক্ত করেন। রাজস্ব হিসেবে ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র আদায় করত। এই ব্যবস্থা রায়তোয়ারি ব্যবস্থা বা

‘যাবতি’ পদ্ধতি নামেও পরিচিত। রাজস্বের উৎস হিসেবে ভূমি রাজস্ব ছাড়াও বাণিজ্য শুল্ক, টাকশাল, উপটোকন ইত্যাদি হতেও রাজস্ব আয় হত।

বিচার ব্যবস্থা

আকবর ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহের ১টি দিন তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তার পরই ছিলেন কাজী উল কুজ্জাত, মুফতি ও মীর আদিল।

সামরিক ব্যবস্থা

সম্রাট আকবর পদাতিক, অশ্বরোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহিনী এই চার ভাগে তার সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করেন। মীর-ই-বকশি, মীর-ই-আতিশ এবং আমির-ই-বহর ছিলেন যথাক্রমে গোলন্দাজ পদাতিক বাহিনী বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান। সম্রাট নিজে ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

মনসবদারি ব্যবস্থা

‘মনসব’ শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এই পদের অধিকারীকে মনসবদার বলা হত। সমগ্র সেনাবাহিনীকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্রাট এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদাররা দশ হাজারি পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে দশজন সৈন্য সংরক্ষণের বিধান ছিল। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্য ও সম্ভ্রান্ত সভাসদগণ দশ হাজারি পদ পেতেন। আকবর ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। মনসবদারগণ জাত ও সওয়ার নামক ২টি পদমর্যাদা পেতেন। এদের মাসিক বেতন ৩২০০ টাকা হতে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল।



ফতেহপুর সিক্রি

আকবরের কৃতিত্ব

ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, সম্রাট আকবর শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ছিলেন একজন অরণীর শাসক। মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট আকবর। বহুমুখী প্রতিভাধর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের এই সম্রাটের তুলনা তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতিতে ছিল বিরল। তিনি একাধারে ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক। শাসনসংস্কার ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শাসক। আকবর শুধুমাত্র একজন সমরকুশলী ও সুশাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একই সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। বহু জ্ঞানী তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় ‘নবরত্ন’ ছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত গুণী তানসেন, বীরবল প্রমুখ। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ও সামরিক বিভাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিক শাসনের রূপকার ও শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট।

✂ শিক্ষার্থীর কাজ	আকবরের কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।
-------------------	---

📁 সারাংশ	সম্রাট বাবরের সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্রাট আকবর এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি ছিলেন একাধারে সমরকুশলী, রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ রাষ্ট্র সংগঠক। তিনি ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের অগ্রগণ্য গুপতি এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।
----------	--

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১) আকবর তার সাম্রাজ্যকে কয়টি সুবায় বিভক্ত করেন?
 (ক) ১১ (খ) ১২ (গ) ১৪ (ঘ) ১৫
- ২) রাজা টোডরমলের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার নাম কি ছিল?
 (ক) যাবতি ব্যবস্থা (খ) জমিদারী ব্যবস্থা (গ) কবুলিয়াত (ঘ) পাট্টা
- ৩) মুঘল বিচার ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা কে ছিলেন?
 (ক) কাজী-উল-কুজাত (খ) মুফতি (গ) সম্রাট (ঘ) উলেমাগন
- ৪) কত সালে মনসবদারি প্রথা চালু হয়?
 (ক) ১৫৭৭ (খ) ১৫৭৮ (গ) ১৫৬০ (ঘ) ১৫৫৬

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

তারাকান্নর ছিলেন একজন প্রজাদরদী স্বৈরাচারী শাসক। ঐতিহাসিকগণ তাঁর শাসনব্যবস্থাকে 'Perso-Arabic System in India Setting' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি শুধু বিশাল সাম্রাজ্য রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; তার সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য এক অতি উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীর প্রবর্তন করে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ শাসন সংস্কারক হিসেবে অপরিসীম খ্যাতি অর্জন করেন।

১. মনসব শব্দের অর্থ কি? ১
২. মনসবদারী প্রথা সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের শাসন প্রণালীর সাথে আপনার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে বর্ণনা করুন। ৩
৪. বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৩.৭

সম্রাট জাহাঙ্গীর : নূর-জাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহানের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	দস্তর-উল-আমল, খুররম ও নূর-জাহান
-----	------------	---------------------------------



সম্রাট জাহাঙ্গীর

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম ৩৬ বছর বয়সে ১৬০৫ খ্রি. ২৪ অক্টোবর নূর উদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি প্রজা কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করেন। সম্রাট আকবর আদর করে তাঁকে শেখু বাবা বলে ডাকতেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ

দস্তর-উল-আমল

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি দস্তর-উল-আমল নামক ১২টি আইন প্রণয়ন করে ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

নওরোজ পালন

সম্রাট জাহাঙ্গীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের মনোরঞ্জননের জন্য ১৬০৬ খ্রি. মার্চ মাসে জাকজমকের সাথে নওরোজ উৎসব পালন করেন।

শাহজাদা খুসরুর বিদ্রোহ ও শিখগুরু অর্জুনের হত্যা

সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খুসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজা মান সিং, খান-ই-আজম, আজিজ কোকা খুসরুকে সমর্থন দান করেন। খুসরু পাঞ্জাবে পলায়ন করলে সেনাপতি দিলওয়ার খান জলন্ধরের যুদ্ধে খুসরুকে পরাজিত ও বন্দী করেন। দশবছর কারারুদ্ধ থাকার পর অন্ধ খুসরু ১৬২২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। শিখগুরু অর্জুন শাহজাদা খুসরুকে বিদ্রোহী অবস্থায় অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। সম্রাট তার নিকট অর্থের কৈফিয়ত তলব করলে অর্জুন উদ্ব্যস্ত প্রকাশ করেন। সম্রাট তাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

মেবার বিজয় (১৬১৫ খ্রি.)

মেবারের রাজা বীর কেশরী রানা প্রতাপের পুত্র ছিলেন অমর সিংহ। সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করে মেবার জয় করার সংকল্প করেন। শাহজাদা পারভেজ, আব্দুল্লাহ খান ও মহব্বত খান এর অভিযান ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৬১৫ খ্রি. শাহজাদা খুররম অমর সিংহকে পরাজিত করে মেবার জয় করেন।

কাংড়া বা নাগরকেটি দুর্গ জয় (১৬২০ খ্রি.)

পাঞ্চাবের শাসক মূর্তজা খান কাংড়া দুর্গ দখলে ব্যর্থ হলে শাহজাদা খুররম সুরক্ষিত দুর্গটি ১৬২০ খ্রি. অধিকার করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

আহমেদ নগরের মন্ত্রী মালিক আম্বর মুঘল প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি মারাঠাদেরকে তার সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। ১৬১৭ খ্রি. খুররম মালিক আম্বরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং আহমেদনগর দুর্গ ও বালাঘাট অঞ্চল অধিকার করেন। এই বিজয় গৌরবে সম্রাট খুররমকে শাহজাহান (পৃথিবীর রাজা) উপাধি প্রদান করেন।

শাহজাহান ও মহব্বত খানের বিদ্রোহ

১৬২৩ খ্রি. শাহজাহান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু মহব্বত খান ও পারভেজের নিটক পরাজিত হন। সম্রাট তাকে ক্ষমা করেন। মূলত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে মহব্বত খান বিদ্রোহ করেন এবং সম্রাটকে কাবুল যাওয়ার পথে বন্দি করেন। নূরজাহানের বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট মুক্তি লাভ করেন এবং মহব্বত খান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬২৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।

নূরজাহানের প্রভাব

নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইম্পাহান হতে আগত ভাগ্য অন্বেষণকারী মীর্জা গিয়াস বেগের কন্যা। নূরজাহান ছিলেন অপূর্ব রূপসী ও বহুবিদ গুণের অধিকারী। যুবরাজ সেলিম নূরজাহান দ্বারা প্রভাবিত হলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নির্দেশে পারসিক যুবক আলীকুলি খানের সাথে নূরজাহানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলীকুলী খানকে বাংলার বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সামরিক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন। অতপর, ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মেহের উন নিসাকে বিবাহ করেন এবং তার উপাধি দেন ‘নূর মহল’ (প্রাসাদের আলো) ও পরে নূরজাহান (পৃথিবীর আলো)। সম্রাটের রাজকার্যে নূরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তার ভ্রাতা আসফ খান ও পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন। সম্রাট তার প্রিয় সম্রাজ্ঞীর নামে মুদ্রা জারি করেন। নূরজাহান তার প্রথম পক্ষের কন্যা লাভলী বেগমের সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দেন। ১৬১২ খ্রি. আসফ খানের কন্যা আরজুমন্দ বানুর সাথে শাহজাদা খুররমের বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং আসফ খান তার নিজ জামাতার সিংহাসন লাভ করার প্রতি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। এতে করে নূরজাহান এর জামাতা শাহরিয়ার এর সহিত খুররমের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে সম্রাটের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম শাহরিয়ারকে পরাজিত করে মুঘল সিংহাসন দখল করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাজ্ঞী রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং লাহোরে তার একমাত্র কন্যা লাভলী বেগমকে নিয়ে বাকী জীবন অতিবাহত করেন। ১৬৪৫ খ্রি. নূরজাহান মৃত্যুবরণ করেন। নূরজাহান ছিলেন মুঘল যুগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের রমণী। তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নানাবিধ গুণের উপস্থিতি তাকে সম্রাটের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। তাই সম্রাটের রাজনৈতিক জীবনে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সম্রাট নিজেই কাব্য করে বলতেন, “I have sold my kingdom to my beloved queen for a cup of wine and a dish of soup”.

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব:

মুঘল সম্রাটের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তিনি তাঁর রাজ্য পরিচালনায় সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। তিনি সামরিক অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত করতেন। তিনি প্রশাসনে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিংস রাজা প্রথম জেমসের অনুরোধ পত্র নিয়ে তাঁর দরবারে আসেন। ১৬১৫ সালে টমাস রো পুনরায় তার দরবারে আসেন। জাহাঙ্গীর শিল্প, সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে মুঘল চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের সঙ্গীতের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

নূরজাহানের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।



সারাংশ

সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পিতার দেখানো পথই অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্ব কালে পুত্রদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অবশেষে শাহজাদা খুররম উত্তরাধিকারী হিসেবে বিজয়ী হন। তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১) সম্রাট জাহাঙ্গীরের ডাক নাম কি ছিল?
 (ক) মুরাদ (খ) পারভিজ (গ) শেখু বাবা (ঘ) খুররম
- ২) কতসালে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন
 (ক) ১৬০২ (খ) ১৬০৩ (গ) ১৬০৪ (ঘ) ১৬০৫
- ৩) নূরজাহান ও নুরমহল কার উপাধি ছিল?
 (ক) মেহের উন নিসা (খ) আরজুমন্দবানু (গ) সালিমা বেগম (ঘ) যোথাবাদি
- ৪) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর নাম কি?
 (ক) আইন-ই-আকবরী (খ) আকবর নামা (গ) তুজুকই জাহাঙ্গীরী (ঘ) বাদশা নামা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

আনিকা তার ভাইয়ের কাছ থেকে ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের এমন একজন শাসক সম্পর্কে অবগত হল, যার চরিত্রের মধ্যে বিপরীত গুণাবলির সংমিশ্রণ ছিল। তাঁর সিংহাসনের পশ্চাৎ শক্তি হিসেবে একজন মহীয়সী নারীর বিপুল প্রভাব ছিল। ইউরোপীয়দের সাথেও তাঁর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও তিনি তার সাম্রাজ্যে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন।

১. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কি ছিল? ১
২. দস্তর-উল আমল সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সিংহাসনের পশ্চাতে এক মহীয়সী নারীর প্রভাব ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩
৪. “উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চরিত্রের মধ্যে বিপরীত গুণাবলির সংমিশ্রণ ছিল”—পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৩.৮

সম্রাট শাহজাহান



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্রাট শাহজাহান ও তার স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন ও
- শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

তাজমহল, দারাশিকোহ, ময়ূরসিংহাসন ও মমতাজ মহল



সম্রাট শাহজাহান

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন আরোহণ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাহজাহান। শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজপুত্র পত্নী জগৎ গোসাইয়ের পুত্র। আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র খুররম শৈশব থেকেই ছিলেন শিক্ষা ও সমরবিদ্যায় কুশলী। তিনি যুবরাজ থাকা অবস্থায় অনেক অভিযান পরিচালনা করেন ও বিজয়ী হন। আহমেদ নগর অভিযানে মালিক আশ্বরকে পরাজিত করে তিনি তার পিতার নিকট হতে শাহজাহান উপাধি লাভ করেন। ১৬২২ সালে শাহজাহান আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমকে বিবাহ করেন। পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহান বিদ্রোহ করলেও তিনিই ছিলেন জাহাঙ্গীর এর সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান ১৬২৮ খ্রি. ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। আসফ খানকে শাহজাহান প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ:

খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ

আফগান সর্দার খানজাহান লোদী আহমেদ নগরের নিজামুল মুলক এর সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাহানের সেনাপতি আব্দুল্লাহ ও মোজাফফর ১৬৩১ খ্রি. দীর্ঘ ৩ বছর অভিযানের পর কালিঞ্জরের তালসিহোন্দ নামক স্থানে খানজাহান লোদীকে পরাজিত করেন।

পর্তুগীজদের দমন

সাতগাঁও ও হুগলিতে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। তাঁদের নানা অপকর্ম এদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিসাধন করছিল। সম্রাট নিজেও পর্তুগীজদের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষত মমতাজ মহলের দুইজন দাসীকে অপহরণ করে ও সম্রাট হওয়ার পর শাহজাহানকে উপটোকন না পাঠিয়ে পর্তুগীজরা সম্রাটের বিরাগভাজন হন। ১৬৩২ সালে কাসিম খান এর পুত্র এনায়েতউল্লাহ পর্তুগীজদের উপর আক্রমণ চালায়। পর্তুগীজরা তখন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হলে শাহজাহান এর প্রচেষ্টায় ১৬৩৮ খ্রি. কান্দাহার পুনরায় মুঘল অধিকারে আসে। কিন্তু ১৬৪৮ খ্রি. পারস্য শাসক শাহ আববাস কান্দাহার জয় করে নেন। শাহজাহান প্রথমে দৌলত খান ও পরে ১৬৪৯ খ্রি. শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও প্রধানমন্ত্রী সাদ উল্লাহ খানের নেতৃত্বে অভিযান পাঠান। তবে ১৬৫২ সালে পারস্যের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক দক্ষতার কাছে মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। তাই এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

মধ্য এশিয়ানীতি

মধ্য এশিয়ায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাহজাহান তাঁর পুত্র মুরাদ ও সেনাপতি আলী মর্দানকে প্রেরণ করেন। মুঘলবাহিনী বলখ ও বাদাখশান জয় করে। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় অভিযান অগ্রসর হয়নি। ১৬৪৭ খ্রি. শাহজাদা সুজা ও আওরঙ্গজেব অপর অভিযান পরিচালনা করে। তবে এই অভিযানও ব্যর্থ হয়।

দাক্ষিণাত্য নীতি

সম্রাট আকবরের সময়ে দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ ও বেরার মুঘল অধিকারে এসেছিল। আহমেদ নগরের বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘল হস্তচ্যুত হয়। সম্রাট শাহজাহান এর শক্তিশালী কূটনীতিক নীতির ফলে ১৬৩৩ খ্রি. আহমেদনগর মুঘল অধিকারে আসে। শিয়া রাজ্য দুটি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা ১৬৩০-১৬৩৬ খ্রি. মধ্যে মুঘল অধিকার আসে। দাক্ষিণাত্য হস্তগত করে সম্রাট তার তৃতীয়পুত্র শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সেখানকার সুবাদার নিয়োগ করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৪৫ খ্রি. একবার পদচ্যুত হয়ে গুজরাটের সুবাদারি লাভ করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সম্রাট তাকে ১৬৫৩ খ্রি. পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি অর্পণ করেন।

স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ

মুঘল ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্বকাল “The Age of Marble” নামে খ্যাত। সম্রাট শাহজাহান ছিলেন শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। তিনি ইতিহাসে “The Prince of Builders or Engineer King” নামে পরিচিত। তার স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি লাল পাথরে স্থলে মূল্যবান শ্বেত মর্ম্ম পাথর (White marble) ব্যবহার করেছেন। তার রাজত্বকালে দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে ব্যাপক স্থাপত্য শৈলী তৈরী করা হয়েছিল। কাবুল, কান্দাহার ও কাশ্মিরে মনোরম উদ্যান, প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। রাজধানী আগ্রাতে তিনি নির্মাণ করেছিলেন দীউয়ান-ই-আম, দীউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, সালিমার উদ্যান, শীষ মহল ইত্যাদি। শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রি. রাজধানী আগ্রা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন এবং নতুন নগরীর নাম দেন শাহজাহানাবাদ। এখানে তিনি লালকেল্লা, মমতাজ মহল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তার মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লির জামে মসজিদ। এছাড়াও তিনি বহু মূল্যবান রত্ন খচিত জগৎবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন তৈরি করেন।

তাজমহল

সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগ্রার তাজমহল। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত তাজমহল হচ্ছে সম্রাট তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করে রাখার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগর সুদীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ এই সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। সম্রাট নিজেই ছিলেন এর পরিকল্পনাকারী। প্রধান স্থাপতি ছিলেন ইসফানদিয়ার রুমী ও মাস্টার ঈসা। ভারতীয় ও পারসিক শিল্পকলার মিলন ঘটিয়ে তাজমহল নির্মিত হয়েছে। এটি যুগ যুগ ধরে স্থাপত্য বিদ্যার উৎকর্ষ ও মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগের নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে।

শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ

সম্রাট শাহজাহান ১৬০৭ সালের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার রোগ শয্যায় তাঁর চারপুত্র সিংহাসনের অধিকার নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সম্রাটের চার পুত্র ছিলেন বয়সের ক্রমানুসারে দারা শিকো, শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। আর দুই কন্যা ছিলেন জাহানারা ও রওশন আরা। পুত্রগণ সামরিক দিক থেকে সকলে সমান দক্ষ ছিলেন না। এদের মধ্যে:

- ◆ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার। তিনি ছিলেন পাঞ্জাব ও দিল্লির শাসনকর্তা। তিনি পন্ডিত হলেও আচার আচরণে উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন।
- ◆ শাহসুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা, সাহসী, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তিনি ছিলেন আয়েশী প্রকৃতির।
- ◆ শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা দক্ষযোদ্ধা, প্রশাসন ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন মুসলিম।
- ◆ কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের সুবাদার। তবে তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও প্রশাসন জ্ঞানে অদূরদর্শি। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল:

- সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব-
- ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্য-
- পুত্রদের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতমূলক আচরণ
- রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ
- মসনদের মোহ

দারাশিকোহ পিতার রোগশয্যার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের শাসন তার হাতে তুলে নেন। তিনি পিতার রোগের সংবাদ তার ভাইদের নিকট গোপন রাখেন এবং গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার সাথে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। দারার এমন কপটচরিত্র আচরণ তার অন্যান্য ভাইদের আহত করে। গৃহযুদ্ধ তখন অত্যাশঙ্ক্য হয়ে পড়ে।

বাহাদুরগড়ের যুদ্ধ

দারার অপর তিন ভাই নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেন। আওরঙ্গজেব বোন রওশন আরার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করে শাহ সুজার সাথে দারার বিরুদ্ধে চুক্তি করেন এবং মুরাদকে নিজের দলভুক্ত করে নেন। শাহসুজা বাংলা হতে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। শাহজাহান দারার পুত্র সুলায়মান শিকোকে প্রেরণ করেন। সুলায়মান ১৬৫৮ খ্রি. ২৪ জানুয়ারি বারানসীর নিকট বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে শাহ সুজাকে পরাজিত করেন।

ধর্মাতের যুদ্ধ

মুরাদ আওরঙ্গজেবের যৌথ সেনাবাহিনী দিল্লির নিকটবর্তী ধর্মাত নামকস্থানে উপস্থিত হয়। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খানের মিলিত বাহিনী ১৬৫৮ খ্রি. ১০ এপ্রিল প্রচণ্ড লড়াই করে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

সামুগড়ের যুদ্ধ

ধর্মাতের যুদ্ধের পরাজয় যুবরাজ দারা শিকোকে ক্ষুব্ধ করে। ১৬৫৮ খ্রি. প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি আগ্রার নিকটবর্তী গোয়ালিয়ারের সামুগড়ে এসে পৌঁছান। বহু রাজপুত যোদ্ধা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু দারার ব্যর্থ রণকৌশলে মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মুরাদ ও আওরঙ্গজেব এর যৌথবাহিনী তাদের বিজয় নিশ্চিত করে।

গৃহযুদ্ধের শেষ অঙ্ক

গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে আওরঙ্গজেব আগ্রায় সিংহাসন দখল করেন। তিনি তার পিতা শাহজাহানকে আত্মদুর্গে বন্দি করে রাখেন। শাহজাদা মুরাদকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে গুজরাটের দিওয়ান আলী নকীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। শাহ সুজাকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে প্রেরণ করেন। শাহসুজা আরাকানে পালিয়ে যান। দারাশিকোহ প্রথমে লাহোর পরে মুলতান ও শেষে গুজরাটে আশ্রয় নেন। আজমিরে যশোবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্রে তিনি দেওয়ারের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

শাহজাহানের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি যে কোনো বিচারে শিক্ষিত, মার্জিত রুচিবোধ ও বিদ্যাভাসাহী ছিলেন। আভিজাত্যের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সামরিক দিক থেকে মোটামুটি সফল ছিলেন। তবে তাঁর উত্তর পশ্চিম সীমান্তনীতি ও মধ্য এশিয়ায় তেমন সাফল্য পাননি। কিন্তু তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি সফল হয়। তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য অনেকদূর বিস্তার লাভ করে। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরকেই অনুসরণ করেন। তাঁর রাষ্ট্রশাসনে প্রতিভার সমাবেশ লক্ষ্যনীয়। তাঁর সময়ে ভারত এশিয়া ও ইউরোপের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কের সূচনা হয়। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন। আব্দুল হামিদ খান লাহোরী, মির্জা জিয়াউদ্দিন, আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটা, মুহিব আলী সৈয়দী, তুলসীদাস তার পৃষ্ঠপোষকতা পান। তবে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তার স্থাপত্য শিল্পে। ঐতিহাসিকগণ তার রাজত্বকালকে 'The Age of Marbel' বা 'The Golden Age of the Mughals' বলে অভিহিত করেন। এই মহান মুঘল সম্রাট এর শেষ জীবন অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ছিল। পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক দীর্ঘ আট বছর আত্ম দুর্গে অন্তরীণ থেকে ১৬৬৬ খ্রি. ২২ জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-এর স্বপক্ষে লিখুন।
---	-----------------	--

	সারাংশ
শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণময় এক অধ্যায়। তিনি ছিলেন তার পূর্ববর্তী শাসকদের মতই সামরিক প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ এক গুপতি। তার সময়কাল মুঘল ইতিহাসের চিত্রকলা ও স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত ও প্রশংসিত। তবে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তার পুত্রদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের সূচনা ও তিন পুত্রের মৃত্যু তার শাসনকে কিছুটা কলঙ্কিত করেছে। তবে মুঘল ইতিহাসে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিতে তাজমহলের স্রষ্টা ও 'Prince of builders' নামে আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- শাহজাহানের মাতার নাম কি?
 (ক) মনিবাই (খ) যোধাবাই (গ) জগৎ গোসাই (ঘ) নূরজাহান
- কতসালে শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন-
 (ক) ১৬২৭ (খ) ১৬২৮ (গ) ১৬২৯ (ঘ) ১৬৩০
- শাহজাহান কোন ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালান-
 (ক) পর্তুগীজ (খ) দিনেমার (গ) ফরাসী (ঘ) ইংরেজী
- শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বাংলার শাসক কে ছিলেন?
 (ক) দারাকোহ (খ) শাহসুজা (গ) আওরঙ্গজেব (ঘ) মুরাদ

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শাহ আলম চৌধুরী খুবই রুচিবান ও সৌখিন রাজা ছিলেন। তার স্ত্রী রীনা চৌধুরী অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদূষী রমণী ছিলেন। শাহ আলম চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী অকালে মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে যে সৌধটি নির্মাণ করেন তা আজও বিদ্যমান রয়েছে। শাহ আলম চৌধুরীর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রবল হলে তিনি তা দমনে ব্যর্থ হন।

- তাজমহলের স্থপতি কে ছিলেন? ১
- সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার দ্বন্দের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করুন। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্থাপত্যকর্মের সাথে সম্রাট শাহজাহানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তুলে ধরুন। ৩
- সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে কেন মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে? যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-৩.৯

সম্রাট আওরঙ্গজেব : দাক্ষিণাত্য নীতি, ধর্মনীতি, শাসন পদ্ধতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আওরঙ্গজেব ও তার দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- আওরঙ্গজেব এর শাসন পদ্ধতি ও তার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	জিজিয়া, ফতোয়া-ই-আলমগিরি, শিবাজী, রাজসিংহ, মীর-জুমলা ও অহমরাজ্য
-----	------------	--



সম্রাট আওরঙ্গজেব

মুঘল রাজবংশের শেষ শক্তিদ্র শাসক ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। তার প্রকৃত নাম ছিল মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীর। তিনি দাক্ষিণাত্যের খুদে নামক স্থানে ১৬১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি আরবি, ফার্সি, তুর্কিসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সামরিক দিক থেকেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ১৬৪৫ খ্রি. গুজরাট, ১৬৪৮ থেকে ১৬৫২ খ্রি. পর্যন্ত সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ

শাহজাহানের চারপুত্রের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব বিজয়ী হন। তিনি বৃদ্ধপিতা শাহজাহানকে আত্মার দুর্গে বন্দি করে ১৬৫৮ খ্রি. সিংহাসন অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাই শাহ সুজা ও দারাশিকোকে পরাজিত করে ১৬৫৯ খ্রি. রাজ্য অভিষেক ঘটান এবং আবুল মুজাফ্ফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক কার্যাবলী

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি মুঘল রাজ দরবারের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করেন। সম্রাটের ঝরোকা দর্শন, নওরোজ উৎসব, সংগীত ও তাজিয়া মিছিল নিষিদ্ধ করেন। মসজিদ ও খানকাহ সংস্কার, নির্মাণ এবং ইমাম ও সুন্নি ধর্মবেত্তাদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে দেন। প্রজাদের প্রায় ৪০ প্রকার কষ্টসাধ্য কর বাতিল করেন। মুদ্রায় কলেমা অঙ্কন ও চন্দ্রমাসের বর্ষপঞ্জিও চালু করেন।

সাম্রাজ্যবিস্তারঃ

উত্তর-পূর্ব সীমান্তনীতি

উত্তর-পূর্ব সীমান্তনীতির অংশ হিসেবে আওরঙ্গজেব আসামে অভিযান প্রেরণ করেন। আসাম তখন অহমী হিন্দু জন জাতি কর্তৃক শাসিত ছিল। ১৬৫৮ খ্রি. উত্তররাধিকার সংগ্রামের সময় আসাম সম্রাট শাহজাহানের সময়কার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। আওরঙ্গজেব তার সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদারি অর্পণ করেন। মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. আসামে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬৬২ সালে কুচবিহার মুঘল অধিকারে আসে এবং এক নৌযুদ্ধে আসাম রাজ পরাজিত হন এবং ১৬৬৩ খ্রি. আসাম রাজা পুনরায় মুঘলদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব এর মাতুল আসফ খানের পুত্র। মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তাখানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। আসামের রাজা জয়ধবজের মৃত্যুর পর আসাম ও কামরূপ রাজা চক্রধবজের দখলে আসে। শায়েস্তা খান কামরূপও আসামে মুঘল আধিপত্য স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কুচবিহার মুঘলদের পদানত হয়। ঠিক

একই-সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার বেড়ে যায়। শায়েস্তা খান এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং সন্দ্বীপ দখল করেন। ১৬৬৬ সুবাদার শায়েস্তা খান এর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রামকে আরাকানী জলদস্যু হতে মুক্ত করেন এবং নাম রাখেন ইসলামাবাদ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতি

সম্রাট আওরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাসকারী ইউসুফ জাই, আফ্রিদি, খটক ইত্যাদি আফগান উপজাতিদের দমন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হন। ১৬৬৭ খ্রি. ইউসুফ জাই গোত্র মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের দলপতি ভাণ্ড মোল্লার অধীনে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শমসির খান, আমিন খান ও আটোকের ফৌজদার কালিম খান এই বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেন। ১৬৭২ খ্রি. আফ্রিদি উপজাতি তাদের দলনেতা আকমল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আটোক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আফগান বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৪ খ্রি. তার সেনাপতি আকবর খান, শাহজাদা আকবর ও উজির আসাদ খানকে নিয়ে পেশোয়ার এ উপস্থিত হন। সম্রাট বিদ্রোহ দমনে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে আফগান একেবারে মাঝে ফাটল ধরে। ১৬৭৫ খ্রি. সীমান্তের বিদ্রোহ প্রশমিত হলে সম্রাট রাজধানীতে ফিরে আসেন।

রাজপুত-নীতি

সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুসৃত রাজপুত নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেব অনুসরণ করতে পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রাজপুত নীতি ব্যর্থ হয়েছিল।

মারওয়ার অধিকার

১৬৭৮ খ্রি. যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মারওয়ার রাজ্যে উত্তরাধিকার সংকট দেখা দেয়। তবে এক রাণীর গর্ভে শিশুপুত্র জন্মলাভ করলে তার নামকরণ হয় অজিত সিংহ। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে রাজদরবারে রেখে প্রতিপালন করতে চাইলে রাজপুতরা এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সম্রাট যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রসিংহকে শাসক নিয়োগ করেন কিন্তু তিনি রাজপুতদের দমন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সম্রাট তাকে পদচ্যুত করেন। এরপর সম্রাট শাহজাদা আকবর ও আজমিরের ফৌজদার এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৬৭৯ খ্রি. অবশেষে যোধপুর ও মারওয়ার মুঘল অধিকারে আসে।

মেবার বিজয় ও উদয়পুর চুক্তি

মারওয়ারের রাজপুত্র অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মেবারের রাজা উদয় সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময় জিজিয়া করকে কেন্দ্র করে রাজপুত ও সম্রাটের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। অপর রাজপুত রাজা জয়সিংহ ও দুর্গাদাস রানা রাজসিংহের সাথে চুক্তি করেন। সম্রাট এতে ক্ষুব্ধ হন এবং মেবার বিজয়ে অগ্রসর হন। রাজপুত শক্তি পরাজিত হয় এবং রানা রাজসিংহ পলায়ন করেন। মেবারের শাসনভার যুবরাজ আকবরের উপর অর্পণ করা হয়। রানা রাজসিংহ মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র জয়সিংহ। ক্রমাগত মুঘল ও রাজপুত শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতে উভয় পক্ষই শান্তির পথ অনুসন্ধান করেন। ১৬৮১ খ্রি. উভয় পক্ষের সম্মতিতে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার শর্তানুসারে জয়সিংহকে মেবারের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

দাক্ষিণাত্য-নীতি

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতনার সাথে শান্তি স্থাপন করে এবার দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। তার দাক্ষিণাত্যনীতির সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ।

দাক্ষিণাত্যনীতির প্রেক্ষাপট

প্রথমত; দাক্ষিণাত্যনীতি ছিল মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ। উত্তর ভারতের আধিপত্য বজায় রেখে দক্ষিণ ভারতেও মুঘল শক্তি সম্প্রসারণের ইচ্ছাই ছিল আওরঙ্গজেব এর দাক্ষিণাত্যনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত; বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলো মুঘল অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যে সশ্রুটি এ অবস্থা চলতে দিতে পারেন না।

তৃতীয়ত; বিজাপুর, গোলকুন্ডা নিয়মিত বার্ষিক কর প্রদানের অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল।

চতুর্থত; মারাঠারা এই সময় তাদের দলনেতা শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তৎপর হয়। যা ছিল মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আওরঙ্গজেবের সাথে মারাঠাদের সংঘর্ষের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) প্রথম পর্যায়

ভারতে মারাঠাশক্তির অগ্রদূত ও মহানায়ক ছিলেন শিবাজী। শিবাজী ছিলেন শাহজী ভোসলে ও জিজাবাই এর পুত্র। তিনি ১৬২৭ খ্রি. কর্ণাটে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মহানায়কদের বীরত্বগাথা শুনে শিবাজী স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পান। যৌবনে তিনি মারাঠা শক্তিকে নেতৃত্ব দিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করেন। মূলত ১৬৪৬ খ্রি. হতে ১৬৭৪ খ্রি. পর্যন্ত মুঘলদের সাথে শিবাজী এক দীর্ঘ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। আওরঙ্গজেব এর প্রধানমন্ত্রী আফজাল খানকে শিবাজী হত্যা করলে সম্রাট শায়েস্তা খান ও শাহজাদা মুয়াজ্জেমকে দাক্ষিণাত্যে সুবাদার করে পাঠান। শাহজাদা মুয়াজ্জেম কিছুটা সফল হন। তিনি ২৫টি দুর্গ দখল করতে সমর্থ হন। শিবাজী মুঘলদের সাথে পুরন্দরের চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৬৭৪ খ্রি. শিবাজী ছত্রপতি উপাধি লাভ করে এবং এক হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৮০ খ্রি. শিবাজী মৃত্যুবরণ করে।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়

১৬৮০-৮৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে, শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘলদের করদ রাজ্য ছিল। তারা চুক্তি অস্বীকার করলে সম্রাট ১৬৬৫, ১৬৮০ ও ১৬৮২ সালে পরপর জয়সিংহ, দিলির খান ও শাহজাদা মোয়াজ্জেম কে দিয়ে ৩টি অভিযান প্রেরণ করেন। অবশেষে ১৬৮৬ সালে বিজাপুর মুঘল অধিকারে আসে। সম্রাট ১৬৮৫ খ্রি. গোলকুন্ডার সুলতান কুতুবশাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ৮ মাস দুর্গ অবরোধের পর গোলকুন্ডার প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ পনি উৎকোচ গ্রহণ করে দুর্গের ফটক খুলে দেন। গোলকুন্ডা অবশেষে মুঘলদের হস্তগত হয়।

গ) তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে সম্রাট ১৬৮৭-১৭০৭ পর্যন্ত মারাঠা নেতা শম্ভুজী ও অন্যান্য মারাঠা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সম্রাট মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শম্ভুজীর পর মারাঠা নেতৃত্ব দেন শাহজী, শিবাজীর অপর পুত্র রাজারাম, তার বিধবা স্ত্রী তারাবাই ও পুত্র তৃতীয় শিবাজী। সম্রাটের দাক্ষিণাত্যনীতি ছিল মুঘলদের জন্য অশনি-সংকেত ও সার্বভৌমত্বের এক বড় চ্যালেঞ্জ।

আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি

নিষ্ঠাবান সুন্নী ধর্মাবলম্বী সম্রাট আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। জিন্দাপীর বা দরবেশ বাদশাহ উপাধিপ্রাপ্ত সম্রাটকে অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক ধর্মাত্মক ও হিন্দুবিদ্বেষী বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে যদুনাথ সরকার, এস আর শর্মা, এ, এল শ্রীবাস্তব ও লেনপুল প্রমুখ সম্রাট আওরঙ্গজেব কে ধর্মাত্মক বলেছেন। তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে কতিপয় বর্ণবাদী অভিযোগ এনেছেন যেমন হিন্দু মন্দির ধ্বংস, জিজিয়া কর চালু, রাজ দরবারে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা কমানো ইত্যাদি। তবে এই অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। তিনি যেসব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন তা ছিল বিদ্রোহীদের অস্ত্র ভান্ডার। এটি ছিল তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ কোন ধর্মবিদ্বেষী উদ্দেশ্য নয়। ১৬৭৯ খ্রি. অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য সম্রাট জিজিয়া কর চালু করেন। এটি ছিল তাঁর অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের পদক্ষেপ। এছাড়াও সম্রাটের রাজদরবারের মদ্যপান, সংগীত, নৃত্যকলা প্রদর্শন, ঝারোকা দর্শন, ব্যয় বহুল নওরোজ উৎসব ও বিলাসীতাকে ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এটি ছিল তাঁর ধর্মনিষ্ঠার উদাহরণ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব থেকে সম্রাট এটি করেননি। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামী শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব:

সহজ সরল জীবনযাপনকারী আওরঙ্গজেব ছিলেন উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। কোনরূপ ভোগবিলাস তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কুরআনে হাফিজ ছিলেন এবং নিজ হস্তে কুরআন নকল করতেন ও টুপি সেলাই করতেন। ইসলামধর্মে তার প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মুঘল শাসক। তিনি ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসনিক জ্ঞানসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান শাসক। আওরঙ্গজেব এর মত সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী গুপতি মুঘল বংশে ছিল এক উজ্জল

নক্ষত্রের মত। ঐতিহাসিকরা বলেন, “লেখনী ও তরবারি তার হাতে সমান দক্ষতায় শোভা পেত”। তাঁর সময়ে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য ২১ টি সুবায় বিভক্ত ছিল। সম্রাট ছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও আরবি ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে ‘ফতোয়া-ই-আলমগিরি’ নামক আইন সংকলন রচিত হয়। এছাড়াও ‘মাসীর-ই-আলমগিরি’ বা আলমগিরনামা, ‘মুনতা খাব আল জাবুর’ তাঁর সময়ে রচিত হয়। সম্রাট একজন সুদক্ষ আরবি লিপিকার ছিলেন। এই মহান শাসক ১৭০৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের এর ধর্মনীতি লিখুন।



সারাংশ

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর শাসনামল ছিল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খল ও সংগ্রামমুখর। তিনি অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সচেষ্ট হন। তাঁর রাজপুতনীতি, ধর্মীয়নীতি ও দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘসংগ্রাম শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক। এছাড়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান বিদ্রোহীদের দমন ও দক্ষিণ ভারতের শিয়া রাজ্যগুলোকে করদ রাজ্যে রূপান্তর ও রাজপুত শক্তিকে কঠোরভাবে দমন করে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেন। সফলতা ও ব্যর্থতা মিলিয়ে আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মুঘল শাসক। তারপর ধীরে ধীরে মুঘল বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সফল শাসক কে ছিলেন?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) আওরঙ্গজেব ঘ) বাবর
- কোন মুঘল শাসক জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন?
ক) বাবর খ) আকবর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব
- আওরঙ্গজেব এর উপাধি কি ছিল?
ক) জাহিরুদ্দিন খ) নাসিরুদ্দিন গ) নুরউদ্দিন ঘ) বাদশাহ আলমগীর



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মুঘল বংশের ‘ক’ শাসক ধর্মীয় গুণাবলির জন্য ইতিহাসে জিন্দাপীর হিসেবে খ্যাত। বলা হয়ে থাকে যে, স্পেনের ক্ষত যেমন বীর নেপোলিয়নকে ধ্বংস করে, দাক্ষিণাত্য ক্ষত তেমনি উক্ত শাসককে ধ্বংস করে। কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন তাঁর ধর্মীয় নীতি ও দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

- ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কে আলমগীর উপাধি ধারণ করে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন? ১
- সামুগড়ের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘ক’ শাসকের ধর্মীয় নীতি ও তার ফলাফল আলোচনা করুন। ৩
- আলোচ্য শাসকের ধর্মনীতি ও দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল?– যুক্তি উপস্থাপন করুন। ৪

পাঠ-৩.১০

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালী, হিন্দু নবজাগরণ ও সিপাহী বিদ্রোহ



আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ

১৭০৭ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন। আওরঙ্গজের পরবর্তী মুঘল শাসকগণ হলেন যথাক্রমে;

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ১। বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) | ২। জাহান্দর শাহ (১৭১২-১৩) |
| ৩। ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৯) | ৪। মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) |
| ৫। আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪) | ৬। দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) |
| ৭। দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) | ৮। দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) |
| ৯। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮) | |

মুঘল বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। তিনি কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তবে ইংরেজদের বেতনভোগী পুতুল সম্রাট ছাড়া তিনি আর কিছুই ছিলেন না। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসন বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করে ইংরেজরা এবং রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসন দেয়। সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে এবং এরই মধ্য দিয়ে ১৫২৬ সালে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ

প্রথমত; শাসকের দুর্বলতা: আওরঙ্গজেব পরবর্তী সকল সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল এবং ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক শৌর্য বীর্যের অভাবহেতু কোন শাসকই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ঠেকাতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত; বিশাল সাম্রাজ্য: উত্তরে আফগানিস্তান হতে আসাম এবং কাশ্মীর হতে মহীশুর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল বিশাল। এত বিশাল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষার জন্য যে দক্ষ ও যোগ্য শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল তা আওরঙ্গজেব পরবর্তী শাসকদের মধ্যে ছিল না।

তৃতীয়ত; সূষ্ঠ উত্তরাধিকার নীতি: মুঘল সাম্রাজ্যে কোন উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। এর ফলে সম্রাটের জীবদ্দশাতেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃ সংগ্রাম পরিলক্ষিত হত। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব ও পরবর্তী শাসকগণ প্রায় সবাই নিষ্কলঙ্কভাবে সিংহাসন পাননি। বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে সিংহাসন দখল করতে হয়েছিল।

চতুর্থত; এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্র: শাসনতাত্ত্বিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল এককেন্দ্রিক রাজতাত্ত্বিক শাসন। ১৭ জন সম্রাটের মধ্যে মাত্র ৬ জন যোগ্য শাসক ছিলেন। ব্যক্তিগত দুর্বলতাও দক্ষতার অভাবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা রোধ করা শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পঞ্চমত; আদর্শহীন রাজনীতি: আদর্শহীনতা ও নৈতিকতার অভাবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সকলেই স্বার্থের জন্য কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

ষষ্ঠত; নৈতিকস্থলন: শাসক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যকার নৈতিক স্থলন, ইন্দ্রিয়াসক্ততা ও বিলাস ব্যসন, হেরাম প্রথা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সপ্তমত সামরিক দুর্বলতা: গৌরবের যুগের সেই শৌর্যবীর্য মুঘলদের রক্তে আর ছিল না। শ্রেষ্ঠ শাসক ও তাদের সুদক্ষ সেনাপতি যারা ভারতীয় পারসিক, তুর্কি ও আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন তাদের অভাবে মুঘল সেনাবাহিনীর ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। সৈন্যদের বিশৃংখলা, বিলাসীতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ নৈপুণ্যতাকে ঢেকে দিয়েছিল।

অষ্টমত অর্থসংকট: বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিপালনে যে অর্থের দরকার ছিল তা মুঘল শাসকগণ আহরণ করতে পারেনি। বিলাসীতা, ইমারত, স্থাপত্য ও প্রশাসনিক ব্যয় মুঘল কোষাগার শূণ্য করে দিয়েছিল।

নবমত কেন্দ্র-বিচ্ছিন্নতা: বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক, সুবাদার, নবাব নিজ নিজ অঞ্চলে কেন্দ্রের দুর্বলতা ও দূরত্বের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে, এতে কেন্দ্র তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

দশমত হিন্দু জাতীয়তাবাদ: শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির উত্থান ও একক হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল। ক্রমাগত মুঘল-মারাঠা বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দেয়।

প্রত্যক্ষ কারণ:

প্রথমত নাদির শাহ এর অভিযান: পারস্যের শাসক নাদির শাহ ১৭৩৯ সালে কান্দাহার থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেন। দুর্বল শাসক মুহাম্মদ শাহ তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। নাদির শাহ ভারত হতে বিপুল ধনরত্ন, কোহিনূর, হীরা ও ময়ুর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

দ্বিতীয়ত আহমদ শাহ আবদালীর অভিযান: আহমদ শাহ আবদালী শিখ ও মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ১৭৫৬ খ্রি. ২য় আলমগীরকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। সম্রাট আপোষ করে তার অস্তিত্বকে রক্ষা করেন কিন্তু এতে মুঘল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

তৃতীয়ত ইউরোপীয়দের আগমন: বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আগত ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমশই শক্তিশালী হতে থাকে এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা মুঘল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগ নেয় এবং রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

চতুর্থত সিপাহী বিদ্রোহ ও চূড়ান্ত আঘাত: ১৮৫৭ সালে ইংরেজবিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ক্ষমতাবান ইংরেজরা তার দায়ভার শেষ শাসক ২য় বাহাদুর শাহের কাছে অর্পণ করে। তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরই মধ্যদিয়ে দীর্ঘ ৩০০ বছরের মুঘল শাসনের অবসান ঘটে।

মুঘল শাসনের পতনের ফলাফল:

মুঘল শাসনের পতনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মুঘল শাসনের পতনের ফলে:

- ১) ভারতবর্ষের রাজনীতির ঐক্য শেষ হয়ে যায়
- ২) ইংরেজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩) ভারতবর্ষ ইংরেজ শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ হয়।
- ৪) ভারতীয় মুসলমানদের পতনের সূত্রপাত হয়।



শিক্ষার্থীর কাজ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো লিখুন।



সারাংশ

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ছিল ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় কারণই এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পিছনে দায়ী ছিল। সর্বোপরি, সম্রাটদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা, আঞ্চলিক স্বাধীনতা, হিন্দু নবজাগরণ, ও বৈদেশিক আক্রমণ বিশেষকরে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি মুঘল বংশের পতনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ হিসাবে বিবেচিত। মুঘল শাসনের পতনের ফলে ভারত প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয় এবং সেই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের যবনিকাপাত ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১) মুঘল বংশে মোট কতজন শাসক ছিলেন?
 ক) ১৭ জন খ) ১৮ জন গ) ১৯ জন ঘ) ২০ জন
- ২। সর্বশেষ মুঘল শাসক কে ছিলেন?
 ক) ২য় বাহাদুর শাহ খ) ২য় আকবর গ) ২য় আলমগির ঘ) ২য় শাহ আলম
- ৩। সিপাহী বিপ্লবের দায়ভার ইংরেজরা কার উপর অর্পণ করে?
 ক) আকবর খ) শিবাজী গ) ২য় বাহাদুর শাহ ঘ) সুজাউদ্দৌলা
- ৪। আহমেদ শাহ আবদালী কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন?
 ক) মারাঠা খ) রাজপুত গ) ইউরোপীয় ঘ) বাংলা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিপ্লবী হোসাইন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বললেন- ভারত উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে বহু রাজবংশের উত্থান ও পতন ঘটেছে। বিশ্ব ইতিহাস বড় নির্মম, আজ যে জাতি উন্নতির চরম শিখরে কাল তার পতন ঘটবেই। তেমনি মুঘল বংশ ও দীর্ঘ ৩০০ বছর ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করেও পতনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

১. মুঘল বংশের পতন ঘটে কত খ্রিস্টাব্দে? ১
২. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সম্পর্কে কি জানেন? ২
৩. দীর্ঘ ৩০০ বছরের প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশটির পতনের কারণগুলো আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন। ৩
৪. সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শাসনের পতন ঘটে- আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-৩.১১

মুঘল প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল প্রশাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- মুঘল সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

ভকিল, মীর সামান, মীর বকশি সদর-উস-সুদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত, তানসেন ও সুবাদার



সম্রাট আকবর ও হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের চিত্র রচনা করলেও মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা মূলত: আকবরেরই সৃষ্টি। আকবর ভারতীয় এবং বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রনে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, নিম্নে সংক্ষিপ্ত রূপে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হলো।

মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা

মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথমত; কেন্দ্রীয় শাসন ও দ্বিতীয়ত; প্রাদেশিক শাসন

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যমণি ছিলেন সম্রাট নিজে। তিনি ছিলেন আইনপ্রণেতা এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কারী। সম্রাট ছিলেন ধর্মীয়, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তার ক্ষমতা ছিল অসীম।

উজির: সম্রাটের পরেই এই পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন মূলত সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সম্রাট ও অন্যান্য শ্রেণির মধ্যে তিনি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন।

দিউয়ান: কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিষয়ক ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান।

মীর বকশি: কেন্দ্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কর্মকর্তার নাম ছিল মীর বকশি। সৈন্য নিয়োগ, বেতন প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব ছিল তার।

মীর সামান: মীর সামান বা খান-ই-সামান ছিলেন রাজকীয় গৃহস্থালীর প্রধান।

সদর-উস-সুদুর: সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন সদর উস-সুদুর।

কাজী-উল-কুজ্জাত: কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় প্রধান।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্রের ক্ষমতা বন্টনের অবিকল রূপ ছিল প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে।

সুবাদার: সুবা বা প্রদেশের প্রধান। সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত সুবার সকল সামরিক ও বেসামরিক প্রধান।

দিউয়ান: প্রাদেশিক শাসনের প্রধান অর্থ ও রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান।

কাজী: প্রাদেশিক কাজী, যিনি কেন্দ্রের কাজী-উল-কুজ্জাত দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন।

বকসী: প্রাদেশিক সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন দিউয়ান।

রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মুঘল প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ:

প্রশাসনিক স্তর: মোট ৩টি প্রশাসনিক ইউনিটে সব প্রদেশ বিভক্ত ছিল

- (i) সরকার বা জেলা-প্রধান কর্মচারী ফৌজদার
- (ii) পরগনা-প্রধান কর্মচারী শিকদার
- (iii) গ্রাম-প্রধান কর্মচারী মুকাদেম।

মুঘল শাসনামলে আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ**ক) মুঘল অর্থনীতি**

অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সমৃদ্ধশালী। এই সময় স্থল ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। আঘা, লাহোর ও বাংলা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সুনাম লাভ করে। বণিকদের নিরাপত্তা ও সরাইখানার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় সুতিবস্ত্র ও চিনি, চাল, গম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। লেনদেনের জন্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। মুদ্রার নাম ছিল তাম্রমুদ্রা, দাম, ফুলুম ইত্যাদি। কৃষি ও শিল্পপণ্য তখন উৎপাদিত হত। কার্পাস, তামাক, নীল ও পশম উৎপন্ন হত। ঢাকার মসলিন ছিল এই সময়ে জগৎ বিখ্যাত।

খ) সামাজিক অবস্থা

মুঘল সমাজব্যবস্থা মূলত ৩টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল,

(i) **অভিজাত শ্রেণি:** এই স্তরে ছিলেন সম্রাট, মন্ত্রী, সেনাপতি, আমির ওমারাহ। তাঁরা উচ্চবিলাসী ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

(ii) **মধ্যবিত্ত শ্রেণি:** মূলত, সরকারি বিভিন্ন কর্মচারী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বণিক শ্রেণী ব্যবসায়ী ও মহাজন এই শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন এদের জীবনযাপন ছিল সাধারণ ও রুচিশীল।

(iii) **নিম্নশ্রেণি:** সর্বশেষ স্তর ছিল নিম্নশ্রেণি। এরা ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দাস ও সেবক ইত্যাদি। এরা খুব নগণ্য পোশাক পরিধান করত ও অনেকটা শৃংখলিত জীবন যাপন করতো। এদের জীবন ও জীবিকা ছিল কষ্টসাধ্য। সমাজে বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহ, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

মুসলিম সমাজ ঈদ উৎসব, বিবাহ ও নওরোজ উৎসব অত্যন্ত জাকজমকের সাথে পালন করতো। হিন্দু সম্প্রদায়ও পালা-পার্বণ, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতো।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুকুমার বৃত্তি চর্চার সিংহভাগ কৃতিত্ব মুঘলদের। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মুঘল শাসন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। এই সময় ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও নানা রকম সামাজিক উৎসব সমাজে প্রচলিত ছিল। বিবাহ, নামকরণ, আকিকা ও খণ্ডনা উৎসব প্রচলিত ছিল। এই সব উৎসবে অভিজাত রুচির খাবারের প্রচলন মুঘলরাই করেছিল। উৎসবকে কেন্দ্র করে এবং রাজদরবারে সংগীত এর প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবরের রাজদরবারে তানসেন নামক বিখ্যাত সংগীতশিল্পী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এছাড়াও ছিলেন রামদাস, বিলাস খান ও সুরদাস প্রমুখ সংগীতশিল্পী। মুঘলসমাজে নারীরা সম্মানিত ছিল। এ যুগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারীর কথা আমরা জানতে পেরেছি। মুঘল শাসকগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক সম্রাট নিজেই তাঁদের আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। ইতিহাস চর্চা এই যুগে একটি রীতিতে পরিনত হয়। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকাল ছিল মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ সময়। ভারতীয়, পারসীক, তৈমুরীয় ও ইউরোপীয় রীতির চিত্রকলার বিকাশ ঘটে এই সময়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মুঘল শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরুন।
---	------------------------	---

	সারাংশ
ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলদের ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয় বরং মুঘলরা ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনাকারী। আজকের এই উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য তার সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে মুঘলদের তিনশত বছরের শাসনামলে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১
---	--------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মুঘল প্রশাসনযন্ত্রকে কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২টি

খ) ৩টি

গ) ৪টি

ঘ) ৫টি

২। ভকিল' পদটি দ্বারা কি বুঝায়?

ক) উজির খ) প্রধানমন্ত্রী গ) সেনাপতি ঘ) দ্বাররক্ষী

৩। অর্থ ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বলা হত-

ক) দিউয়ান খ) সেরেস্তাদার গ) ভকিল ঘ) কানুনগো

৪। প্রদেশের প্রধান কর্তাকে কি বলা হত?

ক) কাজী খ) সুবাদার গ) দিউয়ান ঘ) আমির



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:



১. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজবংশের শেষ শাসক কে ছিলেন? ১

২. উক্ত বংশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লিখুন। ২

৩. উক্ত বংশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ৩

৪. আপনি কি মনে করেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণে উক্ত রাজবংশটির পতন ঘটে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৩.১২ মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- মুঘলদের নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

সালিমার উদ্যান, দিউয়ান-ই-খাস, দিউয়ান-ই-আম, শীষমহল, আগ্রা দুর্গ ও মতি মসজিদ



মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন

শিল্পকলার প্রতি মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সর্বজনবিদিত। সমগ্র মুঘল যুগে স্থাপত্য শিল্পের এক নব যুগের সূচনা হয়। কয়েকজন মুঘল শাসক স্থাপত্যশিল্পে তাদের নিজস্বতা প্রকাশ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সম্রাটরা যে আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলী নির্মাণ করেন, সেগুলো তাদের রুচি এবং সংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রমাণ।

সম্রাট বাবর ও হুমায়ুন প্রাথমিকভাবে স্থাপত্যশিল্পের সূচনা করেন কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় হতে স্থাপত্যশিল্প এক নতুন রূপ লাভ করে। আকবরের রাজধানী ফতেহপুর সিক্রি স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম উদাহরণ। আকবর তার স্থাপত্যে লাল রং এর বেলে পাথর ব্যবহার করেছিলেন। ফতেহপুর সিক্রিতে তিনি বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এই সমস্ত ভবনের মধ্যে জামে মসজিদ, বুলন দরওয়াজা, শেখ সেলিম চিশ্তীর সমাধি, দিওয়ান-ই-খাস, সোনাহালা মকান, আম্বর প্রাসাদ, যোধবাঈয়ের প্রাসাদ এবং খাওয়াবগাহ উল্লেখযোগ্য। আগ্রা নগরীরতে তিনি দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রা ফোর্ট - নির্মাণ করেন। সেকেন্দার অবস্থিত আকবরের সমাধি অপূর্ব স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন। সম্রাট জাহাঙ্গীর চিত্রকলায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। তথাপি তিনি কাবুল ও লাহোরের মনোরম প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরী করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বেগম নূরজাহান আগ্রাতে তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিতে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। এই সৌধে পিত্রাভূরা অর্থাৎ বিভিন্ন রং-এর মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।



সম্রাট শাহজাহান নির্মিত তাজমহল

Prince of Builders নামে খ্যাত মুঘল সম্রাট শাহজাহান ছিলেন স্থাপত্যের বরপুত্র। তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আগ্রার তাজমহল। এছাড়া Red Fort (লাল কেল্লা), সালিমার উদ্যান, দিউয়ান-ই-খাস, দিউয়ান-ই-আম, শীষমহল, আগ্রা দুর্গ, মতি মসজিদ ইত্যাদি অমূল্য স্থাপনা রেখে গেছেন। তার স্থাপত্যে শ্বেত মর্মর পাথরের ব্যবহার স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন সংযোজন। এছাড়াও তিনি দিল্লি জামে মসজিদ ও Humayun Tomb ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। মুঘলদের মসজিদ, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র আজও ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বহন করছে এবং মুঘলদের আভিজাত্য ও মেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে টিকে আছে।



শিক্ষার্থীর কাজ

মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল মুঘল আমলে-ব্যাখ্যা করুন।



সারাংশ

স্থাপত্য বিদ্যায় মুঘলদের অবদান ছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে মিলেমিশে আছে মধ্যএশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের যোগসূত্র। তাই মুঘল স্থাপত্যনিদর্শন মুঘল ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ফতেহপুর সিক্রি নগরী নির্মাণ করেন-

ক) আকবর

খ) বাবর

গ) হুমায়ুন

ঘ) সেলিম

২। তাজমহল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল

ক) লাল পাথর

খ) ইট

গ) শ্বেত মার্বেল

ঘ)

৩। মুঘলদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন হলো-

ক) লালকেল্লা

খ) দিউয়ান-ই-খাস

গ) শিশমহল

ঘ) তাজমহল



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

আবু সাঈদ ভারতে বেড়াতে গেলে মধ্যযুগের একটি রাজবংশের বিভিন্ন নিদর্শন, স্থাপত্যশিল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি স্থাপনা যেটি ছিল স্ত্রীর প্রতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ, সেটি দেখে আবু সাইদ ভাবলেন এমন অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপনা সত্যিই সেই বংশের স্মৃতিকে আজও বহন করে আছে।

১. ময়ূর সিংহাসনের স্থপতি কে ছিলেন?

১

২. মুঘল শাসনের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিন।

২

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত সপ্তাশ্চর্যটি মুঘল বংশের কোন শাসকের স্মৃতি বহন করে আছে ব্যাখ্যা করুন।

৩

৪. সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব সেখানে ইট-সুরকির মধ্যে” এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৪



উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১	:	১। গ	২। ঘ	৩। গ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২	:	১। গ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩	:	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। গ ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪	:	১। গ	২। খ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫	:	১। গ	২। খ	৩। গ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬	:	১। ঘ	২। ক	৩। গ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭	:	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮	:	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯	:	১। গ	২। ঘ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০	:	১। ক	২। ক	৩। গ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১	:	১। ক	২।	৩। ক	৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১২	:	১। ক	২। গ	৩। ঘ	

বাংলার ইতিহাস: খলজি, তুর্কি ও বলবনী শাসন (১২০৪-১৩৩৮ খ্রি.)

ইউনিট
৪

ভূমিকা:

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। এ উপমহাদেশের মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয় অষ্টম শতাব্দির প্রারম্ভে। যদিও পরবর্তীতে দ্বাদশ শতকের শেষদিকে ঘুরি এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে তথাকথিত মামলুক শাসকদের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছিল। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছিলেন বাংলার মুসলিম শাসনের সূচনাকারী। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় খলজি, তুর্কি এবং বলবনী শাসনের সূচনা ঘটে এবং এ রাজবংশগুলো বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ- ১ : মুসলিম আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা
- পাঠ- ২ : ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়: চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৩ : বাংলায় খলজি শাসন (১২০৬-১২২৭ খ্রি.)
- পাঠ- ৪ : বাংলায় তুর্কি শাসন (১২২৭-১২৮১ খ্রি.)
- পাঠ- ৫ : বাংলায় বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)

পাঠ-৪.১

মুসলিমদের আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা



উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুসলিম আগমনের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- এ যুগে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	জনপদ, মাৎস্যন্যায়, কৌলিন্য প্রথা ও সনাতন ধর্ম
--	------------	--



ভূমিকা

‘রাষ্ট্র’ হিসেবে বাংলার রয়েছে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে। প্রাচীনকাল থেকে এর নানা অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো জনপদ। মৌর্য ও গুপ্ত যুগ পেরিয়ে বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্ক কর্তৃক বাংলা শাসনের সূত্রপাত ঘটলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এরই ধারায় বাংলায় মাৎস্যন্যায়ের যুগ শুরু হলে অষ্টম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে চার শতাব্দি ব্যাপী স্থায়ী পাল শাসনের সূত্রপাত হয়। একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে পাল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে সেন শাসনের সূচনা হয়। এয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভে সেনরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে মুসলিম বিজয়ী বীর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন বাংলায় সেন রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এর নানা স্থানে স্থানীয় সামন্ত শাসকের উদ্ভব ঘটেছিল। সে যুগে মিথ্যা কৌলিন্য ও আভিজাত্যের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল বাংলার সামাজিক জীবন। বাংলার বর্ণবাদী সমাজের অর্থনীতি ছিল গ্রামভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর। বিত্তশালী ও নিম্নবিত্তের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রচুর। এ সময় বাংলায় বৌদ্ধদের সহনশীল ধর্ম চিন্তার সাথে হিন্দু ধর্মের বাড়াবাড়ি ও প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। তবে সে যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা

সমকালীন উৎসের অভাবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট করে জানা যায় না। প্রাপ্ত বিভিন্ন লিখিত ও অলিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ‘বাংলা’ নামে কোন একক রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। এদেশ তখন অনেকগুলি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকরা যার যার মত করে শাসন করত। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা এলাকাগুলিকে বলা হত জনপদ। প্রাচীন বাংলার এসব জনপদের মধ্যে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রাপ্ত নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপি থেকে জানা যায় যে, এরই ধারায় মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রি.পূ.) বর্তমান বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত পুন্ড্র জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠলে রাঢ় ও বঙ্গ জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মৌর্য শাসনের অবসান ঘটলে বাংলায় গুপ্ত শাসনের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় যে, গুপ্ত শাসনকালেও পুন্ড্র নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কুষাণগণ কিছুদিন এবং পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই উত্তরবঙ্গেও কিছু অংশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে।

বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক ও মাৎস্যন্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনোত্তর যুগে পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের দুর্বলতা ও বিরোধী মৌখরিদের উৎপাতের সুযোগ নিয়ে গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন সামন্ত শশাঙ্ক গৌড় অঞ্চলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙালি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্ক (আনু. ৬০৬-৬৩৭খ্রি.) বাংলার খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে বাংলাকে একটি একক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তার

রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ গ্রামে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও বাংলায় মহা দুর্দিন নেমে আসে। হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মনের হাতে একদিকে যেমন বিশাল গৌড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অন্যদিকে ক্ষমতাসালী ভূ-স্বামীরা একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠে। কোন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় সামন্ত শাসকরা যে যার মত চারদিক জবর দখল করে ফেলেছিল। পাল তাম্রশাসনে এই অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলার এরূপ নৈরাজ্যময় যুগ প্রায় একশ বছর স্থায়ী ছিল।

পাল যুগ

শশাঙ্ক পরবর্তী প্রায় একশ বছরের বিক্ষিপ্ত শাসনামলের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এই অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অষ্টম শতাব্দির মধ্যভাগে দেশের জনগণ মিলিত হয়ে গোপাল (৭৫৬-৭৮১খ্রি.) নামক এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন। তাঁর চেষ্টায় বাংলায় নবযুগের সৃষ্টি হয়। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৮১-৮২১খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। দশম শতাব্দিতে পাল বংশের গৌরব স্তিমিত হতে থাকে। পশ্চিম বাংলার বরেন্দ্রে কৈবর্ত নেতা ভীম ও দিব্যোক কিছু সময়ের জন্য ক্ষমতা দখল করেন। কৈবর্ত শাসন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। পাল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক রামপাল পালরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি পাল বংশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সফল হননি। ফলে তার মৃত্যুর পর পাল শাসন আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। পালদের এই দুর্বলতার সুযোগ সেনরা বাংলায় সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেন যুগ

অযোগ্য পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলার ব্যাপক অংশ নিয়ে একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় সেন শাসনের সূচনা হয়। সেনদের আদি বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট জেলায়। দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন তারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে তারা ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে সামন্ত সেনের নাম পাওয়া যায়। তবে বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০খ্রি.) ছিলেন এ বংশের প্রথম রাজা। অতঃপর সেনবংশের রাজা হন বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮খ্রি.)। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪খ্রি.) পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গৌড় ছিল তার প্রধান রাজধানী। এর অপর নাম ছিল লক্ষণাবতী। পরবর্তীতে তিনি তার রাজধানী নদীয়ায় স্থাপন করেন। তিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান জয় করেন বলে জানা যায়। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে সেন রাজ্যে অতীব দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে চারপাশের সামন্ত শাসকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সুন্দরবন অঞ্চলের ডোমানপাল ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পট্টিকেরা নামে এক রাজ্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেব নামে এক রাজা সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সেনদের এ দুর্বল পরিস্থিতিতে এয়োদশ শতকের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানগণ উত্তর ভারত হয়ে আক্রমণের সূচনা শুরু করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে দিল্লি বিজয়ী বীর মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহার বিজয় সমাপ্ত করে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিতে লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। এ অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব মনে করে রাজা লক্ষণ সেন পলায়ন করে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা খলজিদের অধিকারে চলে যায়। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষণসেনের মৃত্যু হয়। এর স্বল্প দিন পরেই সেন রাজত্বের অবসান ঘটে। এভাবে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

সামাজিক অবস্থা

প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনগণের জীবনমান অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত ছিল। জনগণ নানা পেশায় নিয়োজিত ছিল। কৃষিকাজ ছিল তাদের প্রধান পেশা। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক, যোদ্ধা, তাঁতি, সুতার, স্বর্ণকার সহ নানা সামাজিক পেশার লোক ছিল। এসময় যোদ্ধা, ধর্মযাজক, পণ্ডিত, চিকিৎসক ও অভিজাতগণ উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। এর ফলে সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির জীবনমানে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয় ছিল। অভিজাতগণ সমাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সর্বদা সকল সামাজিক সুবিধা ভোগ করতেন। এ কারণে এ যুগে বাংলায় আর্য প্রভাবেই বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার সূত্রপাত ঘটে। আর্য সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ চারটি শ্রেণি ছাড়াও অনেক শঙ্কর জাতির জনগণও বাংলায় বসবাস করত। সেনযুগে ব্যাপক বর্ণবিন্যাস লক্ষণীয়। এ সময় জাতিভেদ প্রথা এতটাই প্রকট

ছিল যে সমাজে ৩৬ টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। কিন্তু একটির সাথে অন্যটির কোন সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। ফলে তাদের সমাজে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি অনুপস্থিত ছিল। সে যুগে বাংলার জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। বাঙালি চরিত্র ছিল কোমল। বাঙালি জাতির সারল্য, সাধুতা, বিদ্যানুরাগ, মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তবে তাদের চরিত্রে দৃঢ়তা, সাহসিকতা, চঞ্চলতা ও ব্যস্তবাগীশতাও বিরাজমান ছিল। সমাজে নারীর কোন স্বাভাবিক বা স্বাধীনতা ছিল না। পিতা-মাতা ও স্বামীর পরিবারের অধীনেই তাদেরকে থাকতে হত। সমাজে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথাও প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বাংলায় নর-নারীর প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধুতি ও শাড়ি। পুরুষেরা মালকোচা দিয়ে ধুতি পরিধান করত এবং তা হাঁটুর নিচে নামত না। মেয়েদের শাড়ি পায়ে গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত। ধুতি বা শাড়ি ছাড়াও পুরুষেরা চাদর ও মেয়েরা ওড়না পরত। উৎসব বা বিশেষ উপলক্ষে নারী-পুরুষ উভয়েই বিশেষ ধরনের পোষাক পরত। নারী-পুরুষ উভয়েই আঙ্গুলে আংটি, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে বালা, কটিতে মেখলা, পায়ে মল ইত্যাদি গহনা পরত। আহাৰ্য দ্রব্য হিসেবে ডাল, ভাত, মাছ, গোধাত, শাকসবজী, ফলমূল, দুধ, দই, ঘি, ক্ষীর ইত্যাদি প্রধান খাদ্য ছিল। ইলিশ মাছের খুব বেশি কদর ছিল। শুটকি মাছও প্রিয় খাদ্য রূপে গণ্য হত। ভোজ উৎসবে নানা প্রকার মসলাযুক্ত মাংসের ব্যঞ্জন, পিঠা ইত্যাদি এবং কর্পূর মেশানো সুগন্ধি পানি পরিবেশন করা হত। এ সময় নানা রকম মাদক পানীয়েরও ব্যবহার হত। ভোজের পর পান শুপারিও পরিবেশন করা হত। প্রাচীন বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আদৌ উন্নত ছিল না। স্থলপথে গরুর গাড়ি ও জলপথে নৌকা প্রধান বাহন ছিল। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, পালকি প্রভৃতি ব্যবহার করত। বর্ষাকালে সাধারণ মানুষ ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করত। মালামাল পরিবহনের জন্য বড় বড় বজরা নৌকা ব্যবহৃত হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ছিল কৃষি নির্ভর। বর্তমানকালের মত তখনও বেশির ভাগ লোক গ্রামেই বাস করত। গ্রামগুলি ছিল কৃষিভিত্তিক এবং শহরগুলি ছিল শিল্প কারখানা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। বাংলার উর্বর মাটিতে প্রচুর ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা, সরিষা, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উৎপন্ন হত। আখের চাষ প্রচুর পরিমাণে হত। আখের রস থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় তৈরি হত এবং তা বিদেশেও রপ্তানি করা হত। সে যুগে কলা, আম, কাঁঠাল, লেবু, ডালিম ইত্যাদি নানা প্রকার ফলমূল ও সবজির চাষ হত। গরু, ছাগল, হাতি, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি পশু পালিত হত। ভূমির মালিক শাসকগণ হলেও কৃষকেরা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। তবে মজুর, দরিদ্র দূর্দশাগ্রস্ত ও ভূমিহীন কৃষক লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন বাংলা কৃষি প্রধান হলেও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। সে যুগে বাংলার বস্ত্র শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচুর উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র বাংলা থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। এ সময় ধাতু শিল্প এবং মৃৎ শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। কর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি কারিগরদের দ্বারা এ শিল্প উন্নত হয়েছিল। বাংলার কাঠ শিল্প তখন বেশ উন্নত ছিল। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। নৌ ও স্থল পথে বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন হাট, বাজার ও বন্দরে নিয়ে যাওয়া হত। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন পণ্য বাইরেও রপ্তানি করা হত। শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য দিনার এবং রূপক নামের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে সে যুগে কড়ি ব্যবহৃত হত।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করাই তার স্বজাত প্রবৃত্তি। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়েই বাংলায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সভ্যতার বিকাশের ধারায় আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নতুনভাবে গড়ে উঠে। সভ্যতার যুগে গুপ্ত ও মৌর্য যুগের অবসান ঘটলে শশাঙ্ক ও পাল শাসনামলে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছিল। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মীয় গীতিকবিতা ও গান হিসেবে চর্যাপদ রচিত হয়। চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ বলা হয়ে থাকে। সেন যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরো বিকশিত হয়। সেন রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন নিজেরাই বড় পন্ডিত ছিলেন। রামাই পন্ডিত, হুলায়ুধ মিশ্র, সর্বানন্দ, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, সভাকবি জয়দেব প্রমুখ ছিলেন এ যুগের প্রখ্যাত পন্ডিত ও গ্রন্থকার। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এখানকার সমাজে আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের নানা ব্যবস্থা ছিল। হোলি উৎসব, নবান্ন, পৌষ পার্বনেও আনন্দ উৎসবের প্রচলন ছিল। নৃত্য, গীত, যাত্রাভিনয়, কুস্তি, শরীরচর্চা, যাদুমন্ত্র, পাশা, দাবা, নাচগান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল। গোলকধাম ও কড়ি ছিল নারীদের প্রিয় খেলা। সে

যুগে বাঙালিরা বার মাসে তের পার্বণ উদ্‌যাপন করত। নাচ গানে তারা বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত।

ধর্মীয় অবস্থা

ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের পাদপীঠ হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে ইসলাম পূর্ব যুগে বাংলায় নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সময় বাংলায় সনাতন হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং বেদান্ত ভিত্তিক সহজিয়া ধর্মেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সে যুগের অনেক ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণ অবশেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানাদির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাবান্ন উৎসব, চন্ডীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, শিবপূজা, দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, বুলন যাত্রা, হোলি, চড়কপূজা, অনার্য দেবদেবীর পূজা, ধর্মঠাকুর পূজা বিভিন্ন ও মঙ্গলানুষ্ঠান।



সারসংক্ষেপ :

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিভেদ ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ ছিল না। ভারতে এ সময় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ সচ্ছল জীবন যাপন করত। কৃষির উন্নতি হলেও শিল্প ও বাণিজ্যের স্তিমিত অগ্রগতি হয়েছিল। ফলে তৎকালীন বাংলার সার্বিক অবস্থা মুসলিম বিজয় অভিযানের অনুকূলে ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা এবং তিনিই ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. প্রাচীন বাংলার ছোট ছোট স্বাধীন অঞ্চল কি নামে পরিচিত ছিল?

ক) রাজ্য

খ) জনপদ

গ) রাষ্ট্র

ঘ) সাম্রাজ্য

২. প্রাচীন বাংলার প্রধান বাহন ছিল-

ক) গরুর গাড়ি

খ) ঘোড়ার গাড়ি

গ) নৌকা

ঘ) ভেলা

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল-

ক) পালি ভাষা থেকে

খ) সৌরসেনী ভাষা থেকে

গ) আরবি ভাষা থেকে

ঘ) সংস্কৃত ভাষা থেকে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সম্প্রতি বিশ্বের শক্তিশালী একটি দেশের প্রেসিডেন্ট একটি দেশের জনগণকে নিয়ে বর্ণবাদী বক্তব্য দিলে সে দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তেমনি বাংলার ইতিহাসে একটি রাজবংশের শাসনকালে বর্ণবাদী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণকে শোষণ করা। তবে এ সময় জনগণ বিক্ষোভ করতে সমর্থ হয়নি।

ক. পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১

খ. তখনকার হিন্দু সমাজ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সাথে আপনার পঠিত প্রাচীন বাংলার বর্ণবাদী চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি তুলে ধরুন?

৪

পাঠ-৪.২

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়: চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলা বিজেতা বখতিয়ার খলজির জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বখতিয়ার খলজির বাংলা অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- বখতিয়ার খলজি কীভাবে মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

জায়গীর, ইকতা ও মুকতা



ভূমিকা

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলা ছিল প্রধানত: হিন্দু-বৌদ্ধ ও কিছু সংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত জনপদ। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এয়োদশ শতাব্দির সূচনা লগ্নে (১২০৪-১২০৫ খ্রি.) এ দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে সেন শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু সমকালীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ভূগোলবিদদের বিবরণী, পর্যটকদের বর্ণনা, কিংবদন্তী ও লোকগাঁথা থেকে জানা যায় যে, মুসলিম অভিযানের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগের ভিত্তি ছিল বাণিজ্যিক ও ধর্মীয়। বণিকগণ সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে যাওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল হয়ে যেতেন। এতে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। মৌসুমি বায়ু প্রবাহের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য সম্পাদন করতে হত বিধায় আরব বণিকগণ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলিতে তারা বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় বাঙালিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এভাবে বিবাহের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে এবং বাংলায় ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত রচিত হয়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির প্রাথমিক পরিচয়

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কী জাতির খলজি গোষ্ঠীভুক্ত বখতিয়ার আফগানিস্তানের গরমশীর বা আধুনিক দশতগুইগুমাগুএর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। প্রথম জীবনে কর্মহীন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ভাগ্যনেষ্ট্রণে ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে গজনীতে গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি দিল্লিতে গমন করে কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনীর চাকুরি প্রার্থনা করেন। খর্বাকৃতি এবং দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বখতিয়ার খলজি দেখতে কুৎসিৎ ছিলেন বলে এখানেও তিনি ব্যর্থ হন। তিনি এরূপ ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত না হয়ে বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিনের নিকট গমন করে চাকুরির আবেদন করেন। মালিক তাঁকে অতি সামান্য বেতনে, একজন সৈনিক হিসেবে নিয়োগদান করেন। দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার চাকুরি ছেড়ে বদাউন থেকে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামুদ্দিনের অধীনে মির্জাপুরের 'ভগবত' ও 'ভিউলা' নামক দু'টি পরগণার জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি তুর্কী ও খলজি বংশজাত লোকদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালিয়ে ধনরত্ন সংগ্রহ করেন এবং বিহার ও বাংলা জয়ে আগ্রহী হন।

বিহার অভিযান

হুসামুদ্দিনের জায়গীরদার হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করলে চারদিকে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বখতিয়ার খলজি দিল্লির প্রশাসক কুতুবউদ্দিনের অধীনতা স্বীকার করে সর্বপ্রথম পূর্ব ভারতের বিহারে অভিযান চালিয়ে তা দখল করেন। বিহারের উদন্তপুরী বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানচর্চা করতো, ফলে অনেকটা বিনা বাঁধায় তিনি তা

অধিকার করেন। এ সময় থেকে মুসলমানদের নিকট স্থানটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি এ অঞ্চলের শাসনভার পেয়ে একটি বিশাল খলজি বাহিনী গঠন করেন।

নদীয়া অভিযান

বিহারকে মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি পূর্ব দিকে সেনারাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেনবংশীয় বয়োঃবৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। সেনদের আদি রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। নদীয়া ছিল তাদের দ্বিতীয় রাজধানী। তিনি ১২০৪ খ্রি. নদীয়া আক্রমণ করেন। নদীয়া আক্রমণের সময় বখতিয়ার বাংলার সাধারণ প্রবেশ পথ তেলিয়াগহির গিরিপথ দিয়ে না ঢুকে উড়িষ্যার ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের দুর্গম পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে মাত্র ১৭ বা ১৮ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দ্রুতগতিতে নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের হত্যা করে প্রাসাদে ঢুকে অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মূল বাহিনী এসে পড়ে। এ সময় রাজা লক্ষণ সেন মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এ আকস্মিক আক্রমণে ভীত হয়ে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই পেছনের দরজা দিয়ে নৌকা যোগে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। ফলে অনেকটা বিনা বাঁধায় নদীয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়।

লক্ষণাবতী দখল

বখতিয়ার খলজির আক্রমণে ভীত হয়ে লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলে বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনের রাজধানী লক্ষণাবতী দখল করেন (১২০৫খ্রি.) এবং সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি অগাধ ধনসম্পদ, অগণিত পরিচারক, পরিচারিকা ও বহুসংখ্যক হাতি হস্তগত করেন। নদীয়া অধিকারের পর তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নগরটি দখল করেন। এখানে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন।

তিব্বত অভিযান

সাহসী বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ লক্ষ্য ছিল তিব্বত অভিযান (১২০৬খ্রি.)। সম্ভবতঃ দুঃসাহসিক নব বিজয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতেই তিনি এ অভিযান করেছিলেন। তিব্বত অভিযানে যাত্রার পূর্বে তিনি বিজিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করেন। তিনি দশ হাজার সৈন্যসহ এ অভিযান করে ব্যর্থ হন। এতে তাঁর সেনা দলের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়। তিনি ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শোকাহত ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় দেবকোটে ফিরে আসেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ভিন্ন মতে, তিনি আলী মর্দান খলজি কর্তৃক নিহত হন।

বাংলায় শাসন ব্যবস্থা চালু

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস করেন এবং এক ধরনের গোত্রীয় সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি রাজ্যকে কয়েকটি 'ইকতায়' বিভক্ত করে এর প্রতিটিতে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইকতার শাসনকর্তাকে 'মুকতা' বলা হত। বখতিয়ার কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তাদের মধ্যে আলী মর্দান খলজি, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি এবং মুহাম্মদ শীরান খলজি বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁর কৃতিত্ব

বাংলায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা ছিল পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মানদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি রাজ্যময় মুসলমানদের নামাজের জন্য মসজিদ, শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা এবং ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে সুফীদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি যেমন ছিলেন একজন প্রতিভাবান ও দুঃসাহসিক সৈনিক তেমনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করায় এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের পথ সুগম হয়। মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের কারণেই এ দেশে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ হয়। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব বলা যায় যে, বঙ্গ দেশে বখতিয়ার খলজির রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল এ দেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আর্শীবাদ স্বরূপ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বিজীত অঞ্চলগুলো একটি তালিকা তৈরি করুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
উচ্চাভিলাষী ও সমর কুশলী যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় অভিযান করে ক্ষমতাসীন সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। সুশাসনের জন্য তিনি বাংলাদেশকে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলিকে ‘ইকতা’ বলা হত। ইকতার শাসনকর্তাকে বলা হত মুকতা। তিনি বাংলায় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিরও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বখতিয়ারের পর বাংলায় খলজি মালিকদের শাসনের সূচনা হয়েছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
ক) বামিয়ানের খ) গরমশীরের গ) কাবুলের ঘ) কান্দাহারের
- বাংলা জয়ের পর বখতিয়ার খলজি কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?
ক) নদীয়ায় খ) বিক্রমপুরে গ) সোনারগাঁওয়ে ঘ) গৌড়ে
- ইকতার প্রধান কে বলা হত-
ক) নোকতা খ) মুকতা গ) জমিদার ঘ) কৃষক

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
--	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিশ্বের সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জন্ম আফ্রিকার কেনিয়াতে। তার পূর্বপুরুষ ভাগ্যাবেশে আমেরিকায় এসেছিলেন। এই আফ্রিকান সন্তানটিই নিজ কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিসত্তা ও যোগ্যতা গুণে আমেরিকার মতো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তেমনি বাংলায় ইতিহাসেও একজন ব্যক্তি ভাগ্যাবেশে এদেশে এসে নিজ মেধা ও কৌশলের দ্বারা বাংলা জয় করেন ও প্রথম মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করে অমর হয়ে আছেন।

- মুকতা কে? ১
- ইকতা বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত ও ইঙ্গিতকৃত শাসকদের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরুন। ৩
- উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বাংলার শাসকের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৪.৩

বাংলায় খলজি শাসন (১২০৬-১২২৭ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলজি মালিকদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- খলজি মালিকদের শাসনের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন ও
- খলজি মালিকদের সাথে দিল্লির সুলতানদের বহুমুখী সম্পর্কের স্বরূপ জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বাংলার নৌবহর, নাসির আমিরুল মুমেনীন ও গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি



ভূমিকা

সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। কেননা এ বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটালেও তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে তিনি এখানকার শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। ফলে ইবনে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর বাংলায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ কারণে বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বছর ছিল বাংলার ইতিহাসের গোলাযোগপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সময়। এ সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করলেও অনেকে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা সেনাশক্তি প্রেরণের অসুবিধা, সর্বোপরি শাসনকর্তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে অনেকেই দিল্লির প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করতেন। তখন দিল্লির অধীনে ছিল খলজি মালিকদের শাসন তুর্কি সুলতানদের শাসন (১২২৭-৮১ খ্রি.) এবং বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)।

শিরাণ খলজি

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তাঁর তিন সহযোদ্ধা মুহাম্মদ শিরাণ খলজি, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি ও আলী মর্দানের খলজির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। খলজি মালিক ও সৈন্যরা এ সময় মুহাম্মদ শিরাণ খলজিকে নেতা নির্বাচিত করেন। শিরাণ খলজি মাত্র এক বছরকাল শাসকের দায়িত্ব পালন করলেও তিনি নিজ যোগ্যতাবলে আলী মর্দান খলজিকে বন্দি করাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলায় কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু ধূর্ত আলী মর্দান খলজি কৌশলে পালিয়ে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের নিকট আশ্রয় নিলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।

হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি

শিরাণ খলজির মৃত্যুর পর হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২০৮-১২১০ খ্রি.) দিল্লির অধীনস্থ শাসক হিসেবে দেবকোটের শাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র দুই বছর পর আলী মর্দান খলজি দিল্লির সুলতানের সহায়তা নিয়ে দেবকোটে ফিরে আসলে হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি স্বেচ্ছায় শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

আলী মর্দান খলজি

হুসাম উদ্দিন স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ায় আলী মর্দান খলজি (১২১০-১২ খ্রি.) বিনা বাঁধায় শাসক নিযুক্ত হন। আলী মর্দান খলজি দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি ‘আলাউদ্দিন’ উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজ্যে অরাজক অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ অবস্থা নিরসনের জন্য অসংখ্য খলজি আমির তাঁর নির্দেশে প্রাণ হারান। দরিদ্র, দুর্বল ও শান্তি প্রিয় লোকেরা চরম দুর্দশায়

পতিত হয়। আলী মর্দান অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে রাজ্য শাসন করায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমেই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তাঁর বিরোধী আমিরগণ আলী মর্দানের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করে হুসামউদ্দিন ইওয়াজকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি

হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি ‘সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি’ (১২১২-২৭ খ্রি.) উপাধি গ্রহণ করে পুনরায় ১২১২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তৎপর হন। এ ক্ষেত্রে তিনি কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি বিশাল ও সুসজ্জিত নৌবহর গঠন করেন। এতে নৌ পথে আক্রমণের আশঙ্কাও কমে যায়। তাছাড়া তিন লখনৌতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বমন কোট নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। লখনৌতিতে শান্তি স্থাপন করে ইওয়াজ খলজি পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য যেমন কামরূপ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ও ত্রিহুতে আক্রমণ চালনা করেন। ফলে এ সকল রাজ্যের রাজারা গিয়াসউদ্দিনকে উপটৌকন ও কর প্রদানে বাধ্য হন।

দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির সংঘর্ষ

দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিনের রাজ্য বিস্তার ও শক্তিমত্তা সুনজরে দেখেননি। এছাড়া দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় গিয়াস উদ্দিনকে দিল্লি সালতানাতের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করে সুলতান ইলতুৎমিশ স্বেচ্ছা তাঁকে দমনের জন্য অগ্রসর হন। ইওয়াজ খলজি স্থল পথে তাঁর সেনাদল ও নৌপথে রণতরী নিয়ে অগ্রসর হন। দিল্লি বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষের পর তিনি একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইওয়াজ খলজি দিল্লির সুলতানকে ৮০ লক্ষ টাকা ও ৩৮টি হাতি উপহার দেন এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনে স্বীকৃত হন। ইলতুৎমিশ মালিক আলাউদ্দিন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি ফিরে যান। এ সুযোগে ইওয়াজ খলজি আলাউদ্দিন জানীকে সরিয়ে বিহার দখল করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। এ সময় রাজধানী লখনৌতি অনেকটা অরক্ষিত ছিল। এ সুযোগে ইলতুৎমিশের নির্দেশে পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করেন। সংবাদ পেয়ে ইওয়াজ খলজি দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দি এবং পরবর্তীতে নিহত হন। ফলে লখনৌতির রাজনৈতিক ক্ষমতা আবারও দিল্লির অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির কৃতিত্ব

গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি একজন দক্ষ ও সুশাসক ছিলেন। তাঁর সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ন্যায় বিচারচক্র ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। প্রজার কল্যাণে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। সামরিক মেধা, কূটনীতি ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ইওয়াজ খলজি বাংলায় প্রথম নৌবহর গঠন এবং সর্ব প্রথম রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার ন্যায় “নাসির আমিরুল মুমেনীন” বা “কাসিম আমিরুল মুমেনীন” ইত্যাদি নাম ও পদবি ব্যবহার করেন। তিনি শিল্প-সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সুফি, দরবেশ ও আলেমদের জায়গীরের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলে অনেক পীর দরবেশ মধ্য এশিয়া থেকে বাংলায় আসেন এবং ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির নৌ-বহর গঠনের ফলাফল লিখুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর বাংলায় তাঁর সহযোদ্ধা খলজি আমিরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু। খলজি আমিরদের মধ্যে মুহাম্মদ শিরাজ খলজি, হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজি বা গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি, আলী-মর্দান খলজি প্রমুখ শাসকগণ বাংলা শাসন করেন। তাঁদের সাথে দিল্লির সুলতানদের সুসম্পর্ক না থাকায় খলজি মালিকগণ অধিককাল ধরে বাংলা শাসন করতে পারেননি।	



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। লখনৌতির শাসকদের মধ্যে কে প্রথম সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন?

ক) মুহাম্মদ শিরণ খলজি	খ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি
গ) আলীমর্দান খলজি	ঘ) মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি
- ২। কোন খলজি শাসক আব্বাসি খলিফার নাম মুদ্রায় অঙ্কন করেন?

ক) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি	খ) মুহাম্মদ শিরণ খলজি
গ) আলীমর্দান খলজি	ঘ) মালিক সাইফউদ্দিন আইবক
- ৩। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন কে?

ক) বখতিয়ার খলজি	খ) শিরণ খলজি
গ) আলী মর্দান খলজি	ঘ) গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাধ্যমে আরবে উমাইয়া খিলাফতের যাত্রা শুরু হয়। অতীব কূটকৌশল অবলম্বন করে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। আরব বিশ্বে তিনিই প্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। তিনি মুদ্রা জারি ও খুব্বা পাঠ করেছিলেন।

- | | |
|---|---|
| ক. বখতিয়ার খলজীর পূর্ণ নাম কী? | ১ |
| খ. প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতেন না কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের উমাইয়া শাসকের সাথে বাংলার খলজি বংশের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলার শাসকের কৃতিত্ব উল্লেখ করুন। | ৪ |

পাঠ-৪.৪ বাংলায় তুর্কি শাসন (১২২৭-১২৮১ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় তুর্কি শাসনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- তুর্কি শাসকদের সাথে দিল্লির সুলতানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন ও
- তুর্কি শাসনের পতনের কারণসমূহ জানতে পারবেন।

ABC ✓	মূখ্য শব্দ	তুর্কি, মুঘিস উদ্দিন ও বুগরা খান
----------	------------	----------------------------------



দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের নিকট পরাজিত ও নিহত গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির মৃত্যুর পর ১২২৭ খ্রি. হতে ১২৮৭ খ্রি. পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এ সময় দিল্লির সুলতান কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জন ছিলেন মামলুক বা দাস। তবে তারা সবাই তুর্কি ছিলেন বলে এ যুগকে তুর্কি শাসনামল বলাই যুক্তি সঙ্গত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিরাজমান ছিল। বাংলার মত দূরবর্তী প্রদেশের প্রতি দিল্লির সুলতানদের তৎপর হওয়ার সুযোগ ছিল না। বাংলার তুর্কি শাসকগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন। নিচে বাংলায় তুর্কি শাসকদের ধারাবাহিক শাসন কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২২৭-১২২৯ খ্রি.): সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র, অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ছিলেন বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক। তিনি গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত করে অযোধ্যার সাথে বাংলাকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি মাত্র দেড় বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি (১২২৯-১২৩০ খ্রি.): ১২৩১ খ্রি. সুলতান ইলতুৎমিশ বিহারের শাসনকর্তা মালিক আলাউদ্দিন জানীকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলকা খলজি উপাধি ধারণ করেন। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস বাংলা শাসন করেন।

মালিক সাইফুদ্দিন আইবক (১২৩২-১২৩৫ খ্রি.): ইলতুৎমিশ আলাউদ্দিন জানীকে অপসারণ করে বিহারের শাসনকর্তা মালিক সাইফুদ্দিন আইবককে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন তুর্কি ক্রীতদাস। তিন বছর কৃতিত্বের সাথে তিনি বাংলা শাসন করেন।

আওর খান আইবক (১২৩৫-১২৩৬ খ্রি.): সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যু হলে দিল্লিতে গোলযোগ দেখা দেয়। এ সুযোগে আওর খান আইবক লখনৌতির ক্ষমতা দখল করে নেন। তবে অল্পকাল পরেই বিহারের শাসনকর্তা তুঘরিলা তুঘান খানের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে।

তুঘরিলা তুঘান খান (১২৩৬-১২৪৫ খ্রি.): আওর খানকে পরাজিত করে তুঘরিলা তুঘান খান ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ৯ বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক কমরউদ্দিন তমর খান (১২৪৫-১২৪৭ খ্রি.): তুঘরিলা মৃত্যুর পর মালিক কমরউদ্দিন তমর খান বাংলার শাসনভার লাভ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর লখনৌতি শাসন করেন।

জালাল উদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭-১২৫১ খ্রি.): তমর খানের পর জালাল উদ্দিন মাসুদ বাংলা শাসন করেন। তিনি লখনৌতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ১২৫৫ খ্রি. “মুঘিস উদ্দিন” উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৫৭ খ্রি. তিনি কামরূপ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হন।

সুলতান মুঘিসউদ্দিন উয়বক (১২৫১-১২৫৭ খ্রি.): জালালুদ্দিনের মাসুদ জানির পর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন উয়বক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় ছয় বছর বাংলা শাসন করেন।

মালিক ইয়উদ্দিন বলবন-ইউয়বকী (১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.): সুলতান মুঘিসউদ্দিনের নিহত হওয়ার পর মাসুদ জানির জামাতা মালিক ইয়উদ্দিন ইউয়বক লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন এবং দু’বছর প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন।

তাজউদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-১২৬৫ খ্রি.): তিনি খাওয়ারিয়মের জনৈক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি বাহুবলে লখনৌতির সুলতান নিযুক্ত হন।

মুহাম্মদ তাতার খান (১২৬৫-১২৬৮ খ্রি.): আরসালান খানের পর তাতার খান বাংলার শাসনকর্তা হন। তিনি দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও কয়েক বছরের মধ্যে দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

শেরখান (১২৬৮-১২৭২ খ্রি.): তাতার খানের পর শেরখান লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় চার বছর বাংলা শাসন করেন।

আমিন খান (১২৭২ খ্রি.): শেরখানের পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্তৃক অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তুঘরিখ খান কর্তৃক পরাজিত হন।

সুলতান মুঘিসউদ্দিন তুঘরিখ খান (১২৬৮-১২৮১ খ্রি.): বাংলার তুর্কি শাসকদের মধ্যে তুঘরিখ খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পূর্ব বাংলায় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তুঘরিখ খান 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ সংবাদে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যন্ত বিচলিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে বলবন প্রেরিত পর পর দুটি অভিযান-ই ব্যর্থ হয়। অবশেষে বলবন ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেই কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সাথে নিয়ে বাংলায় তুঘরিখের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই শাস্তিমূলক অভিযানে ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে তুঘরিখ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। সপরিবারে তুঘরিখকে হত্যা ও লখনৌতিকে ধ্বংস করে স্বীয়পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বলবন দীর্ঘ তিন বছর পর দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বুগরা খান তাঁর শাসিত বাংলা প্রদেশকে দিল্লি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার স্বাধীন দেশে পরিণত করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলার তুর্কি শাসকদের একটি তালিকা তৈরি করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
বাংলায় তুর্কি যুগে প্রায় পনের জন শাসক ছিলেন। এ সময় দিল্লিতে গোলযোগ ও কোন্দোল থাকায় তুর্কি শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় বলবনী শাসনের সূচনা করেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- তুঘরিখ তুঘান খান বাংলা শাসন করেন?

ক) সাত বছর	খ) আট বছর	গ) নয় বছর	ঘ) দশ বছর
------------	-----------	------------	-----------
- বুগরা খান দিল্লির কোন সুলতানের পুত্র ছিলেন?

ক) সুলতান ইলতুতমিশ	খ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন
গ) সুলতান আলাউদ্দিন খলজি	ঘ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক
- বাংলায় মোট কতজন তুর্কি শাসক ছিলেন?

ক) ১৪ জন	খ) ১৫ জন	চ) ১৬ জন	গ) ১৭ জন
----------	----------	----------	----------

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাংলার শাসকগণ সবসময় স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পছন্দ করতেন। তাই অনেক শাসকই বারবার বিদ্রোহী হয়েছেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তেমনই বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ইলিয়াস শাহ। তিনি সমগ্র বাংলা একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

- | | |
|--|---|
| ক. কতজন তুর্কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন? | ১ |
| খ. বাংলায় তুর্কি শাসকদের সম্পর্কে লিখুন। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে বাংলার কোন তুর্কি শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। | ৩ |
| ঘ. 'উদ্দীপকের রাজবংশের মতো বাংলায় তুর্কি শাসকদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান' -বক্তব্যটি মূল্যায়ন করুন। | ৪ |

পাঠ-৪.৫

বাংলায় বলবনী শাসন (১২৮১-১৩২০ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় বলবনী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বুগরা খান ও পুত্র কায়কোবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও
- বলবনী শাসন সমাপ্তির ইতিহাস জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বুগরা খান, আমির খসরু, পাণ্ডুয়া ও বাহরাম শাহ



ভূমিকা

বাংলায় তুর্কি শাসকগণ দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায় দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার শাসক মুঘিস উদ্দিন তুঘরিলা-এর বিরুদ্ধে নিজপুত্র বুগরা খানকে প্রেরণ করেন। বুগরা খান তুঘরিলাকে দমন করে নিজে এখানে অবস্থান করতে শুরু করলে বাংলায় সরাসরি বলবনী শাসনের সূত্রপাত ঘটে। নিচে বাংলায় বলবনী শাসকদের ধারাবাহিক শাসন কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

বুগরা খান (১২৮৭-১২৯০ খ্রি.)

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুঘিস উদ্দিন তুঘরিলাকে হত্যা করলে বাংলায় স্বাধীন তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। তিনি বাংলাকে দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করে পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ খান বা বুগরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লিতে ফিরে যান। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পুত্র বুগরা খান দিল্লির অধীনে শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বুগরা খান বাংলাকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন।

বুগরা-কায়কোবাদ দ্বন্দ্ব

বুগরা খান “সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ” উপাধি ধারণ করে ১২৮৭ খ্রি. থেকে ১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন। পিতা বলবনের অনুরোধ সত্ত্বেও দিল্লির শাসনভার গ্রহণ না করায় বলবন বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লির শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তরুণ সুলতান আরাম আয়াসে দিনাতিপাত করতে থাকেন। এ সুযোগে মন্ত্রী নিজামউদ্দিন রাজ্যের সর্বস্বা হয়ে উঠে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বুগরা খান দূর থেকে পুত্রকে পত্র লিখেও সৎপথে আনতে ব্যর্থ হন। বিরক্ত হয়ে তিনি একটি বাহিনী নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সংবাদে কায়কোবাদ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে সরয় নদীর উভয় তীরে দু, পক্ষের শিবির স্থাপিত হয়। কিন্তু পুত্র কায়কোবাদ স্বপ্নোদিত হয়ে পিতা বুগরা খানের নিকট সমঝোতার প্রস্তাব দিলে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। পিতা-পুত্রের এ মিলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘ভারতের তোতা পাখি’ খ্যাত কবি আমির খসরু ‘কিরান-উস-সাদাইন’ নামক কালজয়ী কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। বুগরা খান পুত্রকে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অনেক উপদেশ দিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে দিল্লির সুলতান বাংলার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। বুগরা খান তাঁর রাজ্যকে বিহার, সাতগাঁও, বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) এবং দেবকোট (উত্তরবঙ্গ)-এ চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি বেশিদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেননি। পুত্র কায়কোবাদ নিহত হলে তিনি স্বেচ্ছায় পুত্র কাইকাউসের উপর রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন।

সুলতান রুকন উদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ খ্রি.)

বুগরা খান স্বেচ্ছায় পুত্র কায়কাউস এর হাতে বাংলা ও বিহারের শাসনক্ষমতা অর্পণ করলে কায়কাউস ১২৯১ খ্রি. সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় দশ বছর কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করেন। দিল্লিতে তুর্কি-মামলুকদের পতন ঘটিয়ে খলজিগণ ক্ষমতা দখল করলে বহু তুর্কি বাংলায় চলে আসেন। দিল্লির খলজি সুলতানদের আমলে বাংলা আক্রান্ত না হওয়ায় বাংলার সুলতান কায়কাউস নির্বিঘ্নে শক্তি বিস্তার ও শাসন সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় বহু মুসলিম সুফি, আলেম, ফকির দরবেশ বাংলায় এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টা করেন। এ সকল আলেম ও সুফিদের মধ্যে কাজী

রুকনউদ্দিন সমরকন্দী, শেখ জালাল উদ্দিন তাবরাজী ও মাওলানা শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সুলতানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলায় বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ ও খানকাহ নির্মিত হয়। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পীর-দরবেশদের খানকায় গমনের ফলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে।

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রি.)

রুকনউদ্দিন কায়কাউসের পর সুলতান হন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি একুশ বছর বাংলা শাসন করেন। মেধা ও যোগ্যতাবলে প্রথমে তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। একজন বিজেতা হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোনারগাঁও ও সাতগাঁও ছাড়াও ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল তাঁর সময়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তাঁর সময় সুফি-দরবেশগণ বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত ছিলেন। ফিরোজ শাহ একজন শক্তিশালী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি লখনৌতি হতে পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পাণ্ডুয়ার নাম দেন ফিরোজাবাদ। ফিরোজ শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ বার বছর পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের উপর তার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বাংলা মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণে তাঁর অপরিসীম অবদান ছিল।

শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্রদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র যথা: শিহাবউদ্দিন বুগরা শাহ, নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহ ও গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধে। তেজস্বী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাহাদুর শাহ লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করলে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই নাসির উদ্দিন ইব্রাহিম দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে একটি সৈন্য দল প্রেরণ করেন। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হলে পূর্ববঙ্গে তাতার খানকে এবং পশ্চিম বঙ্গে নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম শাহকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর পরাজিত গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বন্দি করে দিল্লি নিয়ে যান। গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুরপর মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সুলতান হয়ে প্রায় তের বছর বাংলার উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। তিনি এ সময় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বাংলায় চলে আসেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক সোনারগাঁও এর শাসনভার যৌথভাবে তাঁকে এবং তাতার খানকে দেন। এদিকে তাতার খান 'বাহরাম শাহ' উপাধি নিয়ে সোনারগাঁওয়ে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বিদ্রোহী হয়ে নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। এতে বাহরাম শাহ তাঁর বিরুদ্ধে ১৩৩০ খ্রি. অভিযান পরিচালনা করেন। সংঘর্ষে বাহাদুর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে বাংলায় বলবনী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন সুলতানি শাসনের সূত্রপাত হয়।



শিক্ষার্থীর কাজ

গিয়াসউদ্দিন বলবন ও পুত্র বুগরা খানের মধ্যকার সম্পর্কে বিষয়ে একটি চার্ট তৈরি করুন।



সারসংক্ষেপ :

বুগরা খান ছিলেন বাংলায় বলবনী বংশের প্রথম শাসক। কাইকাউস ও শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ছিলেন এ বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক। শামসুদ্দিন ফিরোজের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ দেখা দেয়। এ সুযোগে দিল্লির তুঘলক শাসকগণ বাংলার শাসকদের ভাগ্যবিধাতা বনে যান। বাহরাম শাহ কর্তৃক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর সংঘর্ষে নিহত হলে বাংলায় বলবনী বংশের অবসান ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় বলবনী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

ক) কাইকাউস

খ) বুগরা খান

গ) শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর

২। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ রাজধানী লখনৌতি থেকে স্থানান্তর করেন?

- ক) সাতগাঁও-এ খ) সোনারগাঁও-এ গ) পাণ্ডুয়ায় ঘ) ফিরোজাবাদে

৩। ‘বাহরাম শাহ’ উপাধি ধারণ করেন?

- ক) কাইকাউস খ) গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর গ) তাতার খান ঘ) নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম

৪। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল-

- ক) বলবন-কায়কাউসের মধ্যে খ) বুগরা খান-কায়কোবাদের মধ্যে
গ) ফিরোজ শাহ-বুগরা খানের মধ্যে ঘ) বুগরা খান-কায়কাউসের মধ্যে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ভারতবর্ষের মুঘলদের একজন পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন সম্রাট শাহজাহান। সম্রাট শাহজাহানের জীবিত অবস্থায়ই তার চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এ দ্বন্দ্ব আওরঙ্গজেব বিশেষ নেতৃত্বগুণ ও কৌশলী বুদ্ধিমত্তার কারণে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ কৃতিত্বের সাথে শাসন করেছিলেন।

- ক. বাংলার শাসক বুগরা খানের উপাধি কী? ১
খ. বুগরা খান কেমন শাসক ছিলেন উল্লেখ করুন। ২
গ. উদ্দীপকের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে বাংলার কোন বলবনী শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ বলবনী শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪



উত্তরমালা:

- পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১. ক ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ

বাংলার ইতিহাস: স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)



ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হলে বাংলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। কেননা এরপর থেকে রাজা গণেশের স্বল্পকালীন শাসনামল ব্যতীত ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব খলজি মালিক, তুর্কি শাসক ও বলবনী শাসকগণ বাংলা শাসন করেছেন তাদের অনেকেই পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন না, বরং তাঁরা দিল্লির সুলতানদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। কিন্তু দিল্লি থেকে বাংলা দূরবর্তী স্থানে হওয়ায় তাঁদের অনেকেই সুযোগ পেলেই স্বাধীনতার জন্য দিল্লির সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এজন্য বাংলাকে বুলঘাকপুর বা বিদ্রোহের নগরীও বলা হত। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও-এ স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন। তখন থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ধরে বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। বাংলার এই স্বাধীন সুলতানি যুগে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ, ইলিয়াস শাহী বংশ, রাজা গণেশের বংশ, হাবশি সুলতান এবং পরবর্তীতে হোসেন শাহী বংশের শাসকগণ বাংলা শাসন করেছেন। এ সময় বাংলার সুলতানগণ নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের পাশে স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাসংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন, জনকল্যাণকামী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই দু'শ বছরের এ স্বাধীন যুগটিকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা হয়।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ- ১ : সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা, চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন
- পাঠ- ২ : ইলিয়াস শাহী বংশ: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- পাঠ- ৩ : সিকান্দর শাহ ও গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
- পাঠ- ৪ : রাজা গণেশ ও পরবর্তী শাসন
- পাঠ- ৫ : পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ
- পাঠ- ৬ : বাংলায় হাবশি শাসন
- পাঠ- ৭ : হোসেন শাহী বংশ: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- পাঠ- ৮ : পরবর্তী হোসেন শাহী শাসন ও হোসেন শাহী বংশের অবদান
- পাঠ- ৯ : সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৫.১

সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা, চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় কীভাবে স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকাল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার বাংলায় ভ্রমণের বিবরণ দিতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

ফখরুদ্দিন, সোনার গাঁ ও ইবনে বতুতা



ভূমিকা

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসকগণ দিল্লির সুলতানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলে বাংলাকে সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও এই তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের (তাতার খান) মৃত্যু হলে ‘ফখরা’ বা ফখরুদ্দিন নামে তাঁর একজন সিলাহদার (বর্মরক্ষক) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ‘মুবারক শাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। এ সময় দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় বাংলায় ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযান প্রেরণ করতে পারেননি। ফলে বাংলা দিল্লির প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফখরুদ্দিন বাংলায় তাঁর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করলে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলায় দু’শো বছরের স্বাধীন ইতিহাসের সূচনা হয়।

প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন ও সোনারগাঁও পুনরুদ্ধার

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণায় লখনৌতির গভর্নর কদর খান ও সাতগাঁও-এর গভর্নর মালিক ইজুদ্দিন ইয়াহিয়া যৌথভাবে ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। শত্রুপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বর্তমান টাঙ্গাইলের মধুপুরের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। আক্রমণকারীদের অনেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেও কদর খান সোনারগাঁও-এ থেকে যান। ফখরুদ্দিন বর্ষার আগমনের প্রতিক্ষায় ছিলেন। কারণ সোনারগাঁও ছিল নিম্ন অঞ্চল। অঞ্চলটি বর্ষায় প্লাবিত হলে কদরখানের সেনাবাহিনীকে সহজেই কাবু করা যাবে। বর্ষা মৌসুম এলে ফখরুদ্দিন সোনারগাঁও-এ অবস্থানরত কদর খানকে পাল্টা আক্রমণ করলে কদরখান অবরুদ্ধ হন। ফখরুদ্দিন কদর খানের সৈন্যদের গোপনে ঘুষ প্রদান করে তাদেরকে নিজের দলভুক্ত করেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কদর খান পরাজিত ও নিহত হলে ফখরুদ্দিন সোনারগাঁও পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। এই সোনারগাঁও-ই হল স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজধানী।

তাঁর কৃতিত্ব

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। একজন যোগ্য শাসক ও কূটকৌশলী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেকটা সম্প্রসারণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিজয় করেন এবং এ পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগে তাঁর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে ছিল। লখনৌতি দখলের জন্য বার বার চেষ্টা করেও তিনি সফলতা পাননি। তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

প্রজাহিতৈষী শাসক

তিনি একজন বিচক্ষণ ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি আউলিয়া, পীর-দরবেশ ও ফকিরদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে চট্টগ্রাম থেকে পুরো পূর্ববঙ্গে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণী

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে সুদূর আফ্রিকার মরক্কো থেকে ইবনে বতুতা নামে একজন মুসলিম পর্যটক ১৩৪৫-৪৬ খ্রি. বাংলায় আসেন। তাঁর 'রেহেলা-ই-ইবনে বতুতা' নামক ভ্রমণ বিবরণীতে সমসাময়িক বাংলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি তৎকালীন বাংলার কৃষি, বাণিজ্য, সামাজিক অবস্থা, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতা সিলেটের প্রখ্যাত সাধক হযরত শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীকালে তিনি চীনের রাজদরবার গমনের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মানচিত্রে সোনারগাঁ-এর অবস্থান চিহ্নিত করুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মে বাংলার অভ্যন্তরীণ অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটলে বাংলার সুনাম এর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সময়ে বাংলার সীমানা চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হলে বাংলার গৌরব উজ্জ্বলতর হয়। তাই ফখরুদ্দিনের রাজত্বকালকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- কোন সনে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় ?
ক) ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে গ) ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে
- সোনারগাঁও-এর কোন শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ?
ক) বারোস খান খ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ গ) কদর খান ঘ) মালিক ইজুদ্দিন ইয়াহিয়া
- কোন পর্যটকের বর্ণনায় স্বাধীন সুলতানি শাসনামলের প্রাথমিককালের বর্ণনা পাওয়া যায়?
ক) আল মাজুসি খ) বার্নিয়ার গ) মাহুয়ান ঘ) ইবনে বতুতা

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

পলাশীর আশ্রয়কাননে ১৭৫৭ সালে ২৩ শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ হয়। দেশীয় এক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে নবাবের পতন হয় এবং প্রায় দু'শো বছরের জন্য বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। কিন্তু এর পূর্বের বাংলার ইতিহাসে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত দু'শো বছরেরও স্বাধীন শাসনের ইতিহাস রয়েছে যা শিক্ষা-সংস্কৃতি উৎকর্ষসহ আর্থ-সামাজিক নানা উন্নয়নে সমৃদ্ধ।

- ক. বুলঘাকপুর অর্থ কী? ১
- খ. সোনারগাঁ এর পরিচয় দিন। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম দু'শো বছর ও শেষোক্ত দু'শো বছরের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসন কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৫.২

ইলিয়াস শাহী বংশ: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলার সুলতানি আমলের প্রথম স্বাধীন রাজবংশ ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইলিয়াস শাহের রাজ্য বিস্তারের একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, শাহ-ই-বাঙ্গালাহ ও একডালা দুর্গ
--	------------	--



শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্রাথমিক জীবন

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পরিচয় ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক ইবন হজর ও আল সাখাভির মতে, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে তাঁর নাম ছিল হাজী ইলিয়াস। তিনি পূর্ব ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ইলিয়াস শাহ কখন, কিভাবে ভারতবর্ষে আসেন তাঁর সমকালীন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে গোলাম হোসেন সলিম এর *রিয়াজউস-সালাতীন* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজী ইলিয়াস ও তাঁর এক দুধভাই আলী মুবারক এক সময় দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের ভৃত্য ছিলেন। কিন্তু এসময় কোন অপকর্ম করে হাজী ইলিয়াস জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যান। এর ফলে ফিরোজ শাহ হাজী ইলিয়াসকে ধরে আনার জন্য আলী মুবারককে আদেশ করেন। আলী মুবারক হাজী ইলিয়াসকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলে ফিরোজ শাহ আলী মুবারককে বিতাড়িত করেন। অতঃপর আলী মুবারক বাংলায় চলে আসেন এবং লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে চাকরি লাভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই আলী মুবারক কদর খানের আস্থাভাজন হন এবং কালক্রমে প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সাথে এক যুদ্ধে কদর খান নিহত হলে তাঁর সেনাধ্যক্ষ আলী মুবারক 'সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ' উপাধি গ্রহণ করে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের ক্ষমতালাভ

ভাই আলী মুবারক লখনৌতির শাসক হলে হাজী ইলিয়াস কিছুকাল পরে দিল্লি হতে বাংলায় আসেন কিন্তু আলী মুবারক তাঁকে বন্দি করেন। পরে তাঁর মাতার অনুরোধে আলী মুবারক তাঁকে ছেড়ে দেন এবং উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু হাজী ইলিয়াস এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে নিজে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন 'ইলিয়াস শাহ' উপাধি গ্রহণ করে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন।

শাসন সুদৃঢ়করণ

একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ইলিয়াস শাহ শাসন ক্ষমতায় বসেই সেনাবাহিনীকে সুসংহত করেন। তিনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করে সার্বভৌম রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন এবং একে একে সাতগাঁও, ত্রিহুত, নেপাল ও পূর্ব বাংলা সহ অনেক স্থানে অভিযান চালনা করে ইলিয়াস শাহী শাসনকে সুদৃঢ় করেন।

রাজ্য বিস্তার:

সাতগাঁও বিজয়

ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলার অধিপতি হয়ে ফিরোজাবাদে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে সাতগাঁও-এর দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি ১৩৪৬ সালের মধ্যে সাতগাঁও সহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন।

ত্রিহুত বিজয় ও নেপাল অভিযান

ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ত্রিহুত অধিকার করেন। তিনি ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপালে অভিযান করে দুর্গম পর্বতময় নেপাল থেকে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করে বাংলায় ফিরে আসেন।

সোনারগাঁও অধিকার

ইলিয়াস শাহ অতঃপর পূর্ব বাংলায় একটি সাফল্যজনক বিজয়াভিযান প্রেরণ করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের পুত্র ও সোনারগাঁও-এর শাসক ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে পূর্ব বঙ্গে রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। লখনৌতি, সাতগাঁও এবং এর সাথে সোনারগাঁও অধিকার করে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার একচ্ছত্র অধিপতির মর্যাদা লাভ করেন। ইতিপূর্বে এই বিরল গৌরব আর কোন মুসলমান শাসক অর্জন করতে পারেন নি। এ কারণে ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং ‘সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

অন্যান্য বিজয়

পুরো বাংলার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ইলিয়াস শাহ রাজ্য বিস্তারের জন্য বাংলার বাইরে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিচ্চা ব্রহ্ম পর্যন্ত অগ্রসর হন। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের বিদ্রোহ দমনের ব্যস্ততায় তিনি বিহারেও সাফল্যজনক অভিযান প্রেরণ করেন। বিহারের সাফল্যে ইলিয়াস শাহের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থের বর্ণনামতে, অতঃপর তিনি আরো পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী পর্যন্ত জয় করে এক বিশাল ভূখণ্ড রাজ্যভুক্ত করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে সংঘর্ষ

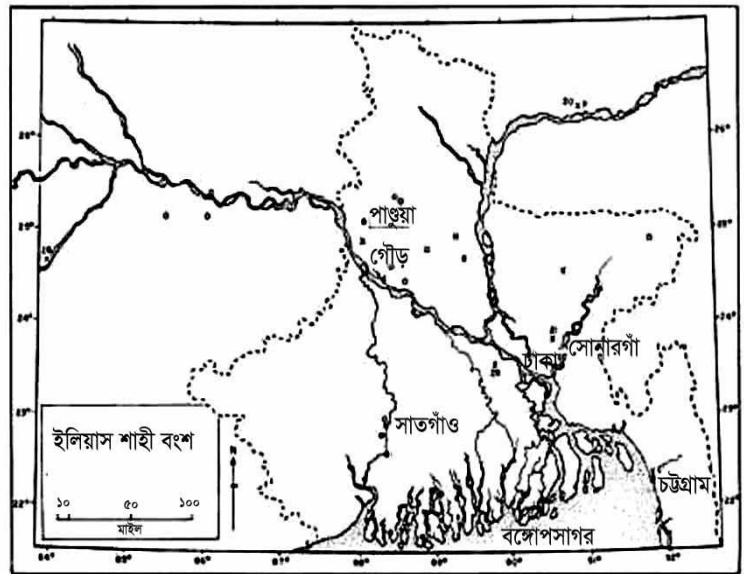
ইলিয়াস শাহের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিশাল সেন্যবাহিনী নিয়ে ইলিয়াস শাহকে দমন করতে বঙ্গ অভিযানে আসেন। ইলিয়াস শাহ তাঁর সুরক্ষিত একডালা দূর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজশাহ পাণ্ডুয়া দখল করে একডালা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। বহু চেষ্টা করেও ফিরোজ শাহ দূর্গটি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে সন্ধি স্থাপন করে দিল্লিতে ফিরে যান। সন্ধির শর্তানুযায়ী ইলিয়াস শাহ পরে নানাবিধ উপটোকন পাঠিয়ে ফিরোজের বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হন।



শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা

ত্রিপুরা অভিযান

ফিরোজশাহ দিল্লিতে ফিরে গেলে ইলিয়াস শাহ রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের দিকে নজর দেন। গৌড় রাজমালা গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী এ সময় রত্ন-ফা নামক একজন রাজকুমার ত্রিপুরার শাসক হন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভাইরা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাড়িয়ে দিলে রত্ন-ফা ইলিয়াস শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরায় সামরিক অভিযান চালিয়ে রত্ন-ফাকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রত্ন-ফা ইলিয়াস শাহের এ বন্ধুত্বকে স্মরণে রাখায় ত্রিপুরার উপর বাংলার কর্তৃত্ব অনেকদিন বজায় ছিল।



ইলিয়াস শাহী বংশ

ইলিয়াস শাহের অন্যান্য কৃতিত্ব

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্থায়ী বুদ্ধি, শৌর্য, ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির চারম শিখরে আরোহণ করেন। সামান্য আঞ্চলিক শাসক থেকে সমগ্র বাংলা দেশকে একত্র করে শাসনকর্তা হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। তাঁর শাসনামলে বাংলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তাঁর নিরপেক্ষ সুশাসনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দূর দৃষ্টি সম্পন্ন শাসক ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহের

আক্রমণের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ইলিয়াস শাহ একজন ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ফকির ও দরবেশগণকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। পীর আঁখি সিরাজউদ্দিন ও তাঁর শিষ্য শায়খ আলাউল হক এবং শায়খ রাজা বিয়াবানী এদেশে আগমন করে তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। তিনি তাঁদের সম্মানে রাজময় খানকাহ, মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

কৃতিত্ব মূল্যায়ন

ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। একজন সামান্য শাসক থেকে একত্রিত বৃহৎ বাংলা প্রতিষ্ঠিত করে এখানে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনকল্যাণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত করায় ইলিয়াস শাহ বাংলার ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। দুইবাংলার সমগ্র সীমানাকে একত্রিত করে *বাঙ্গালাহ* নামটি তাঁর সময়েই প্রচলিত হয় এবং শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে *শাহ-ই-বাঙ্গালাহ* বলা হয়। তাঁর রাজত্বকালে বাঙালিরা সর্বপ্রথম একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় বাংলার লোকেরা *বাঙালি* হিসেবে পরিচিত হয়। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক’ বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার ইতিহাসের এ মহানায়ক সুদীর্ঘ ১৬ বছর রাজত্ব করার পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	একটি চার্টের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক জয়কৃত অঞ্চলের পরিচয় তুলে ধরুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করলেও সুলতানি যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে লখনৌতির শাসক হয়ে লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও বিহার অধিকার করে সমগ্র বাংলাকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে এনে ইলিয়াস শাহ বাংলার ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করে আছেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আদি নিবাস ছিল
 - ক) কাবুলে
 - খ) সিজিস্তানে
 - গ) খুরাসনে
 - ঘ) সমরখন্দে
- হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেন
 - ক) ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে
 - খ) ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে
 - গ) ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে
 - ঘ) ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে
- ফিরোজ শাহ তুঘলক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে দমন করতে এলে তিনি কোন দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন?
 - ক) পাণ্ডুয়ায়
 - খ) লখনৌতিতে
 - গ) একডালায়
 - ঘ) সোনারগাঁওয়ে
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম জনক ছিলেন?
 - ক) ফখরুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
 - খ) আলাউদ্দিন আলী শাহ
 - গ) সিকান্দর শাহ
 - ঘ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সুমন ও জাভেদ ঢাকা প্রিমিয়ার লীগের ফুটবল লেখা দেখছিল। আবাহনী ও মোহামেডানের মধ্যকার এ খেলায় দু’দলে বেশ কয়েকজন বিদেশী খেলোয়াড় দেখে সুমন বললো, আমাদের দেশে এখন অনেক বিদেশী খেলোয়াড় রয়েছে। জাভেদ বললো, হ্যাঁ, এদের অনেকে আবার এখানে বিয়ে-শাদি করে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। মধ্যযুগে বাংলায়-ও বিদেশীরা এসে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

- ক. ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ কার উপাধি ছিল? ১
- খ. ইলিয়াস শাহ বাংলার সীমানা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন কেন? বর্ণনা দিন। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিদেশীদের মতো ইলিয়াস শাহী শাসকেরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন-তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসন কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৫.৩ সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সিকান্দর শাহের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আজম শাহের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ও
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে আজম শাহের বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	মা-হুয়ান, কবি হাফিজ ও কোতওয়ালী দরজা
--	------------	---------------------------------------



সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রি.)

সিংহাসনে আরোহণ

পিতা সুলতান শাহসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় যোগ্য, পরাক্রমশালী, সাহসী ও প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন। সিকান্দর শাহ বাংলা দেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সর্বাধিককাল রাজত্ব করেন। সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনকালে তিনি বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেন।

দিল্লির সুলতান ফিরুজশাহের সাথে সম্পর্ক

সিকান্দর শাহের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হল দিল্লির সুলতানের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মনে করেছিলেন যে, বাংলায় নতুন সুলতান ক্ষমতায় বসায় তাঁর বাংলা অধিকার সহজ হবে। এ জন্য সিকান্দর শাহ ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দ্বিতীয়বারের মত বাংলায় অভিযান চালনা করেন। তিনি সিকান্দর শাহকে বশ্যতা স্বীকারের জন্য চরমপত্র পাঠান। কিন্তু সিকান্দর শাহ এতে সাড়া না দেওয়ায় ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে ৭০ হাজার অশ্বরোহী, ৪৭০টি হাতি, লক্ষাধিক পদাতিক সৈনিক ও বিশাল এক নৌ-বাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। সিকান্দর শাহ পিতার ন্যায় দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি ফিরোজ শাহের বশ্যতা অস্বীকার করে পিতার ন্যায় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরোজ শাহ দুর্গটি অবরোধ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন খণ্ড যুদ্ধ হয়। দিল্লির সেনা বাহিনীর অব্যাহত আক্রমণের মুখেও সিকান্দর শাহের সেনাদলের মনোবল অটুট ছিল।



পাড়ুয়ার আদিনা মসজিদ

অবশেষে বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় এবং রসদ সংকটে পড়ায় দিল্লি বাহিনী বাংলার বাহিনীর সঙ্গে সন্ধির জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ফিরোজশাহ তুঘলক ও সিকান্দর শাহ পরস্পরের মধ্যে মূল্যবান উপটোকনাদি বিনিময় করেন। প্রকৃতপক্ষে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় অভিযান ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলা পূর্বের মত স্বাধীন থেকে যায়। এরপর প্রায় দু'শো বছরের মধ্যে দিল্লির আর কোন সুলতান বাংলা দখলের চেষ্টা করেননি।

শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ

তিনি একজন শিল্পানুরাগী ও শিল্পস্রষ্টা সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সিকান্দর শাহের উদার নীতির ফলে স্থাপত্য শিল্পে দেশী ও বিদেশী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে। এ কারণে বাংলাদেশের স্থাপত্য রীতিতে নতুন

এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর রাজত্বকালের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ দিনাজপুরের মোল্লা আতার মসজিদ এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় দশ বছর (১৩৭৪-৮৪ খ্রি.) ধরে নির্মিত আদিনা মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫০৭.৫ ফুট এবং প্রস্থে ২৮৫.৫ ফুট ছিল। পাথর ও পোড়া মাটির নকশা এ বৃহৎ মসজিদটির শোভাবৃদ্ধি করে। সর্বোপরি এর বিশালতা এবং উচ্চমানের কারুকার্যের জন্য এ মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। এছাড়া পীর আঁখি সিরাজ উদ্দিনের মসজিদ ও সমাধি এবং গৌড়ের কোতোওয়ালা দরওয়াজা তাঁর সময় নির্মিত হয়।

পীর দরবেশদের প্রতি অনুরাগ

পিতার মতই সিকান্দর শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি সুফি-দরবেশদেরকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাদের সম্মানে মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন। জানা যায় যে, তিনি দিনাজপুর জেলার দেবকোটে অবস্থিত মোল্লা আতার দরগাহে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শেখ আলাউল হক তাঁর সমসাময়িক ছিলেন এবং পাণ্ডুয়াতে বসবাস করতেন। তাঁর সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত সুফি শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি বিহারের মনের-এ বসবাস করতেন।

কৃতিত্ব মূল্যায়ন

ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় শাসক সিকান্দর শাহ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি সুশাসক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁর শাসনামলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। তাঁর রাজত্বকালে কোন রাজ্যবিস্তার না হলেও তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্যের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তাঁর সময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি বিদ্বানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ভূমি জরিপ, রাজস্ব নির্ধারণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান সিকান্দর শাহ বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

করণ পরিসমাপ্তি

সিকান্দর শাহের শেষ জীবন সুখের হয়নি। গোলাম হোসেন সলিম উল্লেখ করেন যে, সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম বিমাতার চক্রান্তে বিদ্রোহী হন এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সংঘটিত এ যুদ্ধে সিকান্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের সন্নিহিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১০ খ্রি.)

সিংহাসনোদ্যোগ

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে একান্ত বাধ্য হয়ে পিতা সিকান্দর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে পালিয়ে সোনারগাঁও চলে যান এবং একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এরপর তিনি পিতা সিকান্দর শাহের সুসজ্জিত বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হন। সিকান্দর শাহ আজম শাহকে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে গোয়ালপাড়া নামক স্থানে পিতা পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘটিত যুদ্ধে সিকান্দর শাহ মৃত্যুবরণ করেন। পিতা সিকান্দর শাহকে পরাজিত ও নিহত করে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

সিংহাসনে আরোহণ করে আজম শাহ প্রথমেই ষড়যন্ত্রকারী ১৭ জন বৈমাত্রের ভাইয়ের চক্ষু উৎপাটন করার নির্দেশ দেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক বুকাননের মতে, আজম শাহ তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন ঘটনা মোটেও বিরল ছিল না। এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোর হাতে সকল ধরনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ দমন করে তাঁর রাজ্যকে সকল প্রকারের শত্রু মুক্ত করেন।

রাজ্য বিস্তার

যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজ্য বিস্তারে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি রাজ্য বিস্তারের চেয়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। জানা যায় আজম শাহ আসামের কামরূপের কিছু অংশ রাজ্যভুক্ত করেন। কামরূপ ছাড়াও কামতা ও অহোমরাজ্যে তিনি সমরাভিযান চালনা করেছিলেন বলে জানা যায়, যদিও তিনি সেখানে সফলতা পাননি। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজা জাহানের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে অনেক উপটৌকন প্রেরণ করেন।

চীন সম্রাটের সাথে সম্পর্ক

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং তিনি চীনে বিশেষ দূত প্রেরণ করেন। চীন সম্রাট ইয়াং লু'র সাথে তিনি দূত বিনিময় করেন। বাংলা থেকে ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাটের দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়, প্রত্যন্তরে চীন সম্রাটও ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত চৈনিক দোভাষী মাছুয়ান-এর নেতৃত্বে একটি চীনা প্রতিনিধি দল বাংলায় প্রেরণ করেন। মাছুয়ান তাঁর বর্ণনায় বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা বাংলার ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

পারস্যের কবি হাফিজের সাথে সম্পর্ক

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও কাব্যচর্চা করতেন এবং ফারসি কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনের বর্ণনায় জানা যায় যে, পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রালাপ হত। তিনি তাঁকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। রিয়াজের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একদা আজম শাহ এমন গুরুতর অসুস্থ হন যে তাঁর বাঁচার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য তিনি তাঁর হারেমের প্রিয় তিনজন মহিলা সরবা, গুল ও লালা কে তাঁর মৃত্যুর পর মৃতদেহের গোসলের দায়িত্ব দেন। সৌভাগ্যক্রমে সুলতান সুস্থ হয়ে উঠলে হারেমের অন্য মহিলারা তাদেরকে ঈর্ষা করে গাস্‌সালিন বা শবরজকিনী বলে বিদ্রূপ করত। তারা সুলতানের কাছে অভিযোগ করলে সুলতান তাঁদের প্রশংসা করে কবিতার একটি পংক্তি রচনা করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় পংক্তিটি রচনা করতে না পেরে তিনি কবি হাফিজকে এটি রচনার জন্য অনুরোধ জানান। কবি হাফিজ দ্বিতীয় পংক্তিটি রচনা করে পাঠান। এ পত্রে একটি কবিতায় গিয়াসউদ্দিনের প্রশংসা করে কবি সুলতানকে ভারতবর্ষের তোতাপাখি বলে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ

মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে যে সকল শাসক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ অন্যতম। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শাহ মুহাম্মদ সগীর ইউসুফ জুলেখা কাব্য রচনা করেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাসেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আজম শাহের শাসনামলে পাণ্ডুয়া ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।



গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মুদ্রা

পীর দরবেশদের প্রতি অনুরাগ

ধর্মভীরু সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সুফি-দরবেশ, পীর-আউলিয়ার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমসাময়িক বিখ্যাত সুফিদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আলাউল হক এবং তাঁর পুত্র নূর কুতুব-উল-আলম। বিহারের সুফি মুজাফ্‌ফর শামস বলখীকেও তিনি অনেক শ্রদ্ধা করতেন। আজম শাহ বাংলায় অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, এতিমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি মক্কা ও মদিনায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন এবং দুই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বহু অর্থ প্রেরণ করেন। তাঁর রাজ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিরাজমান ছিল। তিনি হিন্দুদেরকে যোগ্যতানুযায়ী রাজকার্যে নিয়োগদান করতেন।

ন্যায় বিচারক

ন্যায়বান সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁর রাজ্যে প্রজাসাধারণের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করেন। তাঁর ন্যায় বিচারের কাহিনী সর্বজন বিদিত। একবার এক বিধবা নারীর পুত্রকে হত্যার অভিযোগে কাজী সুলতানকে আদালতে তলব করেছিলেন। সুলতান শুধু আদালতে হাজির-ই হননি, কাজীর দেওয়া রায় মেনে নিয়ে উক্ত নারীকে ক্ষতিপূরণও দিয়েছিলেন।

আজম শাহের পরবর্তী উত্তরাধিকারী

দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর সগৌরবে রাজত্ব শেষে ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে আজম শাহ রাজা গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফউদ্দিন হামযা শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র দু'বছর রাজত্ব করেন। রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন তাঁকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়েজিদ শাহ উপাধিধারী এই শাসক সম্ভবত: গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর বায়েজিদের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ সুলতান হন। পরবর্তীতে রাজা গণেশ তাকে অপসারণ করে নিজেই সিংহাসনে বসেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মধ্যকার সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ইলিয়াস শাহী শাসকদের মধ্যে সিকান্দর শাহ সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। তিনি সুকৌশলে ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এক সংঘর্ষে পিতা সিকান্দর শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তিনি ভাইদের প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি কোন খ্যাতি লাভ করতে না পারলেও দেশে শিক্ষা বিস্তার, শিল্প-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ এবং চীন সম্রাট ইয়াং লুর সাথে দূত বিনিময় করেন। রাজ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সুনাম ছিল কিংবদন্তী তুল্য। বলা হয় যে, বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত এত আকর্ষণীয় চরিত্রের লোক সম্ভবত দ্বিতীয় কেউ নেই।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- আদিনা মসজিদ অবস্থিত কোথায়?
ক) পাণ্ডুয়ায় খ) গৌড়ে গ) নবাবগঞ্জে ঘ) মুর্শিদাবাদে
- পিতা সিকান্দর শাহের সাথে পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সংঘর্ষ হয়?
ক) সোনারগাঁও-এ খ) গৌড়ে গ) গোয়ালপাড়ায় ঘ) পাণ্ডুয়ায়
- শাহ মুহাম্মদ সগীরের রচনা?
ক) পদ্মবতী খ) ইউসুফ জোলেখা গ) রসুল বিজয় ঘ) লাইলি-মজনু
- গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ পারস্যের কোন কবির সাথে পত্রালাপ করেন?
ক) ওমর খৈয়াম খ) হাফিজ গ) রশিদউদ্দিন ঘ) জামি

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খিলাফতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন খলিফা হারুন-অর-রশিদ। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের কারণে বিভিন্ন দেশের শাসকগণের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। এমনকি ফ্রান্সের শাসক শার্লমেনের সাথেও তার পত্র যোগাযোগ হয়। তাঁর সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়েছিল বাগদাদ। বাংলার ইতিহাসেও একজন প্রথিতযশা বিদ্যানুরাগী শাসক পার্শ্ববর্তী দেশের শাসকের সাথে পত্র যোগাযোগ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর সময় ও পাণ্ডুয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- সিকান্দর শাহের সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপ কেমন ছিল? ২
- উদ্দীপকের শাসকদের বৈদেশিক সম্পর্কের তুলনামূলক স্বরূপ তুলে ধরুন। ৩
- ইঙ্গিতকৃত বাংলার শাসকের শাসনামলের শিক্ষা-সংস্কৃতির চিত্র অংকন করুন। ৪

পাঠ-৫.৪

রাজা গণেশ ও পরবর্তী শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতানি বাংলায় হিন্দু শাসক রাজা গণেশের উত্থানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- রাজা গণেশের রাজত্বকাল ও মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজা গণেশের পরবর্তী বংশধরদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

	মুখ্য শব্দ	দনুজমর্দন দেব, নূর কতুবুল আলম, সুবর্ণধেনু ও খলিফাতুল্লাহ
--	------------	--



রাজা গণেশ

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে রাজা গণেশের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৮ বছর বাংলায় রাজত্ব করে করেছেন। সুদীর্ঘ ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে বাংলায় মুসলিম শাসন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত থাকার পর হঠাৎ করে হিন্দু রাজত্বের পুনরুত্থান ইতিহাসের এক চমকপ্রদ ঘটনা। বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের শাসনকাল ছিল এ দেশে মুসলিম শাসনের বিরতিকাল।

রাজা গণেশের উত্থান

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁদের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় ছিল। তাঁরা অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। এ সুযোগে তাঁর রাজত্বকালে হিন্দু সামন্ত রাজাগণ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন দিনাজপুরের ভাতুরিয়া পরগণার শক্তিশালী জমিদার রাজা গণেশ। কোন কোন বর্ণনায় তিনি রাজা কানস্ নামে পরিচিত ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের অধীনে রাজা গণেশ রাজস্ব এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের ব্যর্থতায় রাজা গণেশ সমকালীন বাংলার সুলতানি রাজনীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হামযা শাহ সিংহাসনে বসলে রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হয়। প্রভাবশালী রাজা গণেশের ষড়যন্ত্রে হামযা শাহ ক্রীতদাস শিহাব উদ্দিনের হাতে নিহত হন। হামযা শাহের পর শিহাবউদ্দিন বায়েজীদ শাহ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন রাজা গণেশ। এরপর রাজা গণেশ সুযোগ বুঝে ১৪১৪ খ্রি. বায়েজীদকে হত্যা করে বাংলার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এভাবে বাংলার ক্ষমতায় রাজা গণেশের বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়েজীদের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ দক্ষিণ বঙ্গে পলায়ন করেন। অতঃপর রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেব উপাধি ধারণ করে মুদ্রা চালু করেন এবং বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

ইসলামের প্রতি রাজা গণেশের বৈরি আচরণ ও মুসলিম নির্যাতন

রাজা গণেশের ক্ষমতালাভের ফলে বাংলায় হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সূচনা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দিন শুরু হয়। তিনি মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা থেকে ইসলাম ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করা। এজন্য গণেশ প্রখ্যাত মুসলিম সাধক বদর-উল-ইসলামসহ বেশ কয়েকজন দরবেশকে হত্যা করেন। এতে মুসলিম জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। গণেশের এরূপ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুফি সাধক নূর-কতুব-উল-আলম শঙ্কিত হয়ে জৈনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর আমন্ত্রণে ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে পথে ত্রিহত দখল করেন। তিনি বাংলায় প্রবেশ করলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে রাজা গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। এরপর ইব্রাহিম শর্কী জৌনপুরে ফিরে গেলে রাজা গণেশ পুনরায় জালালউদ্দিনের নিকট থেকে তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।

রাজা গণেশের দ্বিতীয় শাসন

প্রথমবার মাত্র কয়েকমাস ক্ষমতায় থাকার পর ইব্রাহিম শরীফ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করে রাজা গণেশ তাঁর পুত্র জালালউদ্দিনকে সুবর্ণধেনু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধি করে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। রাজা গণেশ সর্বমোট চার বছর রাজত্ব করে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪১৮-১৪৩২ খ্রি.)

১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশ পরলোকগমন করলে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র মাহেন্দ্র দেব উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন কিন্তু দু-এক মাসের বেশী তিনি রাজত্ব করতে পেরেন নি। এসময় জালালউদ্দিন (যদু সেন) মাহেন্দ্র দেবকে অপসারণ করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ক্ষমতালাভ করে তিনি পিতা কর্তৃক নিবাসিত দরবেশ নুর-কতুব-উল আলমের দৌহিত্র শেখ জাহিদকে সোনারগাঁও থেকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সময়ে গৌড় একটি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। সেখানে মসজিদ, স্নানাগার, জলাশয়, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মিত হয়। এ সময় ইব্রাহিম শরীফ রাজ্যের কিছু অংশ জালালউদ্দিনের দখলে আসে। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক মেধা ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সময় অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর মুদ্রায় নিজেকে খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলিফা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি চীন, পারস্য, মিশর ও দামেস্কের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ সুলতান হন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ধর্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। আহমদ শাহ তাঁর দুই ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। এভাবে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরের প্রায় ত্রিশ বছরের শাসনের অবসান হয়।



রাজা গণেশ

	শিক্ষার্থীর কাজ	রাজা গণেশের শাসনামলে সুফিদের ভূমিকা চিহ্নিত করুন।
--	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু সামন্তরাজা ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মুসলমানদের উপর নির্যাতন করতেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শরীফ বাংলায় অভিযানের কারণে গণেশ ক্ষমতা ছাড়াতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র যদু সেন জালালউদ্দিন নাম ধারণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সিংহাসনে বসেন। জালালউদ্দিনের পর সুলতান হন তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ। রাজা গণেশ এবং তাঁর বংশধগণ প্রায় ৩০ বছর বাংলা শাসন করেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। রাজা গণেশ বাংলার কোন অঞ্চলের জমিদার ছিলেন?

ক) গৌড়	খ) পাণ্ডুয়া	গ) সোনারগাঁও	ঘ) ভাতুড়িয়া
---------	--------------	--------------	---------------
- ২। রাজা গণেশের নির্যাতন থেকে মুসলমানদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন-

ক) ইব্রাহিম শরীফ	খ) বাবুর	গ) ইব্রাহিম লোদি	ঘ) হুমায়ূন
------------------	----------	------------------	-------------
- ৩। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জালালউদ্দিনের নাম কি ছিল?

ক) হেমন্ত সেন	খ) যদু সেন	গ) বল্লাল সেন	ঘ) মধু সেন
---------------	------------	---------------	------------
- ৪। কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জালালউদ্দিনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল?

ক) রথযাত্রা	খ) চড়ক অনুষ্ঠান	গ) স্নান যাত্রা	ঘ) সুবর্ণধেনু
-------------	------------------	-----------------	---------------



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সোহাগ প্রতিদিনকার মত সকালে পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ তার নজরে আসে X রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক দল Y রাজ্যে বসবাসরত R সম্প্রদায়ের কিছু লোককে তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে ‘ঘর ওয়াপসি’ বা ‘ঘরে ফেরা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কলেজে গিয়ে এ বিষয়ে সোহাগ তার ইতিহাসের শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলে শিক্ষক জানান বাংলায় সুলতানি শাসনামলে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল।

ক. ‘দনুজমর্দন দেব’ কার উপাধি ছিল? ১

খ. ইব্রাহিম শকীর সাথে রাজা গণেশের সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত ঘটনার সাথে বাংলার কোন শাসকের ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? এর অবস্থান নিরূপণ করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ সুলতানি বাংলার শাসকদ্বয়ের কার্যাবলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৫.৫

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রাজবংশ (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ)



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসনের পুনরুত্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের ধারণা পাবেন ও
- পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের কর্মকাণ্ড আলোচনা করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বাংলার আফগানি যুগ, হাবশি, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও মহাভারত



ভূমিকা

বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনামলে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন। এই বংশের শাসনের প্রথম দিকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রমুখ সুলতানগণ যোগ্য শাসক ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনে একটি ছেদ টেনে দেন। কিন্তু ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশের বংশের পতন ঘটলে বাংলায় পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এরপর এ বংশের শাসকগণ ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন।

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯খ্রি.)

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর ইলিয়াস শাহী শাসকদের শাসন দুর্বলতার সুযোগে রাজা গণেশ কর্তৃক স্বল্পকালীন হিন্দু শাসনের সূচনা হয়। গণেশের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে দেশের অরাজক অবস্থা প্রেক্ষিতে গণেশের উত্তরাধিকারীদের হটিয়ে আমিরগণ ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির উদ্দিনকে ‘নাসির উদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ’ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলে আবার ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা হয়। নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান বাংলার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নাসির উদ্দিনের রাজ্য শাসন

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। খান জাহান আলীর সমাধি গাত্রে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর শাসনামলে যশোর ও খুলনার কিছু অংশ ইলিয়াস শাহী শাসনের অধিকৃত হয়েছিল এবং মুসলিম বাংলার সীমানা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এ সময় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটলে তা সুলতানি বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

নাসিরউদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকাল ছিল শান্তিপূর্ণ। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ মহান সুলতান শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতি বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য তাঁর শাসনামলকে ঐতিহাসিকগণ ‘বাংলার অগাস্টান যুগ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে রাজধানী গোড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, ঢাকা, বাগেরহাট প্রভৃতি জনপদে মসজিদ, খানকাহ, সেতু, তোরণ, সমাধি ও প্রাসাদ এর মত নানা স্থাপনা নির্মাণে সহায়তা করেছেন।

চরিত্র চিত্রণ

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ জ্ঞানী, চরিত্রবান, দরদি, প্রজাবাৎসল, উদার ও ধর্মপায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি ধনী, আমির, উমরাহ, দরবেশ, সাধু, সুফি, বৃদ্ধ, যুবক সকলের প্রতি সদয় ছিলেন এবং উদার হস্তে সকলকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মহানুভব ও সুশাসক মাহমুদ শাহ প্রায় ২৪ বছর রাজত্ব করে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

রুকন উদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.)

সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় একজন যোগ্য ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তাঁর সুশাসনে বাংলাদেশের সুখ-শান্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানী ও গুণীরা তাঁর নিকট খুব সমাদর পেতেন। তিনি সে যুগের বিখ্যাত কবি মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্র, কৃত্তিবাস, মনসুর সিরাজী প্রমুখ কবি বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর সভা কবি ছিলেন আমির জয়েনউদ্দিন হাববী। তিনি বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে রুকনউদ্দিন বরবক শাহ কমপক্ষে ৮০০০ আবিসিনীয় ক্রীতদাসকে রাজ্যের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন যা রাজ্যের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামের কামরূপ অভিযানকালে সেখানকার হিন্দু রাজা নীলাম্বরে সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন কিন্তু তিনি সেখানে কাজক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

দ্বিতীয় শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রি.)

বরবক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শামসউদ্দিন আবু মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রি.) বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী, ধর্মভীরু ও আদর্শবান সুলতান ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি রাজ্যব্যাপী মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচনা সমাপ্ত হয় এবং বিজয় পণ্ডিত ‘মহাভারত’ এর বঙ্গানুবাদ করেন। স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ ও পাণ্ডুয়ার চতুষ্কোন মসজিদ নির্মাণ করেন।

জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.)

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অযোগ্যতার জন্য মাত্র তিন মাস পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) কে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি উদার, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর সময়ে হাবশি ক্রীতদাসদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এ প্রভাব খর্ব করতে গিয়ে তিনি বরবক নামক জনৈক হাবশি ক্রীতদাসের হাতে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান হয় এবং বাংলা ছয় বছরের জন্য (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.) হাবশি মালিকদের শাসনে চলে যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের শাসনকাল চিহ্নিত করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
রাজা গণেশ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটি ইলিয়াস শাহী শাসনের ছেদ টেনে প্রায় ২৮ বছর বাংলা শাসন করেন। অতঃপর পরবর্তী ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রি.) আবার বাংলা শাসন করেন। এ বংশের যোগ্যতম শাসক ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ। এ বংশের অপর একজন সুশাসক ছিলেন রুকনউদ্দিন বরবক শাহ। তিনি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। এ সময় বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। হাবশি ক্রীতদাসদের ষড়যন্ত্রে জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের মৃত্যুর পর এ বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলায় ছয় বছরের জন্য (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.) হাবশি মালিকদের শাসনের সূচনা হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-

- ক) নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ) শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ

- খ) রুকনউদ্দিন বরবক শাহ
ঘ) জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ

২। বাংলার অগাস্টান যুগ বলা হয়-

- ক) নাসিরউদ্দিনের শাসনামলকে
গ) গণেশের শাসনামলকে

- খ) বরবক শাহের শাসনামলকে
ঘ) ইউসুফ শাহের শাসনামলকে

৩। ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

- ক) যশোরে

- খ) খুলনায়

- গ) বাগেরহাটে

- ঘ) রামপালে

৪। গুণরাজ খান উপাধি প্রাপ্ত হন-

- ক) বৃহস্পতি মিশ্র

- খ) মালাধর বসু

- গ) কৃতিবাস

- ঘ) মনসুর সিরাজী



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শ্রেণিকক্ষে মাহমুদ ও আল-আমিনের মধ্যে আব্বাসীয় শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল এ সময় মাহমুদ বলে খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামল ‘অগাস্টান যুগ’ হিসেবে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে আল-আমিন বলে খলিফা মামুনের সময় আব্বাসীয়দের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল বলে সে এ শাসককে শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে উল্লেখ করেন। এ সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে তারা থেমে যায়।

ক. ‘মহাভারত’ এর বঙ্গানুবাদ করেন কে?

১

খ. কোন শাসকের সময়কালকে ‘বাংলার অগাস্টান যুগ’ বলা হয়? বর্ণনা দিন।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুগের সাথে সুলতানি বাংলার কোন শাসনামলের সিল রয়েছে এর যথার্থতা নিরূপণ করুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক গৌরবের বিশেষ উল্লেখপূর্বক বাংলার অগাস্টান যুগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৪

পাঠ-৫.৬

বাংলায় হাবশি শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতানি বাংলায় হাবশি শাসকদের উত্থান ও প্রাথমিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হাবশি শাসকদের সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড বিষয়ে ধারণা পাবেন ও
- হাবশি শাসনের পতনের কারণ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

	মূখ্য শব্দ	হাবশি, সুলতান শাহজাদা, উজির, সৈয়দ ও হোসেন
--	------------	--



বাংলার ইতিহাসে খুবই স্বল্প সময়ের শাসন হিসেবে পরিচিতি পেলেও হাবশি শাসন একটি কৌতুহলোদ্দীপক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। মাত্র ছয় বছরের এই সময়কালে চারজন সুলতান বাংলা শাসন করেছেন, যাদের প্রত্যেকেই পূর্বসূরীকে হত্যা করে ক্ষমতায় এসেছেন এবং ষড়যন্ত্রকারী উত্তরসূরীর হাতেই নিহত হয়েছেন। তবে তা সত্ত্বেও এ সময়ে বাংলার সীমানা সংকুচিত হয়নি এবং শাসকরা জনকল্যাণকামী ছিলেন।

হাবশিদের পরিচয়

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতান বা মাহমুদ শাহী সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ অনেক সংখ্যক ইখিওপিয়ান দাসকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন যারা পরবর্তীকালে নিজ যোগ্যতাবলে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক-এর মৃত্যুর পর এ দাসদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ তাঁর মালিককে হত্যা করে প্রথম হাবশি শাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সুলতানগণ প্রাথমিক জীবনে দাস ছিলেন বলে তাঁদের ব্যঙ্গার্থে হাবশি বলে অভিহিত করা হয়। মূলত হাবশি আমল বলতে মাহমুদ শাহী সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের পরে বাংলা শাসনকৃত গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ বা “সুলতান শাহজাদা”, ফিরোজ শাহ, মাহমুদ শাহ এবং মুজাফ্ফর শাহের শাসনকালকে বোঝানো হয়।

গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ বা “সুলতান শাহজাদা” (১৪৮৭ খ্রি.)

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ প্রাথমিক যুগে মাহমুদ শাহী বংশের শাসক সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহের দাস ছিলেন। এ সময় থেকে তিনি দরবারে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে সুলতান ফতেহ শাহকে হত্যা করে গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ উপাধি ধারণ করে ক্ষমতায় বসেন। তিনি হাবশি বংশোদ্ভূতদের নানা রাজপদে নিয়োগ দেন। তিনি তাঁকে ক্ষমতায় আসীন হতে সাহায্যকারী শাহজাদা মালিক আন্দিলকে বন্দি করার জন্য কৌশলে ডেকে পাঠান বারবকের এ ছল বুঝতে পেরে মালিক আদিল বারবককে হত্যার মনোবাঞ্ছা নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। এ সময় হাবশি অভিজাতগণও এই শাসকের সিংহাসনে বসাকে ভাল ভাবে নেয়নি। এমতাবস্থায় অভিজাত শ্রেণি এ ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় এবং পাইকদের একত্রিত করে বারবককে হত্যা করে।

সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রি.)

অভিজাতদের সহায়তায় সুলতান গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহকে হত্যা করে মালিক আদিল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুশলি ও ন্যায়পরায়ণ তিনি উদারতার মাধ্যমে বাংলার সার্বভৌম শাসক হয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে বাংলা শাসন করেন এবং শিল্প-সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিন বছর শাসন করার পর ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে এই শাসকের মৃত্যু হয়।

কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৯০-১৪৯১ খ্রি.)

সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার শাসক হন। কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহের কোন শিলালিপি পাওয়া না যাওয়ায় তাঁর সম্পর্কে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে এ শাসকের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রি.)

কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ বাংলার শাসন ক্ষমতায় বসেন। তিনি স্বর্ণ মুদ্রা চালু করেছিলেন। প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ তাঁর অধীনে ছিল। নৃশংসতা এবং অত্যাচারের কারণে তিনি জনগণের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন না। ফলে গৌড়ের অভিজাতরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এ বিদ্রোহে যুক্ত হন উজির সৈয়দ হোসেন। উজির সৈয়দ হোসেন-এর নেতৃত্বে মুজাফ্ফর শাহকে হত্যা করা হলে বাংলায় হাবশি শাসনের পতন ঘটে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	হাবশিদের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত করুন।
---	-----------------	---------------------------------------

	সারসংক্ষেপ :
সুলতানি শাসনামলে বাংলায় মাত্র ৬ বছরের জন্য হাবশি শাসনের সূত্রপাত হলেও এঁদের ইতিহাস ছিল ষড়যন্ত্র, অরাজকতা ও অবিশ্বাসে পূর্ণ। মাত্র ৬ বছরে ৪ জন শাসকের শাসন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান হোসেন শাহের মাধ্যমে এ বংশের পতন হলে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- হাবশি বংশের শাসকগণ কোন দেশ থেকে বাংলায় এসেছিলেন?
ক. আফগানিস্তান খ. তুর্কিস্তান গ. পারস্য ঘ. ইথিওপিয়া
- হাবশি শাসকগণের মধ্যে কে সার্বভৌম শাসকের মর্যাদালাভ করেছিলেন?
ক. গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ খ. সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ গ. কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ ঘ. শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ
- কার হাতে হাবশি শাসনের পতন ঘটে?
ক. মালিক আন্দিল খ. শাহজাদা গ. উজির সৈয়দ হোসেন ঘ. বরবক শাহ

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

নুর-আলম ও নয়নের মধ্যে ইসলামের সাম্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল। নুর-আলম বলেন, ইসলামের সাম্য নীতির কারণেই সামান্য হাবশি জনগণও শাসক ও অভিজাত-এর মর্যাদা লাভ করেছে। নয়ন আরো সংযুক্ত করে যে, ইসলামের সাম্য নীতির কারণেই মধ্যযুগে মিশরে মামলুকগণ এবং ভারতের দিল্লিতে দাসগণ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

- ক. 'হাবশি' শব্দের অর্থ কি? ১
- খ. গিয়াসউদ্দিন বারবক শাহ কিভাবে সুলতানি বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল তা লিখুন। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাবশিদের মত বাংলায় কোন হাবশি শাসকদের খুঁজে পাওয়া যায় কি-না? উক্ত হাবশিদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ শাসকের শাসনামলের মূল্যায়ন করুন। ৩
- ঘ. উক্ত হাবশি শাসনামলের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৫.৭

হোসেন শাহী রাজবংশ: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজ্য শাসন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ও
- সর্বোপরি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কৃতিত্ব আলোচনা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

হোসেন শাহী বংশ, নৃপতি তিলক, সত্যপীর ও গুনরাজ খাঁ



হোসেন শাহী বংশ

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের যুগে হোসেন শাহী বংশের শাসন ছিল একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মধ্যযুগের সুলতানি শাসন আমলে ইলিয়াস শাহী শাসনের সমাপ্তির পর হোসেনশাহী রাজ বংশের উত্থান বাংলার ইতিহাসের একটি অনন্য অধ্যায়। হাবশি শাসকদের হটিয়ে সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক এ রাজ বংশের শাসনের সূচনা হয়েছিল। এ বংশের ৪ জন শাসক প্রায় ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) বঙ্গদেশ শাসন করেন। তাঁদের শাসনকালে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। হোসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশটি প্রায় ৪৫ বছর বাংলা শাসন করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলাকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল।

হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন আরবের সৈয়দ বংশের লোক। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসেনি এবং ভাই ইউসুফের সাথে তিনি হাবশি সুলতান বরবক শাহের আমলে বাংলায় আসেন এবং চাকুরি গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ পরবর্তী হাবশি সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ (১৪৯০ খ্রি.) এর অধীনে উচ্চ পদে নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ হাবশি সুলতান মুজাফ্ফর শাহ তাঁকে উজির নিযুক্ত করেন। মুজাফ্ফর শাহের সৈর শাসনে দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গৌড়ের অনেক অধিবাসীকে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। দেশের এরূপ পরিস্থিতিতে হোসেন শাহ হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারেই তাঁর বংশের নাম হয় হোসেন শাহী বংশ।

রাজ্য শাসন

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন শুরু করেন। তিনি রাজ্যময় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব প্রথমেই তিনি হাবশি আমির ও সৈন্যদেরকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেন এবং স্থানীয় আমির ও সৈন্যদেরকে নিজ নিজ পদে পূর্ববাহাল করেন। তিনি রাজধানী গৌড় থেকে একডালাতে স্থানান্তরিত করেন। রাজ্যে লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি ও শৃংখলার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের প্রায় ১২ হাজার লুণ্ঠনকারীকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। বাংলার শাসন ক্ষেত্রে তিনি সৈয়দ, আফগান ও মোঙ্গলদের প্রাধান্য দেন। রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে হোসেন শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

দিল্লির সুলতানের সাথে সম্পর্ক

সিংহাসনে আরোহণের পর হোসেন শাহের সাথে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদীর সংঘর্ষ বাধে। জৌনপুরের বিতাড়িত সুলতান হোসেন শাহ শরীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ায় সিকান্দর লোদী হোসেন শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয়। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং সিকান্দর লোদী স্বসৈন্যে দিল্লি ফিরে যান।

রাজ্য বিস্তার

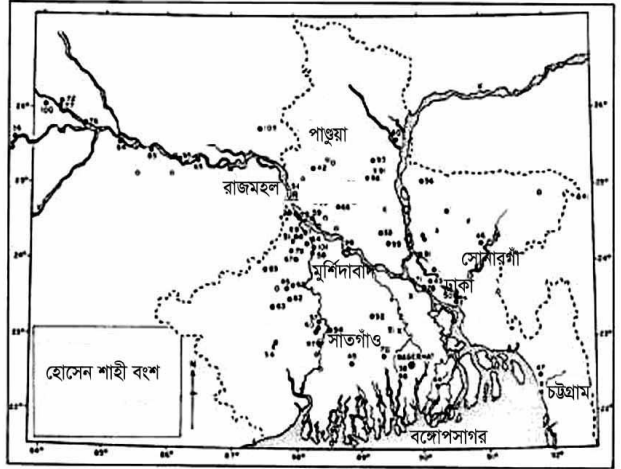
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ স্বাধীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কামতা ও কামরূপ অভিযান করেন। এই স্থানগুলি দখল করে পুত্র দানিয়েলকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি আসামের অহোম রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি ১৫০৯ সালে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করে উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত মান্দারণ দুর্গটি দখল করেন। তিনি পর পর চারটি অভিযান করে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খান আরাকান রাজকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এভাবে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাব্যাপী এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। হোসেন শাহ তাঁর রাজ্য সীমানা শুধু বৃদ্ধি করেননি রাজ্যের সব ধরনের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেন।

সুশাসক

রাজ্য বিস্তারের চেয়ে রাজ্য শাসনে হোসেন শাহের অবদান ছিল সর্বাধিক। হোসেন শাহ ছিলেন একাধারে সুদক্ষ সৈনিক, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সুশাসক। রাজ্যের সকল ক্ষেত্রের অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়ম করেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশে মুসলিম সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। তিনি জনদরদী ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বে বাংলাদেশে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

সুলতান হোসেন শাহ একজন পরধর্ম সহিষ্ণু ও নিষ্ঠাবান শাসক ছিলেন। জ্ঞানতাপস ও সুফি-সাধকদের তিনি ভক্তি করতেন। তিনি পীর দরবেশদের মাজার জিয়ারত করতেন এবং মাজার সংলগ্ন লঙ্গর খানার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক গ্রাম দান করেন। তিনি হিন্দুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ দেন। তাঁর উজির ছিলেন পুরন্দর খান। তাঁর একজন সেনাপতির নাম ছিল গৌরমল্লিক। সাকের মল্লিক উপাধিধারী রূপ এবং দবীর খান উপাধিধারী সনাতন নামের দুই ভাই ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মুকুন্দ দাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। কেশব বসু ছিলেন সুলতানের দেহরক্ষী, সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের শাসনকর্তা। এ ছাড়া টাকশালের অধ্যক্ষ অনুপ গোস্বামী, উজির গোপীনাথ, সেনাপতি গৌর মল্লিক ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিকও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দু প্রজাগণ হোসেন শাহকে ‘নৃপতি তিলক’ ‘জগৎভূষণ’ ‘কৃষ্ণাবতার’ প্রভৃতি উপাধি দিয়েছিলেন। এ সময়ই শ্রী চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় হয় এবং তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের যোগসূত্র হিসেবে তিনি ‘সত্যপীর’ নামে একটি নতুন কৃষ্টি প্রবর্তন করেন।



হোসেন শাহী বংশ

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

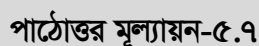
বিদ্যানুরাগী সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধনে তিনি উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হোসেন শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধরবসু ‘ভগবদ গীতা’, কৃত্তিবাস ‘রামায়ন’ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। রামায়ন অনুবাদের জন্য হোসেন শাহ তাঁকে ‘গুনরাজ খাঁ’ উপাধি দেন। তাছাড়া কবি মালাধর বসু, মনসা মঙ্গল এর রচিয়তা বিজয় গুপ্ত, মনসা বিজয়ের লেখক বিশ্বদাস অনেকেই তাঁর সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁর অধীনস্থ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শিল্প স্থাপত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনা মসজিদ, মানিকগঞ্জ জেলার নাচাইল মসজিদ, গোমতি ফটক ছাড়া অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি ও দুর্গ নির্মাণ করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি ‘বাদশাহী সড়ক’ সহ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছর গৌরবময় রাজত্ব শেষে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ ইন্তেকাল করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	হোসেন শাহী শাসনামলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টি তুলে ধরুন।
---	-----------------	---

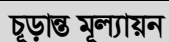
সারসংক্ষেপ :

হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নেতৃত্বে হোসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হোসেন শাহ ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য শাসক। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, রাজ্য বিস্তার ও শিল্প সাহত্যের উৎকর্ষ সাধনে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। একজন পরমত সহিষ্ণু, প্রজাদরদী ও উদার শাসক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।



সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। শেষ হাবশি সুলতানের নাম কী?
- ক) বরবক শাহ খ) শামসউদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ
গ) সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ ঘ) দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ
- ২। হোসেন শাহের রাজত্বকালে দিল্লির কোন সুলতান বাংলায় আক্রমণ করেন?
- ক) ইব্রাহিম লোদি খ) বাবুর গ) হুমায়ুন ঘ) সিকান্দর লোদি
- ৩। হোসেন শাহের উজির ছিলেন—
- ক) গৌরমল্লিক খ) পুরুন্দর খান গ) পরাগল খান ঘ) অনুপ গোস্বামী
- ৪। ছোট সোনা মসজিদের নির্মাতা ছিলেন?
- ক) হোসেন শাহ খ) নূসরত শাহ গ) মাহমুদ শাহ ঘ) ফিরোজ সহ



শিক্ষক মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বের ম্যাধকার একটি উন্নত দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া খুব সুনাম অর্জন করেছে। এর উন্নতির পেছনে মাহাথির বিন মোহাম্মদ নামে একজন রাষ্ট্রনায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলায় এমন উন্নত অবস্থা কখনও ছিল কি-না তা জনতে চেয়ে একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে শিক্ষক বলেন, বাংলার ইতিহাসেও এমন গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলের সন্ধান পাওয়া যায়।

- | | |
|--|---|
| ক. হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? | ১ |
| খ. কাকে এবং কেন হোসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে সুলতানি বাংলার কোন শাসকের কার্যক্রমের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার বর্ণনা দিন। | ৩ |
| ঘ. রাজবংশের শাসন উন্নতিতে উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের মত সুলতানি বাংলার শাসকের শাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন। | ৪ |

পাঠ-৫.৮

পরবর্তী হোসেন শাহী শাসন ও হোসেন শাহী বংশের অবদান



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নাসির উদ্দিন নসরত শাহের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী আলোচনা করতে পারবেন;
- হোসেন শাহী বংশের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- শের শাহের হাতে হোসেন শাহী বংশের শাসনের সমাপ্তির ঘটনাবলী জানতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

নসরত শাহ, মিঠাপুকুর ও বাদশাহী সড়ক



সিংহাসনারোহণ

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরত শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার শাসনামলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থেকে তিনি রাজকার্যের অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নসরত শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করে পিতার রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করেন।

ত্রিহৃত ও বিহার জয়

সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি প্রথম সমরাভিযান করেন ত্রিহুতের বিরুদ্ধে। তিনি ত্রিহুতের রাজাকে বন্দি ও হত্যা করেন। ত্রিহৃত ও হাজিপুরের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত জয় করার জন্য তাঁর অমাত্য আলাউদ্দিন ও মখদুম শাহ আলমকে নিযুক্ত করেন। তিনি হাজিপুরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন। এরপর তিনি উত্তর বিহার ও আজমগড় জেলার দিকে নজর দেন এবং কয়েকটি অভিযানের মাধ্যমে তিনি প্রায় সমগ্র বিহার নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

মুঘল সম্রাট বাবুরের সাথে সম্পর্ক

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি বাবুরের নিকট পরাজিত হন। দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে বিদ্রোহী আফগানগণ নসরত শাহের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিকান্দর লোদির ভাই মাহমুদ লোদিও বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে বাবুরের সাথে নসরত শাহের সংঘর্ষ বাঁধে। প্রথম পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা চলে। কিন্তু সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। সম্রাট বাবুর নসরত শাহকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে পরাজিত করেন। নসরত শাহ বাবুরের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধি করে নসরত শাহ বাংলায় বাবুরের প্রবেশ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় মুঘল বিরোধী সংঘ গড়ে তোলেন।



বড় সোনা মসজিদ

ত্রিপুরা ও অহোমদের সাথে যুদ্ধ

ত্রিপুরার রাজা দেব মানিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করলে নসরত শাহের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয় পিতা হোসেন শাহের সাথে বিরোধের কারণে তিনি বাংলায় সুলতানের সাথে আরাকান ও ত্রিপুরায় রাজার সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। প্রায় একই সময় সুলতান নসরত শাহ অহোমরাজ্যের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু বাংলার সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কামরূপে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দুর্গম পথ ও প্রতিকূল আবহাওয়াই ছিল এর মূল কারণ।

পর্তুগীজদের দমন

নসরত শাহের শাসনামলে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ বণিকরা বাংলাদেশে আগমন করে। তারা বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা করে। কিন্তু নসরত শাহ কঠোর হস্তে তাদের এ প্রচেষ্টা রুখে দেন।

কৃতিত্ব

বাংলার ইতিহাসে নসরত শাহ তাঁর পিতার ন্যায় একজন মহান সুলতান ছিলেন। নসরত শাহ নানা মানবিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ, উদার ও প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভাইদের প্রতি তাঁর সদ্যবহার ও উদারতা এবং পলাতক আফগানদের আশ্রয় দান তাঁর চরিত্রের মানবিক দিককে প্রস্ফুটিত করেছে। জনগণের প্রতিও তিনি সহৃদয় ও সহনশীল ছিলেন। প্রজা সাধারণের পানিকষ্ট দূর করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেন। বাগেরহাটের ‘মিঠা পুকুর’ তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নসরত শাহ সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গৌড়ের বিখ্যাত কদমরসুল মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ছাড়াও তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে কবি শ্রীকর নন্দী প্রথম হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় গ্রন্থ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। প্রজাহিতৈষী এই মহান সুলতান ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক প্রাসাদরক্ষী কর্তৃক নিহত হন।

সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রি.)

নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ক্ষমতায় বসেন। তিনি প্রায় এক বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। অহোম রাজ্যের সাথে বাংলায় চলমান সংঘর্ষ তাঁর সময়েও অব্যাহত থাকে। তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবি শ্রীধর কবিরাজ বিখ্যাত প্রেম উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিহত হন।

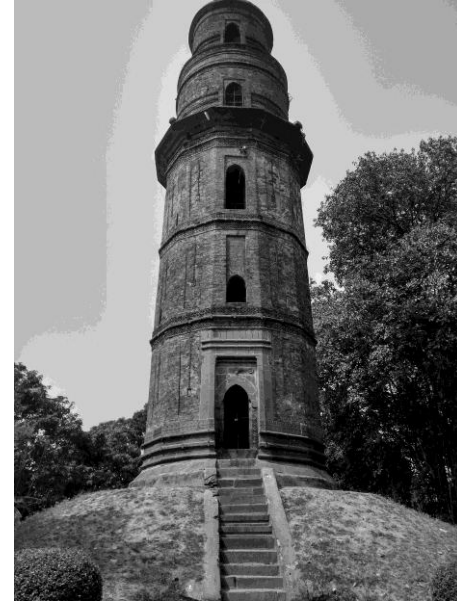
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.)

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান এবং একজন অযোগ্য শাসক। এ সময় শের খান নামক একজন তরুণ আফগান দলপতির আবির্ভাব ঘটলে তিনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শের খান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিহারের শাসনকর্তা জালাল খান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের শরণাপন্ন হন। এর ফলে শের খানের সাথে মাহমুদ শাহের যুদ্ধ বাঁধে। ১৫৩৪

খ্রিস্টাব্দে সুরজগড়ে সংঘটিত যুদ্ধে শেরখান মাহমুদ শাহের বাহিনীকে পরাজিত করেন। অবশেষে শের খান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় সংঘটিত যুদ্ধে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের বাহিনীকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করে নেন। তিনি মাহমুদ শাহকে বঙ্গ দেশ থেকে বিতাড়িত করলে হোসেন শাহী বংশের শাসনের পরসমাপ্তি ঘটে।

হোসেন শাহী বংশের অবদান

রাজনৈতিকভাবে বাংলা শাসনের ও রাজ্যজয়ের কৃতিত্বের সাথে হোসেন শাহী শাসকগণ এ বংশের অবদানকে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা নিজেদের শাসনকে আরো সমৃদ্ধিত করেছেন। হোসেন শাহী শাসকগণ শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান হোসেন শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মালাধরবসু কর্তৃক ভগবদ গীতা, কৃতিবাস কর্তৃক রামায়ণ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। রামায়ণ অনুবাদের জন্য হোসেন শাহ তাঁকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি দেন। তাছাড়া কবি মালাধর বসু, মনসা মঙ্গল এর রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, মনসা বিজয়ের লেখক বিপ্রদাস অনেকেই তাঁর সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁর অধীনস্থ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেন। এছাড়া সুলতান নসরত শাহ সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কবি



ফিরোজ শাহ মিনার



কদম রসুল মসজিদ

শ্রীকর নন্দী হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় গ্রন্থ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের অনুপ্রেরণায় কবি শ্রীধর কবিরাজ বিখ্যাত প্রেম উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শিল্প স্থাপত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনা মসজিদ, মানিকগঞ্জ জেলার নাচাইল মসজিদ, গোমতি ফটক ছাড়া অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি ও দূর্গ নির্মাণ করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি ‘বাদশাহী সড়ক’ সহ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। সুলতান নসরত শাহ গৌড়ের বিখ্যাত কদমরসুল মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ছাড়াও তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ নির্মাণ করেন। বাগেরহাটের ‘মিঠা পুকুর’ তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।



শিক্ষার্থীর কাজ

পরবর্তী হোসেন শাহী শাসকগণ কীভাবে মুঘলদের প্রতিহত করেছিল তা চিহ্নিত করুন?



সারসংক্ষেপ :

বাংলার ইতিহাসে হোসেন শাহী বংশের শাসন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক এ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যজয়, প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুসংহতকরণ, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করায় এ বংশের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের মৃত্যুর পর আর কোন যোগ্য শাসক না থাকায় আফগান নেতা শেরশাহ শুরের হাতে মাহমুদ শাহ পরাজিত হলে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়-

ক) ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে

খ) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে

গ) ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে

ঘ) ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে

২। কদম রসুল মসজিদ কোথায় অবস্থিত ?

ক) গৌড়ে

খ) লখনৌতিতে

গ) সোনারগাঁওয়ে

ঘ) মুর্শিদাবাদে

৩। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনা করেন

ক) শ্রীধর কবিরাজ

খ) মালাধর বসু

গ) বিদ্যাপতি যশোরাজ খাঁ ঘ) বিপ্রদাস



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শ্রেণি শিক্ষক মুসলিম ইতিহাস বিষয়ে পাঠদান করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বিজয়ী মুসলিম বীর গজনির সুলতান মাহমুদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের একজন শাসক হয়েও নিজ যোগ্যতা বলে ভারতবর্ষে সতেরবার অভিযান চালনা করে জয়ী হন এবং গজনিকে সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেন। তবে তাঁর বংশধরগণ খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এ সময় তিনি আরো বলেন যে, মধ্যযুগে বাংলায়ও এমন শাসকের দেখা মেলে যাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ও সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এ বংশের পরবর্তী শাসকগণও গজনি বংশীয়দের মত বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

ক. নসরত শাহের উপাধি কি ছিল?

১

খ. নসরত শাহের সাথে মুঘলদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকদের সাথে বাংলার শাসক বংশের বৈদেশিক সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্ণিত শাসকগণ মধ্যযুগীয় বাংলায় একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি- ব্যাখ্যা করুন।

৪

পাঠ-৫.৯

সুলতানি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতানি বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুলতানি বাংলার সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- সুলতানি বাংলার সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

সত্য পীর, শ্রী-চৈতন্য, আশরাফ, আতরাফ, অগাস্টান যুগ ও বাদশাহী সড়ক



ভূমিকা

বাংলার শাসনাত্মক ইতিহাসে সুলতানি শাসন এক যুগান্তকারী অধ্যায়। স্বাধীন সুলতানদের এই শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.) নানা রাজনৈতিক অবদানের পাশাপাশি এ অঞ্চলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সর্বদা সমানভাবে সম্পন্ন না হলেও ইলিয়াস শাহী, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী, হাবশি ও হোসেন শাহী শাসনামলে শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যেসব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল তার স্বরূপ নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

প্রাক মুসলিম শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। বাংলায় সেন শাসনের সমাপ্তির পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হলে খলজি শাসন যুগে এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয় যা ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতানি শাসনের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে বেগবান হয়েছিল। সুলতানি শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপকতা আসতে থাকে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় জনগণ এখানকার উর্বর ভূমিতে চাষাবাদ শুরু করলে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপকতা আসে। এ সময় বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট, তুলা, ভুট্টা, তিল, তিষি, সরিষা, ডাল, বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, আম, কলা, কাঁঠাল সহ নানা দেশীয় ফলমূল উৎপাদিত হত। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও এ সময়ের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। আধুনিক সময়ের মতো পানি সেচ ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। কৃষককে অধিকাংশ সময়েই সেচের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হতো। তবে এ সময় পারসিক ও দক্ষিণ ভারতীয় সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে খরার সময় সেচ প্রদানের তথ্যও পাওয়া যায়।

স্থানীয় কৃষি উৎপাদনে ব্যাপকতা এলে কৃষি উৎপাদনকে কেন্দ্র করে এ যুগে নানা শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। সমকালীন বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, এ সময় কৃষি পণ্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ, শাসক ও অভিজাতবর্গের চাহিদা পূরণের জন্য বস্ত্র শিল্প, লবণ শিল্প, রেশম শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মুদ্রা শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, তেল শিল্প, অস্ত্র শিল্প, অলংকার শিল্প, কাঠ শিল্প সহ নানা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উদ্ভব ও পুনরুজ্জীবন হয়েছিল। শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও উৎপাদনের ফলে এখানে নানা পণ্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়। এ সব পণ্যের সুনাম ও বাংলার সম্পদের প্রচুর্যতা বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে আরব, পারসিক, চীনা, জাভানি, ডাচ ও পর্তুগিজ সহ নানা বিদেশী বণিকগণ এদেশে আসতে থাকে। ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে এবং বাংলা আরো সম্পদশালী হয়। মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দুধারী তরবারি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি হতো। কলকাতা ও কাশিম বাজারে এদেশের লোকেরা কামান তৈরি করতো। কাগজ, গালিচা, ইম্পাত প্রভৃতি শিল্পের কথাও জানা যায়।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

সুলতানি শাসনামলে বাংলা নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ সময় বাংলায় বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। হিন্দুগণ নানা উচ্চ রাজপদে নিয়োগ পেত, ইলিয়াস শাহের সেনাপতি সহদেব, পরাগল খান, জমিদার কংশ নারায়ণ-এর উচ্চ রাজপদে নিয়োগের দৃষ্টান্ত থেকে যার প্রমাণ মেলে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক থাকায় হিন্দু-মুসলিম উভয়ের নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করত এবং সত্যপীর ও শ্রী চৈতন্যের প্রতি উভয় গোষ্ঠি সম্মানের দৃষ্টি বজায় রাখতেন। এ সময় হিন্দু সমাজের মাঝে নানা সামাজিক বর্ণ প্রথা (প্রধানত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) চালু ছিল। মুসলিমদের মধ্যে কোন বর্ণ প্রথা ছিল না, তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে মুসলিম সমাজে আশরাফ (উচ্চ শ্রেণি) ও আতরাফ (নিম্ন শ্রেণি) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে তা সত্ত্বেও সকল মুসলমানরা একসাথে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান (নামাজ, রোজা, হজ্জ) পালন করতে পারত।

মধ্যযুগে বাংলার নারীদের সামাজিক অবস্থান

এ সময় নারীরা পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। সুলতানি শাসনামলে সমাজে ব্যপকভাবে বাল্য বিবাহ চালু ছিল। এ সময় বিধবাদের নানা সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হত। হিন্দু বিধবাগণ দ্বিতীয় বিয়ে না করতে পারলেও মুসলিম সমাজে তা চালু ছিল। হিন্দু সমাজে অমানবিক সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। সুলতানি যুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা পর্দা পালন করতেন বলে জানা যায়। নারীরা মুখ ও মাথা ঢেকে বাইরে বের হতেন। নানা পারিবারিক সিদ্ধান্তে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও এক্ষেত্রে হিন্দু নারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অধিকার পেতেন না।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

সুলতানি শাসনামলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দর শাহ শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে ইলিয়াস শাহী শাসকদের মধ্যে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহাম্মদ সগীর ইউসুফ জুলেখা কাব্য রচনা করেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচয়িতা কৃতিবাসেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আজম শাহের শাসনামলে পাণ্ডুয়া ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সুফি-দরবেশ, পীর-আউলিয়ার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলাউল হক, নূর কুতুব-উল-আলম ও বিহারের সুফি মুজাফ্ফর শামস বলখীকে তিনি অনেক শ্রদ্ধা করতেন। আজম শাহ বাংলায় অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, এতিমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি মক্কা ও মদিনায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন এবং দুই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বহু অর্থ প্রেরণ করেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর শাসনামলকে ‘বাংলার অগাস্টান যুগ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুলতান নাসিরউদ্দিনের পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্র, কৃতিবাস, মনসুর সিরাজী প্রমুখ কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর সভা কবি ছিলেন আমির জয়েনউদ্দিন হাব্বী। বরবক শাহের পুত্র দ্বিতীয় শামসউদ্দিন আবু মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহ বিদ্বান ও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচনা সমাপ্ত হয় এবং বিজয় পণ্ডিত ‘মহাভারত’ এর বঙ্গানুবাদ করেন। হোসেন শাহী শাসকগণ শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান হোসেন শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মালাধরবসু কর্তৃক ভগবদ গীতা, কৃতিবাস কর্তৃক রামায়ণ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। রামায়ণ অনুবাদের জন্য হোসেন শাহ মালাধরবসুকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি দেন। তাছাড়া কবি মালাধর বসু, মনসা মঙ্গল এর রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, মনসা বিজয়ের লেখক বিপ্রদাস অনেকেই তাঁর সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁর অধীনস্থ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর



দাখিল দরওয়াজা

বাংলা ভাষায় ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেন। এছাড়া সুলতান নসরত শাহ সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কবি শ্রীকর নন্দী প্রথমবারের মত হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় গ্রন্থ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের অনুপ্রেরণায় কবি শ্রীধর কবিরাজ বিখ্যাত প্রেম উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।



কদম রসূল মসজিদের শিলালিপি

সুলতানি শাসনামলে অনেক সুরম্য স্থাপত্য ও স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল। সিকান্দর শাহের শাসনামলে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, দিনাজপুরের মোল্লা আতার মসজিদ, পীর আখি সিরাজ উদ্দিনের মসজিদ ও সমাধি এবং গৌড়ের কোতোওয়ালা দরওয়াজা নির্মিত হয়। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহও রাষ্ট্রীয় খরচে রাজধানী গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, ঢাকা, বাগেরহাট প্রভৃতি জনপদে মসজিদ, খানকাহ, সেতু, তোরণ, সমাধি ও প্রাসাদ এর মত নানা স্থাপনা নির্মাণে সহায়তা করেছেন। সুলতান রুকন উদ্দিন বরবক শাহ স্থাপত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গৌড়ের কদম রসূল মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ ও পাণ্ডুয়ার চতুষ্কোণ মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শিল্প স্থাপত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনা মসজিদ, মানিকগঞ্জ জেলার নাচাইল মসজিদ, গোমতি ফটক ছাড়া অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি ও দুর্গ নির্মাণ করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি ‘বাদশাহী সড়ক’ সহ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। সুলতান নসরত শাহ গৌড়ের বিখ্যাত কদমরসূল মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ছাড়াও বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ নির্মাণ করেন। বাগেরহাটের বিখ্যাত ‘মিঠা পুকুর’ তাঁর জনকল্যাণমূলক কৃপা খননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সুলতানি শাসনামলের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পরিচয় দিন।
--	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
বাংলার সুলতানি শাসনামল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নততর ছিল। এ সময় ইলিয়াস শাহী, গণেশীয়া, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী, হাবশি ও হোসেন শাহী শাসনামলের দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর ধরে শাসকবর্গের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মুসলিম শাসকগণ এ সময় উদার সাম্য ভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করেছিল ফলে দরবারে অমুসলিমগণ উচ্চ রাজপদে নিয়োগ পেত। সমাজে নারীদের সীমিত অধিকার এবং বাল্য বিবাহ ছিল। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- সুলতানি বাংলায় কোন বিদেশী বণিকদের সন্ধান পাওয়া যায়?
ক. আরব ও জাভানি খ. জাপানি ও কোরীয় গ. ইংরেজ ও ফরাসি ঘ. আফ্রিকান ও স্পেনীয়
- কোন শাসনামলকে বাংলার ‘অগাস্টান যুগ’ বলা হয়?
ক. ইলিয়াস শাহ খ. গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ
গ. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ঘ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- ‘গুণরাজ খাঁ’ কার উপাধি ছিল?
ক. শ্রীকর নন্দী খ. পরাগল খাঁ গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. মালাধরবসুকে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

টিভিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছিল সেখানে বিরোধীদলীয় বক্তা বলছিলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে পার্শ্ববর্তী X দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দেশের জনগণ প্রতিদিন সে দেশের টি. ভি চ্যানেল উপভোগ করছে এবং সে দেশের সাংস্কৃতিক উপাদানের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এমনকি দৈনন্দিন জীবনধারণে আমরা তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। জবাবে সরকারি দলের বক্তা বলেন, নানা বৈশ্বিক কারণে এমনটা হলেও একসময় বাংলা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত ছিল।

- ক. বাংলার কোথায় কামান তৈরি হতো? ১
- খ. সুলতানি শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনামলের সাথে বাংলার কোন যুগের শাসনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়- তা প্রমাণসহ তুলে ধরুন। ৩
- ঘ. সুলতানি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন একটি উন্নত সাংস্কৃতিক ধারার যাত্রা সূচনা করেছিল ব্যাখ্যা দিন। ৪



উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১. খ	২. খ	৩. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১. খ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ : ১. ক	২. ক	৩. গ	৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ : ১. ঘ	২. খ	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ : ১. খ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ : ১. খ	২. ক	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯ : ১. গ	২. গ	৩. ঘ	

বাংলার ইতিহাস: আফগান ও মুঘল শাসন (১৫৩৮-১৭০৭ খ্রি.)



ভূমিকা:

হোসেন শাহী বংশের পতনের পর বাংলায় আফগান কররাণীদের শাসন সূচনা হয়েছিল। রাজমহলের যুদ্ধে কররাণী রাজবংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররাণীকে পরাজিত করে ১৫৭৬ খ্রি. বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসনের যাত্রা শুরু হলেও মুঘলদের এ রাজ্য শাসন কেবলমাত্র রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় বাংলার নানা প্রান্তে কতিপয় মুসলিম ও হিন্দু জমিদার স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ সকল স্বাধীন জমিদারগণ ‘বার ভুঁইয়া’ নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলার এ জমিদারগণ মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন যদিও পরবর্তীকালে মুঘলদের হাতেই এঁদের পতন সাধিত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে তাই ‘বার ভুঁইয়া’রা অমর আসনে আসীন হয়ে রয়েছেন।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ- ১ : বাংলায় আফগান শাসন
- পাঠ- ২ : কররাণী বংশ
- পাঠ- ৩ : বার ভুঁইয়া: পরিচয়, কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক
- পাঠ- ৪ : বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন
- পাঠ- ৫ : মুঘল শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৬.১

বাংলায় আফগান শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় আফগানদের শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আলোচ্য পাঠে আফগান ও মুঘলদের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- বাংলায় কররাণী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	শের খান, জান্নাতাবাদ, চৌসার যুদ্ধ ও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
--	------------	---



ভূমিকা

বাংলায় হোসেনশাহী শাসনের শেষদিক থেকেই মুঘল সম্রাট বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলাকে মুঘল অধিকারে আনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আফগানদের কারণে মুঘলদের এ উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সফল হয়নি। সাসারাম-অঞ্চলের জায়গিরদার আফগান নেতা শের খান শূরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। এ সময় বিহারের জায়গিরদার জালাল খান নাবালক বলে তাঁর অভিভাবকের দায়িত্বও শের খান গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতের অধিপতি হওয়ার ইচ্ছা ছিল শের খানের। তাই গোপনে তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ লক্ষ্যে অল্প সময়ের মধ্যে শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করেন। তিনি ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে দু'বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এবার সতর্ক হন দিল্লির মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। তিনি শের খানের পিছু ধাওয়া করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে নেন। গৌড়ের চমৎকার প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। সম্রাট গৌড়ে ৬ মাস আমোদ ফুটিতে গা ভাসিয়ে দেন। এ সুযোগে শের খান নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন। দিল্লি থেকে খবর আসে হুমায়ুনের সৎভাই হিন্দাল সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ুন দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। এ সুযোগ কাজে লাগান শের খান। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে। গঙ্গা নদীর তীরে এ স্থানে হুমায়ুন পৌঁছালে শের খান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রস্তুত হুমায়ুন পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রি.)। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি বিহারে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল করেন। এ বছরই তিনি হুমায়ুনকে কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন পর বাংলা আবার দিল্লির শাসনে চলে আসে। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শের শাহ শূর বংশীয় ছিলেন বলে এ সময়ের বাংলার শাসন শূর আফগান বংশের শাসনকাল হিসেবে পরিচিত।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান 'ইসলাম খান' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আট বছর (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.) রাজত্ব করেন। কিন্তু ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরুজ খানের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শূর বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শের খানের ভাগ্নে মুবারিজ খান ফিরুজ খানকে হত্যা করে 'মুহম্মদ আদিল' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলী হতে এ সময় বাংলা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার আফগান শাসক মুহম্মদ খান সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মুহম্মদ শাহ শূর' উপাধি ধারণ করেন। এ সময় হতে পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ছিল। মুহম্মদ শাহ সূর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ শূরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি জৌনপুর জয় করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মুহম্মদ শাহ সূর নিহত হলে দিল্লির বাদশাহ আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খান তখন এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিছুদিন পর তিনি শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

এ সময় দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা কারণে পরিবর্তন ঘটছিল। শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু দিল্লিতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলায় তিনি মুঘল আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেলেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে শূর বংশীয় আফগান নেতৃবৃন্দকে একে একে দমন করার জন্য অগ্রসর হলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রি.) আদিল শাহের সেনাপতি হিমু মুঘল সৈন্যদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। আদিল শাহ বাংলার দিকে পলায়ন করলেন। পথিমধ্যে তিনি সুরজগড়ের নিকটবর্তী ফতেহপুরে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৭ খ্রি.)।

বাংলা বিজয়ী আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁর গতিরোধ করেন। কটকৌশলী বাহাদুর শাহ খান-ই-জামানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি বাংলার বাহিরে আর কোনো অভিযান প্রেরণ করেননি। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালালউদ্দীন শূর ‘দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন’ উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও তাঁর ভ্রাতার ন্যায় মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি। মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন নামে জনৈক আফগান দলনেতা তাঁকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। কররাণী বংশীয় তাজ খান কররাণী গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলার আফগান ও শের খানের সম্পর্ক একটি চাটে তুলে ধরুন।
---	-----------------	---

সারসংক্ষেপ :

বাংলা সম্পদশালী হওয়ায় সর্বদা এ অঞ্চল বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় হোসেন শাহী শাসনের পতন যুগে বাংলা শক্তিশালী মুঘল ও শের শাহীদের শ্যেণ নজরে পড়ে। মুঘল সম্রাট বাবুর ও আফগান উচ্চাভিলাষী শের খান উভয়ই বাংলা দখলের চেষ্টা করে প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়। এরপর সম্রাট হুমায়ুন বাংলা দখল করে একে জান্নাতাবাদ নামকরণ করেন। অন্যদিকে শের খান সুযোগ বুঝে দিল্লিতে ফেরার পথে হুমায়ুনকে আক্রমণ ও পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। পরবর্তীতে শের শাহের উত্তরাধিকারী নাবালক ফিরোজ খানের শাসনামলে দলাদলি শুরু হলে দিল্লির শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এই সুযোগে বাংলার আফগান কর্তরাণীরা শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। কে বাংলার রাজধানী গোড়ে দুইবার আক্রমণ পরিচালনা করেন?

ক. শের খান

খ. সম্রাট বাবুর

গ. সম্রাট হুমায়ুন

ঘ. সম্রাট আকবর

- ২। বাংলাকে ‘জান্নাতাবাদ’ নামকরণ করেন-

ক. সম্রাট বাবুর

খ. সম্রাট হুমায়ুন

গ. সম্রাট আকবর

ঘ. ঈসা খান

- ৩। আদিল শাহের বিখ্যাত সেনাপতির নাম কি?

ক. বৈরাম খান

খ. রাজা মানসিংহ

গ. মীর জুমলা

ঘ. হিম্ম



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

টিভিতে হিন্দি চ্যানেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ এবং এর চলমান সমস্যাবলী নিয়ে একটি প্রতিবেদন চলছিল তা দেখে রাফি তার বাবাকে প্রশ্ন করে যে, বাবা মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি শক্তিসমূহের এত প্রভাব কেন? কেনই বা বিদেশীরা এখানে সবসময় আস্তানা গড়তে চায়? জবাবে বাবা বলেন, এখানকার সমৃদ্ধি, তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ধর্মীয় অবস্থানের কারণেই এখানে সর্বদা বিদেশিরা আস্তানা গড়তে চায়।

- | | |
|--|---|
| ক. কে বাংলার নাম 'জান্নাতাবাদ' করেন? | ১ |
| খ. বাংলায় বিদেশী শক্তিবর্গ সর্বদা অক্রমণ করেছে কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনাধ্বলের সাথে বাংলার কোন সময়কার শাসনের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। | ৩ |
| ঘ. উক্ত শাসনামলে পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক বাংলায় কররাণী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করুন। | ৪ |

পাঠ-৬.২

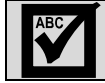
কররাণী বংশ(১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় কররাণীদের শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল ও কররাণীদের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন ও
- বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

কররাণী, সুলায়মান খান কররাণী, দাউদ খান কররাণী ও রাজমহলের যুদ্ধ



কররাণীদের পরিচয়

দিল্লি ও বাংলায় শূর রাজবংশের পতনের সুযোগে পশতুন রক্তধারার আফগান জাতিভুক্ত কররাণী গোত্রের তাজ খান কররাণী কর্তৃক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কররাণী রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়। তাজ খান শেরশাহের অধীনে অমাত্য হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন শুরু করেন (১৫৬২-১৫৬৪ খ্রি.) এবং পরবর্তীতে মুহম্মদ শাহের পরাজয়ের পর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলা দখল করে নেন এবং পরবর্তীতে সোনারগাঁ দখল করে রাজধানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। তাজ খান কররাণী (১৫৬৪-১৫৬৬ খ্রি.) কর্তৃক এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হলে পরবর্তীকালে সুলাইমান খান কররাণী (১৫৬৬-১৫৭২ খ্রি.), বায়েজিদ খান কররাণী (১৫৭২-জুন ১৫৭২ খ্রি.), দাউদ খান কররাণী (জুলাই ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.) কররাণীদের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের আক্রমণে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

তাজ খান কররাণী (১৫৬৪-১৫৬৬ খ্রি.)

তাজ খান কররাণী প্রাথমিককালে শেরশাহের একজন কর্মচারী ছিলেন। কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শেরশাহ তাঁকে বিহারে জায়গীর প্রদান করেন। ইসলাম শাহের শাসনামলে তিনি সেনাপতি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল তাজ খান উজির পদে নিয়োগ পান। ফিরোজ-এর মামা আদিল শাহ শূর ভাগ্নে ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসনে আসীন হলে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান কররাণী পালিয়ে বিহারে আসেন এবং তিনি বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের নিকট নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার বিহারের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলা জয় করে স্বাধীন কররাণী বংশের শাসনের সূচনা করেন। এরপর সুযোগ বুঝে মুহম্মদ শাহী বংশের শেষ সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন শাহকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড় দখল করে বাংলায় কররাণীদের অবস্থানকে সুসংহত করেন। এভাবে তাজ খান কররাণী বাংলায় স্বাধীন কররাণী রাজবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

সুলাইমান খান কররাণী (১৫৬৬-১৫৭২ খ্রি.)

ভ্রাতা তাজ খানের মৃত্যুর পর সুলাইমান খান কররাণী এ বংশের শাসন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এ বংশের সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক ছিলেন। সুলায়মান কররাণী বিজ্ঞ উজির লোদী খানের পরামর্শে মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলছিলেন। এ দক্ষ শাসক কৌশলে আফগান নেতাদের তাঁর দলভুক্ত করেন। এভাবে বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ এলাকা তাঁর অধিভুক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গৌড় থেকে রাজধানী তাণ্ডা বা তাঁড়া শহরে স্থানান্তর করে প্রশাসনিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে নজর দেন। সুলাইমান এ লক্ষ্যে পুত্র বায়েজিদ ও সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে ১৫৬৮ উড়িষ্যার গজপতি শাসক মুকুন্দ দেবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পুরী সহ সমগ্র উড়িষ্যা দখল করে লোদী খানকে উড়িষ্যা ও কুতলু খান লোহানীকে পুরীর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান কররাণীর মৃত্যু হয়।

বায়াজিদ খান কররাণী (১৫৭২-জুন ১৫৭২ খ্রি.)

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান কররাণীর মৃত্যু হলে পুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি মুঘলদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস শাসনের পরেই হানসু নামে তাঁর এক আত্মীয় এ অত্যাচারী সুলতানকে হত্যা করেন।

দাউদ খান কররাণী (জুলাই ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.)

এবার সিংহাসনে বসেন সুলায়মান কররাণীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররাণী। তিনিই ছিলেন বাংলায় শেষ আফগান শাসক। দাউদ কররাণী খুব অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। বিশাল রাজ্য ও ধন ঐশ্বর্য্য দেখে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। এতো দিন বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকগণ প্রকাশ্যে মুঘল সম্রাটের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়া থেকে কৌশলে বিরত থাকতেন। কিন্তু দাউদ স্বাধীন সম্রাটের মতো সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন ও মুদ্রা জারি করেন।

রাজমহলের যুদ্ধ ও কররাণীদের পরাজয়

আফগানরা এমনিতেই ছিল মুঘলদের শত্রু। তার ওপর বাংলা-বিহার মুঘলদের অধিকারে না থাকায় সম্রাট আকবরের স্বস্তি ছিল না। দাউদ কররাণীর আচরণ আকবরকে বাংলা আক্রমণের সুযোগ করে দিল। প্রথমে আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররাণী রাজ্য আক্রমণ করতে। প্রথমদিকে মুনিম খান সরাসরি আক্রমণ করেননি। উজির লোদি খানের পরামর্শে মুনিম খানের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। দাউদ খান উজির লোদির পরামর্শে মুনিম খানের সাথে ধনরত্ন দিয়ে আপোস করেন। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। দাউদ কিছু ষড়যন্ত্রকারীর পরামর্শে উজির লোদিকে ভুল বোঝেন। দাউদের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। লোদির বুদ্ধির কারণেই এতোদিন মুঘল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল বাংলা ও বিহার। মুনিম খানের আর বাঁধা রইল না। লোদির মৃত্যুর পর মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার থেকে আফগানদের হটিয়ে দেন। আফগানরা ইতোমধ্যে নিজেদের ভেতর বিবাদ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কররাণীদের রাজধানী ছিল তাগুয়। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান আক্রমণ করলে বিখ্যাত তুকারাই-এর যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হয়ে তাগু ছেড়ে পিছু হটে। আশ্রয় নেয় হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে। রাজধানী অধিকার করে মুঘল সৈন্যরাও অগ্রসর হয় সপ্তগ্রাম-এ। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান তাগুর পরিবর্তে গৌড়ে মুঘল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় গৌড়ে প্লেগ রোগ দেখা দিলে মুনিম খানসহ অনেক মুঘল সৈন্য এ রোগে মারা যান। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবস্থার সুযোগে দাউদ কররাণী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় অধিকার করে নেন। অন্যদিকে ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল সৈন্যদের হটিয়ে দেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নতুন এক প্রতিরোধ পর্ব।



ঈসা খান

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ আত্মায় পৌঁছালে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান খান-ই-জাহান হোসেন কুলী খানকে। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন রাজা টোডরমল। দাউদ কররাণী কালা পাহাড়, কুতলু খান এবং জুনায়েদ খানের সহযোগিতায় বাংলার প্রবেশপথ রাজমহলে মুঘল সৈন্যদের বাঁধা দেন। মুঘলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন বিহারের শাসনকর্তা মুজাফ্ফর খান তুরবাতি। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ জুলাই রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররাণীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বাংলায় কররাণী আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। অবশ্য 'বার ভুঁইয়াদের' নেতা ঈসা খানের প্রতিরোধের মুখে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা আরো ত্রিশ বছর প্রলম্বিত হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	রাজমহলের যুদ্ধের স্থান চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
বাংলার ইতিহাসে শূর বংশের শাসনের মধ্যে থেকে আফগান কররাণীদের উত্থান একটি অভূতপূর্ব অধ্যায়। কররাণীরা শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৪জন শাসক বাংলার সুলতান হিসেবে পরাক্রমশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে কখনও কৌশলে আবার কখনও অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এরই ধারায় ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি হোসেন কুলীর কাছে শেষ কররাণী সুলতান দাউদ খান কররাণী পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় এ রাজ শাসনের সমাপ্তি ঘটে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। কররাণী বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
ক. তাজ খান কররাণী খ. সুলাইমান খান কররাণী গ. বায়েজিদ খান কররাণী ঘ. দাউদ খান কররাণী
- ২। কোন কররাণী শাসক 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন?
ক. তাজ খান কররাণী খ. সুলাইমান খান কররাণী গ. বায়েজিদ খান কররাণী ঘ. দাউদ খান কররাণী
- ৩। কত খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক. ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বগুড়ার মহাস্থানগড়ে শিক্ষা সফরে গিয়ে সোহাগ লক্ষ্য করে যে, এখানকার ভৌত-অবকাঠামো প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করলে শিক্ষক বলেন, কালের অকাল গ্রাসে অনেক শাসক বংশের কোন চিহ্নও বিদ্যমান নেই। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসেও একটি রাজবংশের শাসনের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের কোন স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

- ক. কররাণীদের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? ১
- খ. কররাণীরা কিভাবে বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ঐঙ্গিতকৃত শাসকবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসকের শাসন কৃতিত্ব নির্ণয় করুন। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকবংশের সাথে মুঘলদের সংঘর্ষের বিবরণ দাও। এতে মুঘলদের জয়ের কারণসমূহ নির্দেশ করুন। ৪

পাঠ-৬.৩

বার ভূইয়া: পরিচয়, কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বার ভূইয়াদের পরিচয় জানতে পারবেন।
- বারভূইয়া নেতা ঈসা খান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বার ভূইয়া ও মুঘলদের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বার ভূইয়া, ঈসা খান, মসনদ-ই-আলা, ইসলাম খান ও বিক্রমাদিত্য



বার ভূইয়াদের পরিচয়

‘বার ভূইয়া’ শব্দটি বাংলার ইতিহাসে খুবই পরিচিত একটি নাম। এর আক্ষরিক অর্থ বারো জন প্রধান বা বারো জন জমিদার হলেও মূলত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল স্বাধীন জমিদারগণই একত্রে ‘বার ভূইয়া’ নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হলে সুলতানগণ কর্মের পুরস্কার এবং ইজারা দায়িত্ব হিসেবে নানা জায়গার লাভ করে। পরবর্তীকালে রাজস্ব আদায়কারী এ সকল ইজারাদার ও কর্মচারীদের বংশধরগণ জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ জমিদারগণ স্বাধীনভাবে জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনাকালে মুঘলদের সাথে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বৈরি সম্পর্ক তৈরি হলেই মূলত এরা ইতিহাসের পাতায় উঁচু স্থান লাভ করে। মধ্যযুগে বাংলায় অবস্থানকৃত বার ভূইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

বার ভূইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ।
চাঁদ রায় ও কদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
বাহাদুর গাজী	ভাওয়াল(ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও ঢাকা)
সোনা গাজী	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)
লক্ষণ মানিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশ বিশেষ

বাংলায় বার ভূইয়াদের কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক

সোনারগাঁয়ের ঈসা খান

বাংলার বার ভূইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন সোনারগাঁয়ের ঈসা খান। তাঁর পিতা কালিদাস গজদানী ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের রাজপুতানা থেকে বাংলায় এসে বাণিজ্য শুরু করেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে সুলাইমান নাম ধারণ করে সোনারগাঁয়ের জমিদারী লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ঈসা খান সোনারগাঁয়ে রাজধানী এবং খিজিরপুর, এগারসিন্ধু ও জঙ্গলবাড়িতে দুর্গ স্থাপন করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। বর্তমান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে তাঁর জমিদারী ছিল। মুঘলদের হাতে দাউদ খান কররাণীর মৃত্যুর পর তিনি বার ভূইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কৌশলে প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হন। রাজমহলের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুঘলরা বাংলার জমিদারদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য আহবান জানান কিন্তু ঈসা খানের নেতৃত্বে বারো ভূইয়া জমিদারগণ এ আহবানে সাড়া দেননি। এমতাবস্থায় ঈসা খানের বিরুদ্ধে সুদক্ষ সেনাপতিগণের নেতৃত্বে

অনেকগুলো অভিযান পরিচালিত হয়। সম্রাট আকবর সেনাপতি খান-ই-আযম ও পরে শাহবাজ খানকে প্রেরণ করেন কিন্তু আশানুরূপ সাফল্যলাভে ব্যর্থ হলে বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা মানসিংহও ঈশা খানকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি শর্তাধীনে সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং এজন্য সম্রাট কর্তৃক ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি লাভ করেন। ঈশা খানের মৃত্যুর (১৫৯৯ খ্রি.) পর তাঁর পুত্র মুসা খান বার ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দিল্লিতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষমতাসীন হলে মুঘল-বার ভূঁইয়া সম্পর্ক আবারো তিক্ত রূপ ধারণ করে। জাহাঙ্গীর ঢাকার সুবাদার ইসলাম খানকে মুসার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মুসা খান পরাজিত হয়ে বন্দি এবং পরে নিহত হন।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য

ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলার আরেকজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তিনি পিতা শ্রী হরির মৃত্যুর পর জমিদারী লাভ করে স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রমের সূচনা করেন। কররাণী শাসক দাউদ খানের মৃত্যুর পর ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি ধারণ করেন এবং যমুনা ও ইছামতি নদীর সঙ্গমস্থল ধর্মাটে রাজধানী স্থাপন করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। মুঘলরা তাঁকে দমনের জন্য অগ্রসর হলে সেনাপতি মানসিংহের সাথে তাঁর কয়েকটি যুদ্ধ হয় এবং সেনাপতি উসমান খানের দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি পরাজিত ও বন্দি হন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহের কাছে পরাজিত ও বন্দি হলে তাঁকে আত্মীয় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে বেনারসে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিক্রমপুরের কদার রায়

বার ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন রাজা কদার রায়। ১৫৮৯ খ্রি. জমিদার চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কদার রায় বিক্রমপুরের ভূঁইয়া জমিদার হিসেবে শাসন শুরু করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জের শ্রীপুর। তিনি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের নিজ নৌ-বাহিনীতে নিয়োগ দিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিক্রমপুরের সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে কদার রায় রাজা মানসিংহের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

চন্দ্রদ্বীপের কর্ন্দপ নারায়ণ ও রামচন্দ্র

চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি কর্ন্দপ নারায়ণ বর্তমান বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার একাংশ নিয়ে জমিদারী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পুত্র রামচন্দ্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা হিসেবে প্রভূত ক্ষমতো ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিক্যকে পরাজিত করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করলেও শেষপর্যন্ত স্বাধীনচেতা এ শাসক মুঘল আক্রমণে পরাজিত হন।

ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য

সুলতানি শাসনের শেষ দিকে বর্তমান নোয়াখালি ও কুমিল্লার কিছু অংশ নিয়ে যে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে শাসনের মূল কর্ণধার ছিলেন রাজা লক্ষণ মাণিক্য। বাকলা, আরাকান ও চট্টগ্রামের সাথে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত থাকায় প্রভাবশালী এ জমিদারির প্রতি মুঘল সম্রাট আকবরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ জন্য সম্রাট আকবর এখানে আক্রমণ পরিচালনা করে এ জমিদারীকে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে এখানে নৌ-বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং এখান থেকে আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসমূহে শান্তি স্থাপন করেন।

ভূষণার মুকুন্দরাম রায়

বর্তমান ফরিদপুর ও খুলনার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ভূষণা জমিদারীর বিখ্যাত ভূঁইয়া ছিলেন মুকুন্দরাম রায়। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা রঘুনাথ এবং রাজা সত্যজিৎ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময় মুঘল আক্রমণের স্রোতধারায় ভূষণার এ জমিদারগণও পরাজিত হতে বাধ্য হন।

ভাওয়ালের ভূঁইয়াগণ

বর্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের জমিদারগণ ভাওয়ালের ভূঁইয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন ফজল গাজী। বর্তমান কালিগঞ্জের চৌরা নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। ভাওয়ালের সকল ভূঁইয়া মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বাহাদুর গাজী। তিনি মুঘল বিদ্রোহী হিসেবে ভূঁইয়া নেতা মুসা খানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু মুঘলদের কাছে মুসা খানের পরাজয় ঘটলে তিনিও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তীতে তিনি মুঘলদের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বংশের আনোয়ার গাজী এবং সোনা গাজী

সরাইলের জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমাগত শক্তিশালী ভূঁইয়াদের পতন ঘটতে থাকলে এরাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অন্যদিকে ফজল গাজীর সমসাময়িক মানিকগঞ্জের স্বাধীন জমিদার চাঁদ গাজীও স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনিও বীরত্বের সাথে মুঘল বিরোধী জোটে অংশ নেন কিন্তু পরবর্তীতে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

নাটোর, বাঁকুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরের ভূঁইয়াগণ

নাটোরের কংস নারায়ণ, বাঁকুড়ার বীর হাম্মীর, রাজশাহীর পীতাম্বর রায় এবং দিনাজপুরের প্রমথ রায় তাঁদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন। এ জমিদারদের সকলেই মুঘল বিরোধী জোটে অংশগ্রহণ করে মুসা খানের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু বীরত্বের সাথে মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও এ ভূঁইয়াগণ পরাজিত হন।

বার ভূঁইয়াদের চূড়ান্ত পতন

সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলায় স্বাধীনভাবে শাসনকৃত ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলে কিছু সাফল্য এলেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খানকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন। ইসলাম খান ঘোড়াঘাট হয়ে প্রবেশ করে স্থানীয় ভূঁইয়াদের নিকট থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কৃতিত্বের সাথে বার ভূঁইয়া নেতা মুসা খান ও তাঁর সহযোগী শক্তিকে পরাজিত ও নির্মূল করতে সক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে রাজা প্রতাপাদিত্য, মীর হাম্মীর, সেলিম খান, রাজা সত্যজিৎ, পীতাম্বর রায় এবং সর্বোপরি এঁদের নেতা মুসা খানকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা উসমানকে পরাজিত করে বোকাইনগর দখল করে নেন। মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে খাজা উসমান পালিয়ে শ্রীহট্টের আফগান ভূঁইয়া বায়েজিদের আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁকে পিছু ধাওয়া করে দৌলাশপুরে সংঘটিত যুদ্ধে খাজা উসমানকে পরাজিত ও হত্যা করলে ভূঁইয়াদের শক্তি নিঃশেষ এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এরপর ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি অভিযান চালিয়ে সকল ভূঁইয়া ও তাঁদের সহযোগীদের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বার ভূঁইয়াদের শাসনাঞ্চল চিহ্নিত করে মানচিত্রে নির্দেশ করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ একটি বিশেষ আলোচিত অধ্যায়। কর্ণাণী রাজবংশের পতনযুগে এঁরা নিজস্ব জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের জয়ী হয়ে মুঘলরা বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে স্থানীয় এ বারো ভূঁইয়াদের নিকট থেকে মুঘলগণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এ প্রতিরোধে ভূঁইয়া নেতা ঈশা খান ও পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে অধিকাংশ ভূঁইয়াগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিন্তু সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেও সুবাদার ইসলাম খানের কাছে ভূঁইয়াগণ পরাজিত হলে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সমগ্র বাংলার উপর মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বার ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?

ক. রাজা অনন্ত মাণিক্য খ. রাজা প্রতাপাদিত্য গ. ঈশা খান ঘ. বাহাদুর গাজী

২. কোন মুঘল সম্রাটের সময় বাংলা চূড়ান্তভাবে মুঘলদের অধীনে আসে?

ক. সম্রাট হুমায়ুন খ. সম্রাট আকবর গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেব

৩. মসনদ-ই-আলা কার উপাধি ছিল?

ক. রাজা মানসিংহ খ. ইসলাম খান গ. ঈশা খান ঘ. মুসা খান



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

আলামিন সাহেব একদিন সপরিবারে সোনারগাঁয়ে বেড়াতে গেলেন। তিনি সেখানে অবস্থিত লোকশিল্প জাদুঘর, ঈসা খানের প্রাসাদসহ নানা স্থাপত্যিক স্থাপনা ঘুরে দেখেন। তাঁদের গাইড ফিরোজ প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখিয়ে সেগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সেসব বর্ণনা শুনে পুত্র মাহমুদ বলেন নিশ্চয় এ এলাকাটি মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাসনাঞ্চল ছিল।

- | | |
|---|---|
| ক. বারো ভূঁইয়াদের নেতার নাম কি? | ১ |
| খ. বারো ভূঁইয়াদের পরিচয় দিন। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে যে শাসকদের শাসনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের শাসন কার্যক্রম তুলে ধরুন। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শাসকদের সাথে মুঘল শাসকদের ধারাবাহিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করুন। | ৪ |

পাঠ-৬.৪

বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল সুবাদারি শাসনের ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মুঘল সুবাদারদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মুঘল সুবাদার ও পর্তুগীজদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও এর ফলাফল জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সুবাদার, ইসলাম খান, শায়েস্তা খান ও মুর্শিদ কুলী খান
--	------------	--



মুঘল সুবাদারি শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)

বাংলায় বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে মুঘলদের সরাসরি শাসনকে সুবাদারি শাসন হিসেবে অভিহিত করা হয়। শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মুঘল প্রদেশগুলো ‘সুবা’ নামে পরিচিত ছিল। সুবা প্রধানকে সুবাদার, সাহিব-ই-সুবাহ, নাজিম, ফৌজদার-ই-সুবা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ।

রাজমহলের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুঘলরা পুরো বাংলার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। এ লক্ষ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার ইসলাম খান চিশতিকে (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দিলে সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বার ভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সুবাদার কাশিম খান চিশতি (১৬১৩-১৬১৭ খ্রি.) বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-১৬২৪ খ্রি.), দারার খান (১৬২৪-১৬২৫ খ্রি.), মহব্বত খান (১৬২৫-১৬২৬ খ্রি.), মুকাররম খান (১৬২৬-১৬২৭ খ্রি.) এবং ফিদাই খান (১৬২৭-১৬২৮ খ্রি.) দায়িত্ব পালন করেন।

সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৬২৮খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার হিসেবে কাসিম খান জুয়িনীকে (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.) নিয়োগ করেন। হুসেন শাহী যুগ হতেই বাংলায় পর্তুগীজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগীজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগীজদের দমন করেন। এরপর সুবাদার আজম খান (১৬৩২-১৬৩৫ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.) চার বছর বাংলা শাসন করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেন। সুজা কুড়ি বছর দায়িত্বে ছিলেন। যুবরাজ শাহ সুজার শাসনকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেককেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন এবং সেখানে সপরিবারে নিহত হন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে জয়ী হতে আওরঙ্গজেব সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলায় শাহ সুজাকে দমন করার জন্য প্রেরণ করলে মীর জুমলা রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আওরঙ্গজেব মীর জুমলাই (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মীর জুমলা অহোমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন। এক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত না হলেও কুচবিহার ও আসাম বিজয় মীর জুমলা সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান (১৬৬৩ খ্রি.) ও পরে দাউদ খান (১৬৬৩-১৬৬৪ খ্রি.) অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রি.) বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেন। দুই দফায় তিনি প্রায় ২৩ বছর বাংলা শাসন করেন এর মাঝে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে কিছুদিনের জন্য দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানী জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্তএলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রি.), ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-১৬৯৮ খ্রি.) ও আজিমুদ্দিন (১৬৯৮-১৭১২ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবল্হ ছিলনা। শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।



সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করতেন। শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের ‘স্বর্ণযুগ’ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্য কার্যের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, পরী বিবির সমাধি-সৌধ, হোসেনি দালান, সুফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের ন্যায় নিজের স্মৃতিকে এতো বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি।

দক্ষ সুবাদার হিসাবে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদ কুলী খান (১৭০০-১৭২৭খ্রি.)। সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁকে বাংলার দিউয়ান হিসেবে নিয়োগ দেন। দিউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফখরুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলী খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলী খান যখন বাংলায় আগমণ করেন তখন বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতির মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলায় মুঘল শাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তিনি বাংলার ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তিত করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে শাসন করেন। মুর্শিদ কুলী খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি নামমাত্র সম্রাটের আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং দিল্লিতে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদ কুলী খানের পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে পড়ে। আর এই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার স্বাধীন নবাবী শাসন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলার মুঘল সুবাদারদের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে মুঘল সুবাদারি শাসন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে এ সুবাদারি শাসন চালু ছিল। এ সময় বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। মুঘলদের সাথে পর্তুগীজদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং কুচবিহার ও আরাকানের সাথে সম্পর্ক এ সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। ঢাকাকে কত সালে বাংলার রাজধানী করা হয়?
ক. ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে
- ২। কোন সুবাদার পর্তুগীজদের দমন করতে সমর্থ হন?
ক. সুবাদার ইসলাম খান খ. সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী গ. সুবাদার শায়েস্তা খান ঘ. সুবাদার মীর জুমলা
- ৩। পরী বিবির সমাধি কোথায় অবস্থিত?
ক. ছোট কাটরায় খ. বড় কাটরায় গ. ঈমাম বাড়ায় ঘ. লালবাগের কেল্লায়

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

রনি ও সোমা টিভি দেখছিল। টিভিতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠান চলছিল। এ সময় লালবাগের কেল্লা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন শুরু হয়। প্রতিবেদক বলেন, এটি মুঘল শাসনামলের একটি স্থাপত্য নিদর্শন। মুঘলরা বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করে। লালবাগের কেল্লাকে দুর্গ কেন্দ্র করে বাংলায় দীর্ঘদিন মুঘল শাসন চালু রেখেছিল।

- ক. মুঘল প্রদেশগুলো কি নামে পরিচিত ছিল? ১
- খ. সুবা বাংলার শাসন বলতে কী বুঝে? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শাসকবর্গ কিভাবে বাংলায় মুঘলদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন তা তুলে ধরুন। ৩
- গ. “মুঘল বাংলা সমৃদ্ধিশালী ছিল”- ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে মন্তব্যটি পর্যালোচনা করুন। ৪

পাঠ-৬.৫

মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মুঘল সুবাদারদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	মসলিন, তাজিয়া, দরগাহ ও টোল
--	------------	-----------------------------



বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। এরই ধারায় সুলতানি শাসনামলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবণ ঘটলে এর অর্থনৈতিক অবস্থাও সমৃদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় বাংলায় আফগান শাসন পেরিয়ে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের পর মুঘল সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নবজোয়ার সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি অস্বাভাবিক উর্বর। মুঘল সুবাদারি শাসনামলে এখানকার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, রেশম গুটি, ইক্ষু, ভুট্টা, পাট, আদা, জোয়ার, সিম, তিল, তিষি, সরিষা ও ডাল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শশা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, মোসাব্বর, খেজুর ইত্যাদি ফলমূলের ফলনও ছিল প্রচুর। পান, সুপারি, নারকেলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গালা বা দ্রাক্ষাও উৎপন্ন হতো প্রচুর। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও এ সময়ের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। আধুনিক সময়ের মতো পানি সেচ ব্যবস্থা সে যুগে ছিলনা। কৃষককে অধিকাংশ সময়েই সেচের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হতো। খরার বিরুদ্ধে তাদের করার কিছুই ছিল না। কৃষি প্রধান দেশ বলে বাংলার অধিবাসীর বৃহত্তর অংশ ছিল কৃষক। বাংলার মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এ ব্যবসায়িক তৎপরতা কালক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

সমকালীন বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, এ সময় কৃষি পণ্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ, শাসক ও অভিজাতবর্গের চাহিদা পূরণের জন্য বস্ত্র শিল্প, লবণ শিল্প, রেশম শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মুদ্রা শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, তেল শিল্প, অস্ত্র শিল্প, অলংকার শিল্প, কাঠ শিল্প সহ নানা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও উৎপাদন হয়েছিল। এ সময় বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নির্মিত বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাই বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা ছিল। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ গজ মসলিন কাপড় একটি কোটায় ভরে রাখা যেত। পাট ও রেশমের সাহায্যে বস্ত্র তৈরিতে বাংলার কারিগররা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মুঘল শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় চিনি ও গুড় তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দুধারী তরবারি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি হতো। কলকাতা ও কাশিম বাজারে এদেশের লোকেরা কামান তৈরি করত। কাগজ, গালিচা, ইম্পাত প্রভৃতি শিল্পের কথাও জানা যায়।

ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমানকালের মতো সুবাদারি শাসনামলেও বাংলার অমুসলিমরা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। এঁদের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, শিব, শিবলিঙ্গ, চণ্ডী, মনসা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, মদন, নারায়ণ, ব্রহ্ম, অগ্নি, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাঙালি হিন্দুর সামাজিক জীবনে দুর্গা পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরা দশহরা, গঙ্গা স্নান, অষ্টমী স্নান এবং মাঘী সপ্তমী স্নানকে পবিত্র বলে মনে করত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট গঙ্গার জল ছিল অত্যন্ত পবিত্র। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করত। জাতিগত শ্রেণিভেদ ছাড়াও হিন্দু সমাজে কতকগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন শৈব, শাক্ত ইত্যাদি। হিন্দু জাতির মধ্যে এ সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সময়ে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অভাব ছিল। এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষ অতি পরিচিত ঘটনা ছিল।

মুসলমানরাও বর্তমান সময়ের মতো বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান পালন করত। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলমান সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখা এবং শব-ই-বরাতে দিন এবাদত বন্দেগীতে রাত্রীযাপন করত। উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ তাদের সাধ্যমত নতুন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাকে সজ্জিত হতো; একে অন্যের গৃহে গিয়ে কুশল ও দাওয়াত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সৌহার্দ্যও ভ্রাতৃত্বভাবে সুদৃঢ় করত। সুবেদারগণ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে জনগণের সান্নিধ্যে আসতেন। বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে মুসলমানগণ মুহাম্মদ (স.) এর জন্মদিন পালন করতেন। বর্তমান সময়ের ন্যায় সুবাদারি শাসনামলেও মহররম উৎসব পালিত হতো। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে এটি পরিচিত ছিল। এ দিবসে শিয়ারা ‘তাজিয়া’ তৈরি ও মহররমের মিছিল আয়োজন করত। মুসলমানদের বর্ষপঞ্জী অনুসারে মহররমের প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয়। মহররমের চন্দ্র উদয়কে মুসলমানগণ আনন্দ ও উৎসবের সঙ্গে বরণ করত।

এ যুগে ধর্মপ্রীতি মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। এছাড়া, তারা নিয়মিত কোরআন ও হাদিস পাঠ করতেন। সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। ছেলে মেয়ে উভয়কেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মজুরে প্রেরণ করা হতো। সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য মোল্লা সম্প্রদায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। বিভিন্ন ব্যাপারে এবং অনেক সমস্যা সমাধানে মোল্লাগণ কোরান-হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে উপদেশ প্রদান করতেন। গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় উৎসবাদিতে এবং বিয়ে-শাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে মোল্লা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রে সু-পণ্ডিত ছিলেন এবং সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ধর্ম সাধনার জন্য ‘দরগাহ’ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসকবর্গ ও জনগণ সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাংলায় ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমান সমাজও বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলায় মুসলমান সমাজে দুটি পৃথক শ্রেণি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি বিদেশ হতে আগত মুসলমান, অন্যটি স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। বিদেশী ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টি ও রীতি-নীতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। মুসলমান শাসকদের উদারতা এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের উদার পৃষ্ঠপোষকতাই এর কারণ।

ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা

মুঘল যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মুঘল শাসকগণ সুলতানি যুগের শাসকদের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকোনো সহযোগিতা করেন নি। বাংলার জমিদারগণ স্থায়ী প্রচেষ্টায় সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মুসলমান যুগে প্রতিবেশি আরাকানের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। আরাকান রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দৌলত কাজী। আলাওল ছিলেন রাজসভার আর একজন কবি। তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘পদ্মাবতী’ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকটি ফারসি কাব্য গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া, ‘রাগমালা’ নামে একটি সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। বাহরাম খান রচনা করেন ‘লাইলি-মজনু’ কাব্য গ্রন্থ। ‘জঙ্গনামা’ ও ‘হিতজ্ঞান বাণী’ গ্রন্থগুলো কবি কাজী হায়াৎ মাহমুদ রচিত। কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পুঁথি সাহিত্যিক। বাংলার মুসলমান শাসন কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার

ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বাংলায় মুসলমান শাসনকালে শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শেখদের খানকাহ ও উলেমাদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমান শাসনের সময় বাংলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সকল মসজিদের সঙ্গেই মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বালক-বালিকারা একত্রে মক্তব ও পাঠশালায় লেখাপড়া করত। প্রাথমিক শিক্ষা সকল মুসলমান বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তবে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণও মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। ফলে সাধারণ মুসলমান মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত ছিল। শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফারসি। ফলে এ ভাষা প্রায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। নবাব ও মুসলমান অভিজাতবর্গ ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সরকারি চাকরি লাভের আশায় অনেক হিন্দু ফারসি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুসলমান শিক্ষকগণ ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ যুগে বাংলা ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানেরা যেন ইসলামের ধ্যান-ধারণা বুঝতে পারে সেজন্য অনেকেই বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁদের রচনাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

মুসলমান শাসনের পূর্বে বাংলার হিন্দু সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মুসলমানদের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরুর আবাসস্থল কিংবা বিত্তবানদের গৃহে পাঠশালা বসত। কখনও কখনও একই ঘরের চালার নিচে মক্তব ও পাঠশালা বসত। সকালে মুন্সি মক্তবের শিক্ষার্থীদের এবং বিকালে গুরু তার ছাত্রদের পাঠশালায় শিক্ষাদান করতেন। বিত্তবান লোকেরা পাঠশালার ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। হিন্দু বালক-বালিকারা একত্রে পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করত। ৬ বছর পর্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ‘টোল’ ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার জন্য নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। অনেক মহিলা এ যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণি সর্বদা নিজেদের জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ যুগে সমাজে জনগণের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধির বিকাশের জন্য কতগুলো সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যেমন- ধর্মীয় সঙ্গীত, জনপ্রিয় লোক-কাহিনী ও নাটক-গাঁথা।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মুঘল শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলা কেন্দ্রের অধীনে থাকলেও এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন গতিলাভ হয়েছিল। এ সময় নানা অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদন যেমন হয়েছিল তেমনি স্থানীয় পণ্যের উৎকর্ষতার সুযোগে এর অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাহির্জ্যও প্রসারিত হয়েছিল। একই সাথে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এর শিল্প বিকশিত হয়েছিল। এছাড়া জনজীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এ সময় সকল ধর্মালম্বী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারতেন। ফলে বাঙালি সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় ছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কোনটি?

ক. বাণিজ্য

খ. কৃষি

গ. শিল্প

ঘ. প্রকৃতিক সম্পদ

২। বাংলার উৎপাদিত কোন দ্রব্যের বিদেশে খুব চাহিদা ছিল?

ক. খাদ্যদ্রব্য

খ. শৌখিন দ্রব্য

গ. বস্ত্র

ঘ. আফিম

৩। বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র কোথায় তৈরি হত?

ক. ত্রিপুরা

খ. যশোর

গ. চট্টগ্রাম

ঘ. ঢাকা

৪। কোন শাসকরা বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসারে অবদান রাখেন?

ক. মুঘলরা

খ. হোসেনশাহীরা

গ. পাঠানরা

ঘ. বার ভুঁইয়ারা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

স্বাধীনতাভোর বাংলাদেশে নিজস্ব সাংস্কৃতিক জাগরণের জন্য নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় যা অদ্যাবধি চলমান। এ আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য নয় এটি মূলত বাংলার আর্থ-সামাজিক মুক্তির একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনকারীরা দাবী করেন বাংলা ইংরেজদের আবির্ভাবের পূর্বে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত ছিল এবং ঐ সময় বাংলায় নানা সাহিত্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।

ক. বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রের নাম কি?

১

ক. মুঘল সুবাদারি শাসনে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল কেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সময়কালে বাংলার ধর্মীয় পরিবেশের উল্লেখপূর্বক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুঘল সুবাদারি শাসনামলের বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৪



উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১. ক ২. ঘ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১. গ ২. গ ৩. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১. খ ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক

বাংলার ইতিহাস: নবাবি আমল (১৭০৭-১৭৫৭ খ্রি:)

ইউনিট
৭

ভূমিকা:

বাংলার ইতিহাসের পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নবাবি আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। মুর্শিদকুলি খানের শাসন কাঠামোয় আবির্ভাব থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে বদল এসেছিল তারই ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবে ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখল করেছিল বাংলায়। অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান মুর্শিদকুলি খান প্রথমে সাধারণ একজন দিওয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। নানা স্থানে দিওয়ানীর কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করার পর তাঁকে “করতলব খান” উপাধিও প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। বলতে গেলে তার মাধ্যমেই বাংলায় নবাবি শাসনের উত্থান হয়েছিল। তারপর পরবর্তীকালের শাসকদের অদূরদর্শীতা, অদক্ষতা ও বিশৃঙ্খল আচরণ শেষ পর্যন্ত নবাবি শাসনের পতন ডেকে আনে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ:

- পাঠ- ১ : মুর্শিদ কুলি খান: নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা
- পাঠ- ২ : মুর্শিদ কুলি খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৩ : সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব
- পাঠ- ৪ : আলিবর্দী খান
- পাঠ- ৫ : নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- পাঠ- ৬ : পলাশীর যুদ্ধ: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
- পাঠ- ৭ : নবাবি শাসনের পতন
- পাঠ- ৮ : নবাবি বাংলার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৭.১

মুর্শিদ কুলি খান: নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুর্শিদ কুলি খানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তিনি কিভাবে শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- তার সময়ে প্রশাসনিক সংস্কার কতটা জরুরী হয়েছিল তা বুঝতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

মুর্শিদকুলি খান, করতলব খান ও মুর্শিদাবাদ



ভূমিকা: মুর্শিদকুলি খান দক্ষিণ ভারতের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি। হাজী শফী ইম্পাহানী ছিলেন দক্ষিণাভ্যে শায়েস্তা খানের দিওয়ান। তিনি অল্প বয়সী মুর্শিদ কুলিকে কিনে নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রথমে তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ হাদী। ১৬৯৬ সালের দিকে হাজী শফীর মৃত্যু হলে তিনি বেরার প্রদেশে চলে যান। সেখানে দেওয়ান হাজি আব্দুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন।

অবস্থার পরিবর্তন

রাজস্ব আদায়ের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্মদক্ষতার গুণে আপুত আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে “করতলব খান” উপাধি প্রদান করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি মুকসুদাবাদের ফৌজদারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর উপরেই।

পটভূমি

সম্রাট আকবরের সময় থেকে প্রত্যেক সুবায় সুবাদার ও দিওয়ান নামে দুটি পদে স্বতন্ত্র কর্মচারি নিয়োগ শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দক্ষ কূটনৈতিক হিসেবে একটু ভিন্ন চিন্তা করেছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি এই দুটি পদ অক্ষুণ্ণ রাখলেও পদ দুটির কর্মকাণ্ড সীমিত করে দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কারো এককভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ কমে এসেছিল। এই দুই পদে অধিষ্ঠিত দুজন কর্মকর্তার ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০০ সালে মুহাম্মদ হাদিকে সম্মানসূচক 'করতলব খান' উপাধি দিয়ে দিওয়ান হিসেবে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে নিজস্ব সৈন্যের বহর নিয়ে ঢাকায় আসেন তিনি। রাজস্ব ও অর্থনৈতিক প্রশাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সম্রাটের আস্থা অর্জনে সময় লাগেনি তাঁর। তিনি ছিলেন সৎ এবং সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু রাজকীয় স্বার্থ রক্ষা করতে বাংলার নাজিম ও সম্রাটের দৌহিত্র আজিম-উস-শান এর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধেছিল। ফলে এক পর্যায়ে করতলব খানের জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল। এরই সূত্র ধরে সম্রাটের হস্তক্ষেপে করতলব খানের প্রতি সুবিচার করা হয়। ১৭০২ সালে সম্রাট তাঁকে গঙ্গার তীরবর্তী (ভাগীরথী শাখা) মুকসুদাবাদে দফতর স্থানান্তরের অনুমতি দেয়া হয়।



নবাব মুর্শিদ কুলি খান

উপাধি লাভ

করতলব খানের সঙ্গে বিরোধের কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব আজিম উস শানকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নায়েবের মাধ্যমে প্রদেশ শাসনের আদেশ দিয়েছিলেন। করতলব খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় তখন। এরপর ১৭০৩ সালে তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দক্ষিণাভ্যে গিয়েছিলেন। নবাবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর

তিনি ‘মুর্শিদকুলী খান’ উপাধি লাভ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানিও লাভ করেছিলেন তিনি। এদিকে প্রায় ৫টি জেলার ফৌজদার পদের দায়িত্বও অর্পিত হয় তার উপর। এরপর সম্রাট তাকে “মুর্শিদ কুলি খান” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারে মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে ‘মুর্শিদাবাদ’ রাখার অনুমতি মেলে। ১৭০৪ সালের দিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি রাজকীয় টাকশাল। প্রায় ১৩ বছর পর ১৭১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে বাংলার পূর্ণ সুবাদারের মর্যাদা দেয়া হয়।

শাসন ক্ষমতা লাভ

১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। এরপর পুরো মুঘল সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। এ সময় থেকে অনুপস্থিত নাজিমের পক্ষে তিনিই বাংলার নায়েব এ নাজিম হিসেবে শাসন করতে থাকেন। এরপর বাহাদুর শাহের সময় মুর্শিদ কুলি খানকে দাক্ষিণাত্যে বদলি করা হয়। তবে বাংলার নতুন করে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাকে মাত্র দুই বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ১৭১০ সালে বাংলায় ফিরে আসার পর তিনি নতুনভাবে শক্তিমত্তা প্রদর্শন শুরু করেন। এখানকার শাসক হিসেবে তিনি নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন। একটা পর্যায়ে পুরো সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তার সমাধান করেছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তাঁর এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত ১৭১৬ সালের দিকে তার বাংলার নাজিম পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি অসংখ্য উপাধি ও পদবিতে ভূষিত হন। প্রথমে তাঁকে ‘জাফর খান’ উপাধি দেয়া হয়েছিল পরে তাঁকে ‘মুতামিন-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জঙ্গ বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি তাঁকে সাত হাজারি মনসব প্রদান করা হয়েছিল। ১৭১৭ সালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট দ্রুত সময়ের মধ্যে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানিও লাভ করেছিলেন তিনি। এদিকে প্রায় ৫টি জেলার ফৌজদার পদের দায়িত্বও অর্পিত হয় তার উপর। এরপর সম্রাট তাকে মুর্শিদ কুলি খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারে মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন। ১৭০৪ সালের দিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি রাজকীয় টাকশাল। এর প্রায় ১৩ বছর পর ১৭১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে বাংলার পূর্ণ সুবাদারের মর্যাদা দেয়া হয়। তিনি মুর্শিদাবাদকে বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। ১৭২৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের মৃত্যু অবধি এই পদে বহাল ছিলেন তিনি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মুর্শিদ কুলি খানের শাসন ক্ষমতা লাভের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ:
নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতায় দক্ষিণ ভারতের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। কর্মদক্ষতার গুণে আপুত আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে “করতলব খান” উপাধি প্রদান করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব তাকে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

- কোন মুঘল সম্রাট মুর্শিদ কুলি খানকে ‘মুর্শিদ কুলি’ উপাধি দেন।
ক) সম্রাট শাহজাহান খ) সম্রাট আওরঙ্গজেব গ) সম্রাট ফররুখশিয়ার ঘ) সম্রাট শাহ আলম
- ‘করতলব খান’ উপাধি ছিল—
ক) মুর্শিদকুলি খানের খ) সরফরাজ খানের গ) শূজাউদ্দিন খানের ঘ) আলীবর্দী খানের

৩. মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা গ্রহণের সময় আয়ের একমাত্র উৎস ছিল—
 ক) ভূমি রাজস্ব খ) বাণিজ্য শুল্ক গ) কৃষি কর ঘ) আবগারী শুল্ক
৪. মুর্শিদ কুলি প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম ছিল
 ক) ‘মাল জামিনি’ খ) নানকর গ) পথ কর ঘ) ভূমিকর



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জামান তার মামার কাছে শুনেছে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের বংশধর। এটা ভুল না সঠিক সে ঠিকমত মনে করতে পারছে না। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে মুর্শিদকুলি খান কিভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এজন্য সে লাইব্রেরিতে গিয়ে নবাবি বাংলার ইতিহাসের উপর একটি বই উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন—

- | | |
|---|---|
| ১. মুর্শিদ কুলি খান কে ছিলেন? | ১ |
| ২. কর্মময় জীবনে কি কি পদক্ষেপ মুর্শিদ কুলি খানকে অমর করেছে? | ২ |
| ৩. উদ্দীপকের মুর্শিদ কুলি খান কিভাবে তার ক্ষমতা সংহত করেন। | ৩ |
| ৪. মুর্শিদ কুলি খান যে উপাধি প্রাপ্ত হন তার সক্ষমতা কতটুকু ছিল-ব্যাখ্য করণ? | ৪ |

পাঠ-৭.২

মুর্শিদ কুলি খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুর্শিদ কুলি খানের কর্মময় জীবনের নানা দিক জানতে পারবেন;
- নবাবি আমলের রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে জানবেন ও
- মুর্শিদ কুলি খানের রাজস্ব সংস্কারের প্রভাব কি ছিল তা আলোচনা করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

বাণিজ্য শুল্ক, খাজনা ও ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি



মুর্শিদ কুলি খান যখন বাংলার শাসক হয়ে আসেন তখন এখানকার রাজস্ব ব্যবস্থা সঠিক ছিলনা। শের শাহের মত তিনিও বাংলার প্রায় পুরো জমি পরিমাপের চেষ্টা করেন। এরপর কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর হিসেবে নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোর আয় হিসেব করেছিলেন। তখন ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারের তেমন আয় হত না। রাজকোষের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য শুল্ক। এর বাইরে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে নিয়মিত ভূমি জরিপও প্রচলিত হয়নি তখন। জমিদাররা সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়েই নিজের দায় শেষ করতেন।

অনেক ক্ষেত্রে তারা সুযোগ বুঝে প্রজাদের নিকট থেকে নিজেদের নির্ধারিত হারের বেশি খাজনা আদায় করতেন। এক্ষেত্রে প্রজারা নানা দিক থেকে নির্যাতিত হতেন। এদিকে তারা জনগণের থেকে অতিরিক্ত আয় করলেও তার থেকে বিন্দুমাত্র গিয়ে রাজকোষে জমা হওয়ার সুযোগ ছিল না। নতুনভাবে ক্ষমতা দখলের পর মুর্শিদ কুলি খান এই পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করেন। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য মুর্শিদকুলি খান প্রথমে নানাবিধ সংস্কার নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি মুঘল কর্মচারীদের প্রায় প্রতিটি জায়গীরকে খাসজমিতে পরিণত করা এবং এর পরিবর্তে কর্মচারীদেরকে উড়িষ্যার অনুল্লত অঞ্চলে জায়গীর বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারদের থেকে ইজারাদারদের উপর বর্তায়। তারা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতেন। এই সংস্কার প্রস্তাবের উপযুক্ত বাস্তবায়ন করতে পারায় নানা দিক থেকে বাংলা সরকারের আয় বেড়ে গিয়েছিল। মুর্শিদ কুলি খানের সংস্কারের আগে বাংলার জমিদারগণ বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে সম্রাটকে রাজস্ব দিতেন। এতে বেশিরভাগ জমিদার অলস হয়ে পড়েন, রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। শকার হন। জমিদারগণ সময়মত নির্দিষ্ট পরিমাণের রাজস্ব প্রদান করতে পারছিলেন না। ফলে মুর্শিদকুলি খান অনেকটা বাধ্য হয়ে জমিদারদের বদলে ইজারাদারদেরকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থা ‘মাল জামিনি’ নামে পরিচিত ছিল। মুর্শিদকুলি খান বেছে বেছে এমন লোকদের এই ইজারাদার পদে নিয়োগ করেছিলেন যাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় তার পক্ষে সহজ ছিল। অন্যদিকে রাজস্ব কর্তৃত্বের প্রতি অধিকতর অনুগত একটি শ্রেণিকে এক্ষেত্রে দায়িত্ব দিতে দেখা যায়।

রাজস্ব সংস্কারের ফলে মুর্শিদ কুলি খান নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ দাবী করা থেকে ইজারাদারদের প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। এতে মুঘল কর্মচারিগণ কোনরূপ অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারত না। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেও গৃহীত নিয়ম বাস্তবায়নে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এদিকে ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হলে বা কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে মুর্শিদ কুলি খান তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন। ব্যর্থ হওয়া ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থাও নিয়েছেন। এর আগে জমিদারদের থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হত তা এক অর্থে নিশ্চিত ছিল না। সংস্কারের পর প্রচলিত এ নতুন নিয়ম সরকারি আয় সুনিশ্চিত করেছিল। মুর্শিদকুলি খান বাংলার সকল আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তি বিশেষে হিসেব না করে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে রাজস্ব ধার্য করেন। এক একটি জমির বিবরণের লিপিবদ্ধকরণের পাশাপাশি কৃষকদের নাম ঠিকানাও লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তখন। পাশাপাশি কৃষকরা কি পরিমাণ কর দিয়েছে সেটাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন। রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে তিনি পুরো বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত

করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি চাকলার দায়িত্বে ছিলেন একজন পেশাদার ব্যক্তি তিনি আমীন নামে পরিচিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলি খানের রাজস্ব সংস্কার অনেক জমিদারকে বিপদে ফেলে। তাদের জমিদারি উচ্ছেদের পর তারা যাতে বিপদে না পড়ে সেজন্য সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি নানা স্থান থেকে উচ্ছেদকৃত জমিদারদের ভরণ পোষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে তখন “নানকর” প্রচলন করা হয়। এর পাশাপাশি জমিদারদের মধ্যে যারা রাজস্ব ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের চুক্তি গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন তাঁদেরকে ইজারাদার পদে নিয়োগ করা হয়। ফলে নিজের ভূমির উপর থেকে অধিকার হারানো জমিদারগণ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধির নানা উপায় বের করার পাশাপাশি মুর্শিদকুলি খান ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বেশ কমিয়ে এনেছিলেন। এর বাইরে শাসন বিভাগের বহুবিধ ব্যয় সংকোচ করে তিনি রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। অন্তত রাজস্ব সংস্কারের পাশাপাশি তার এই ব্যয় সংকোচন নীতিই নবাবি বাংলার কোষাগার সমৃদ্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মুর্শিদ কুলি খান ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলার বাণিজ্য সমৃদ্ধির পাশাপাশি রাজকোষাগার ফুলে ফেঁপে ওঠার কৃতিত্ব অনেকটাই তাঁর উপরে বর্তায়। তিনি আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় ও স্থানীয় বণিকদের প্রায় প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। পাশাপাশি বণিকদের নির্বিল্ল ও অবাধ পণ্য চলাচল নিশ্চিত করতে তার পদক্ষেপ ছিল প্রশংসার দাবিদার। অন্তত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে বণিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় তিনি পছন্দ করতেন না। তবে তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ইংলিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে প্রচলিত স্বল্প হারে শুল্ক আদায়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা একটা পর্যায়ে সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। মুর্শিদ কুলি খানের নানাবিধ সংস্কারে যেমন জনজীবনে স্বস্তি মিলেছিল, তেমনি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির নানামুখী প্রচেষ্টার ফলে (১) রাজস্ব খাত থেকে প্রাপ্ত আয় সুনির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়। (২) সরকারের আয় পূর্বের তুলনায় বেশ বেড়ে যায়। (৩) রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীদের দাপট ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বাংলার কৃষকগণ। (৪) বাণিজ্য শুল্ক নির্দিষ্ট হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। (৫) রাজস্ব আয় বেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে সরকার কৃষি ঋণ দিতে শুরু করে।



নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সমাধি

বিশেষত, তাঁর রাজস্ব সংস্কার দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক অগ্রগতি নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তাঁর “মাল জামিনি” রাজস্ব ব্যবস্থায় ইজারাদার নির্বাচনে হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়ায় একটি নতুন অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এরাই পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় বংশানুক্রমে জমিদারী ভোগের অধিকার লাভ করেছিল। অন্যদিকে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য মুর্শিদ কুলি খান এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়। অন্তত বাংলা থেকে শুরু করে পুরো ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিস্তার লাভের দায় অনেকাংশে মুর্শিদ কুলি খানের উপর বর্তায়। পরবর্তীকালে মুর্শিদ কুলী খানের প্রবর্তিত রাজস্ব পদ্ধতি বহুলাংশে অনুসরণ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতার সময় নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোর কারণে মুর্শিদ কুলি খানকে বংশানুক্রমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করা হয়। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান মৃত্যু বরণ করেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মুর্শিদ কুলি খানের প্রশাসনিক সংস্কারের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।
--	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ:
আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সময়কালকে নবাবি বাংলার উত্থানপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তখনকার মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। বাংলার ইতিহাসে এই শাসকরাই নবাব বলে পরিচিতি পান। সুবাদার মুর্শিদকুলি খান নবাব হিসেবে প্রশাসনিক অনেকগুলো সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি রাজস্ব সংস্কারের পাশাপাশি আরও অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা গ্রহণের সময় আয়ের একমাত্র উৎস ছিল—
ক) ভূমি রাজস্ব খ) বাণিজ্য শুল্ক গ) কৃষি কর ঘ) আবগারী শুল্ক
- মুর্শিদ কুলি প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম ছিল
ক) ‘মাল জামিনি’ খ) নানকর গ) পথ কর ঘ) ভূমিকর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিকেলের খেলাধুলা শেষ করে বাসায় ফিরে পড়তে বসেছে মামুন। পাশের রুমে উচ্চ শব্দে টিভি দেখায় সে খুব বিরক্ত হয়। ভলিউম কমানোর জন্য পাশের রুমে যেতে সে খেয়াল করে সবাই খুব মন দিয়ে সুলতান সুলাইমানের ডাবকৃত বাংলা সিরিয়াল দেখছে। টিভি স্ক্রিনে চোখ রাখতে তার হঠাৎ মনে পড়ে নবাব সিরাজ সিরাজুদ্দৌলার কথা। সে কোথায় যেন পড়েছিল নবাব সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের বংশধর। এটা ভুল না সঠিক সে ঠিকমত মনে করতে পারছে না। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন—

- ‘মালজামিনি’ ব্যবস্থা কি? ১
- বাণিজ্য সংস্কারের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ মুর্শিদ কুলি খানকে অমর করেছে? ২
- মুর্শিদ কুলি খান রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার করেছিলেন-বিবরণ লিখুন? ৩
- মুর্শিদ কুলি খানের নানাবিধ সংস্কারের ফলাফল কি ছিল বিশ্লেষণ করুন? ৪

পাঠ-৭.৩

সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসক হিসেবে সুজাউদ্দিন খানের অর্জন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুজাউদ্দিন খানের ছেলে সরফরাজ খানের রাজত্বকালের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

রওশনাবাদ, সিরার উল মুতাখখিরিন ও জিনাত-উন-নিসা



সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭ খ্রি.- ১৭৩৯ খ্রি.): দক্ষ প্রশাসক হলেও নবাব মুর্শিদকুলি খানের কোন পুত্র ছিলনা। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন খান উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। একজন নবাব হিসেবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি তার উপর বর্তায়। তুর্কি বংশোদ্ভূত সুজাউদ্দিনের পিতা ছিলেন বুরহানপুরে মুঘল সরকারের একজন কর্মচারি। তিনি সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সকলের আস্থা অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি নবাব মুর্শিদ কুলির সাথেও তার পরিচয় এখানে। পরবর্তীকালে মুর্শিদ কুলি খানের মেয়ে জিনাত-উন-নিসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুজাউদ্দিনের। তাঁর পুত্র সরফরাজ খান এবং মেয়ে নাফিসা বেগম। তবে মুর্শিদকুলি যখন বাংলার দিওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন তখনই তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যার নায়েবে নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন।

তবে মুর্শিদ কুলি খান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার জামাতা সুজাউদ্দিনের চেয়ে তাঁর নাতি সরফরাজ খান অধিক যোগ্য। তিনি চেয়েছিলেন ফররুখ শিয়ারের অনুমতি প্রাপ্তি সম্ভব হলে সরফরাজকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে। উচ্চাভিলাষী সুজাউদ্দিন বিপদ বুঝতে পেরে সসৈন্যে মুর্শিদ কুলির বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলির মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে গিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পাশাপাশি মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে ফরমানও লাভ করেন তিনি। এরপর তিনি নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে দেখে তার ছেলে সরফরাজ খানও তার বাবার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন এ পর্যায়ে। ফলে সুজাউদ্দিন খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এ তিন প্রদেশেরই নবাব হয়েছিলেন। মুর্শিদ কুলি খানের জীবদ্দশায় শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমেই নানামুখী সংকটের মুখে পড়েছিলেন সুজাউদ্দিন খান। তবে দায়িত্ব গ্রহণের থেকে সুজাউদ্দিন শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও আস্থা-ভাজনদের উচ্চ পদ দান করায় তার কাজ বেশ সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে তার ছেলে সরফরাজ খান লাভ করেন বাংলার দিওয়ানি। একইসঙ্গে জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি বাংলার নায়েব-নাজিম হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অন্যদিকে তারই সিদ্ধান্তে মির্জা হাবিবুল্লাহ সিরাজী সেনাপতি পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কাউন্সিলও গঠন করেছিলেন তিনি। তাঁর গঠিত উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন আলীবর্দী খান, হাজি আহমদ, জগৎশেঠ, আলম চাঁদ প্রমুখ।

সুজাউদ্দিন খান ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর অনেক উচ্চভিলাসী সিদ্ধান্ত সমস্যার জন্ম দেয়। হাবিবুল্লাহ সিরাজী, আগা সাদেক ও বরকত খানকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সুজাউদ্দিনের সেনাদল ত্রিপুরার চণ্ডীগড় দুর্গ আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা ভয় পেয়ে বন্যপথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি এই পলাতক রাজার ভাইপো ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি হন। তবে পুরো অঞ্চলের উপর আধিপত্য নিশ্চিতকল্পে আগা সাদেককে সেখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। সুজাউদ্দিনের নির্দেশে ত্রিপুরার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘রওশনাবাদ’। বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন সুজাউদ্দিন খান। নানা স্থানে উপযুক্ত স্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁর গৃহীত উদ্যোগ নানা স্থানে সমৃদ্ধির কথা জানান দেয়। এক্ষেত্রে নানা স্থানে বিদ্রোহ দমনের কৃতিত্ব তাঁরই। বিশেষ করে দিনাজপুরের জমিদার, কুচবিহারের রাজা এবং বীরভূমের জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাঁর সময়ে। এরা প্রত্যেকেই নিয়মিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কঠোরভাবে দমন করেছিলেন তাদের। প্রশাসনিক সংস্কার, বিদ্রোহ দমন থেকে শুরু করে নানা স্থানে শাসক হিসেবে সুজাউদ্দিনের সুখ্যাতি ছিল। তিনি বিদ্যমান নানা প্রথার সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রশাসনে নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা তিনি পুরোপুরি নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত রাখা তার প্রশাসন। অনেক ইতিহাসবিদ দাবি করেছেন তিনি উদার ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনামলকে নবাবি বাংলার ‘শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ’ বলে আখ্যায়িত

করেছেন অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক। তিনি শায়েস্তা খানের সময় বন্ধ করে দেওয়া তোরণদ্বার উন্মোচন করেন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ এবং তাঁর সুবার বিভিন্ন স্থানে বহু সুরম্য প্রাসাদ, দালান-কোঠা, মসজিদ, উদ্যান জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। সুজাউদ্দিন ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করলে শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার ছেলে সরফরাজ খান।

সরফরাজ খান (১৭৩৯ খ্রি:—১৭৪০খ্রি:)

নবাবি বাংলার শাসক হিসেবে নিজের নামের প্রতি সেভাবে সুবিচার করতে পারেননি সরফরাজ খান। তিনি তার পিতা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেছিলেন। ইতিহাসবিদদের অনেকে তাকে অকর্মা, অনভিজ্ঞ, আমোদপ্রিয় এবং চরিত্রহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। তার সময় থেকেই নবাবি বাংলার শাসন কাঠামোতে ধ্বস নেমেছিল। তিনি শাসনকাজে অবহেলা প্রদর্শন করে হেরেমের আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকতেন বেশিরভাগ সময়। অন্যদিকে সেনাবাহিনী শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার সময় পুরো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল। তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অক্ষমতা তাঁর দুর্দিন ডেকে আনে। তার ভাগ্যবিপর্যয়ের সুযোগে বিহারের উচ্চাভিলাষী নায়েব-নাজিম আলীবর্দী খান সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ১০ এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেন আলীবর্দী খান। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান রচিত ‘সিরার উল মুতাখখিরিন’ গ্রন্থে সরফরাজের এই অধঃপতনের নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে।



শিক্ষার্থীর কাজ

সুজাউদ্দিন খানের শাসনকালের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।



সারসংক্ষেপ:

মুর্শিদকুলি খান বাংলায় নবাবি শাসন শুরু করেছিলেন। তার কোন ছেলে না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন জোর খাটিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হয়েছিলেন। সুজাউদ্দিনের শাসনকালে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। তবে অযোগ্য পুত্র সরফরাজ খান তার এই ধারা ধরে রাখতে পারেননি। তাকে পরাজিত করে আলিবর্দী খান বাংলার সিংহাসন দখল করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সুজাউদ্দিন খান ক্ষমতা দখল করেন —

ক) ১৭২৭ সালে

খ) ১৭১৭ সালে

গ) ১৭৪৭ সালে

ঘ) ১৭৩৭ সালে

২. কোন নবাবের সময়কালকে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলা হত

ক) সুজাউদ্দিন খান

খ) চেঙ্গিস খান

গ) কুবলাই খান

ঘ) সরফরাজ খান



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিকলে কলেজ থেকে বাসায় ফেরে রাকিব। ড্রইং রুমে ঢুকতেই সে দেখে তার বাবা খুব মন দিয়ে দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন। মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকা নেতিবাচক শিরোনামসহ সংবাদ ছেপেছে। তার মনে পড়ে সুজাউদ্দিনের পর তার ছেলের কি কি ভুলের কারণে বাংলার নবাবি শাসনে একটা বড় রকম পরিবর্তন এসেছিল। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন—

১. সুজাউদ্দিন খান খান কে ছিলেন?

১

২. কর্মময় জীবনে কি কি পদক্ষেপ সুজাউদ্দিন খানকে অমর করেছে?

২

৩. সরফরাজ খান কিভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।

৩

৪. বাংলার নবাব হিসেবে আলিবর্দী খানের উত্থানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

৪

পাঠ-৭.৪

আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ◆ নবাব হিসেবে আলিবর্দী খানের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন লাভের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ◆ বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারে আলিবর্দী খানের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- ◆ পরিচয়সহ তাঁর কর্মময় জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

মারাঠা, গিরিয়ার যুদ্ধ, বর্গী ও ভাস্কর পণ্ডিত



ভূমিকা: ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে বাংলার দুর্বল নবাব সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন আলিবর্দী খান। আলিবর্দীর রাজত্বকাল ছিল বাংলার ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ সময়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নানামুখী অর্জন এই সময়কালকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। সাহসী নেতৃত্ব ও সুযোগ্য শাসনের মাধ্যমে তিনি বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। যোগ্যতা ও দক্ষতাগুণে তিনি একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থা থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। বিদেশী আক্রমণ থেকে শুরু করে স্থানীয় নানা অরাজকতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে। তার পরেও প্রায় ১৬ বছর নবাবি অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রথম মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়। মারাঠা নায়ক ও মারাঠাদের অন্যতম সেনাপতি রঘুজী ভোঁশলে তার প্রধান মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলা অভিযানে পাঠান। তার সাথে ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত তার হিংস্র বর্গী বাহিনী নিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। তারা বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে লুণ্ঠতরাজ শুরু করে। তাদের প্রতিরোধে আলিবর্দী খান হুগলি থেকে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। আলিবর্দী খানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত তৎপরতায় ভাস্কর পণ্ডিত যুদ্ধে পেরে ওঠেননি। পরাজিত ভাস্কর পণ্ডিত ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে স্বদেশে ফিরে যেতে রাজী হন। তবে এর পরে বর্গী বাহিনী নবাবের কাছে ১ কোটি টাকা দাবী করে। পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নেয় দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সেনাপতি মীর হাবীব ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে যোগদান করলে। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধির পর তারা বেপরোয়াভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ সহ নানা স্থানে লুণ্ঠতরাজ শুরু করে।

আলিবর্দী খান কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেও তাদের দমনে ব্যর্থ হন। অনন্যোপায় হয়ে নবাব শর্ততার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের ২২ জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ তাকে হত্যা করেন। এর পরেও মারাঠা আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্তি পায়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে নবাব তাদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এরপর চুক্তির শর্ত হিসেবে ঠিক করা হয়-

১. মীর হাবীব আলিবর্দী খানের অধীনের উড়িষ্যার নায়েব নাযিম থাকবেন।
২. এ প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন বাবদ রঘুজী ভোঁশলে পাবেন।
৩. চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব থেকে ১২ লক্ষ টাকা রঘুজীকে দিতে হবে।
৪. মারাঠা সৈন্যরা সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না।

এ-চুক্তির পর মারাঠারা আর বাংলায় হানা দেয় নি। বাংলায় বার বার মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই চুক্তি এক অর্থে বাংলার মানুষকে রক্ষা করে। এরপর ১৭৪৮ সালের দিকে বিদ্রোহী আফগানরা নবাবের বড় ভাই হাজী আহমদ ও তাঁর পুত্র জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে। তারা তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম ও তার সন্তানদের বন্দী করে। এ মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে নবাব বিদ্রোহী আফগান শক্তিকে ধ্বংস করে বিহার পুনরুদ্ধার করেন। পাশাপাশি আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদেরও মুক্ত করেন তিনি। এ ঘটনার পর তিনি তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন।

উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনের পরও রাজ্যজুড়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি আলীবর্দী খান। এর প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয় মারাঠা আক্রমণকে। এ সময় শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। জাতীয়তা ও হিন্দুধর্মীয় চেতনায় সংঘবদ্ধ হয় মারাঠারা। জাতি হিসেবে সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল তারা। মারাঠারা দীর্ঘ ১০ বছর (১৭৪১ খ্রিঃ - ১৭৫১ খ্রিঃ) বারবার বাংলায় আক্রমণ চালিয়ে আলীবর্দী খানকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মারাঠাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, নারী নির্যাতন, শিশু অপহরণ ও হিংস্রতার ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। বাংলায় দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত এ মারাঠারা বর্গী নামে পরিচিত হয়। তাদের আক্রমণে নানা স্থানে শহর-বাজার জনমানবহীন হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পড়ে। অনেক এলাকা থেকে কৃষকরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে থাকায় বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে কৃষিকাজ। আলীবর্দী খান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে আলীবর্দী খান ইউরোপীয় বণিকদেরকে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হলেও পরে চরমভাবে ব্যর্থ হন। ফলে এক পর্যায়ে স্থানীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সচেতন ইংরেজরা নানা স্থানে শক্তিশালী বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সেখানে তারা বাণিজ্যের পাশাপাশি নানামুখী সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৩৩ সালের দিকে আলীবর্দী খানকে বিহারের সহকারী সুবাদার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে এই পদ প্রাপ্তির পর থেকেই উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেতে দেখা যায় তাকে। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার অযোগ্য ছেলে সরফরাজ খান বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোগ্যতা, অক্ষমতার পাশাপাশি নানা কারণে তাঁর সাথে আলীবর্দীর সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বিশেষ করে নবাবের দুর্বল চরিত্র ও তাঁর গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। অবশেষে ১৭৪০ সালে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে নবাব সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। তার পরাজয়ের পরে বাংলার মসনদে বসেন আলীবর্দী খান। পাশাপাশি মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ লাভ করেছিলেন তিনি। অনেক অর্থবিত্ত খরচ করে তিনি এই অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন।

আলীবর্দী খান প্রায় ষাট বছর বয়সে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কর্মক্ষমতা ও নৈপুণ্য নিয়ে তিনি শাসনে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর ভাতিজা ও জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে বাংলার সুবার দিওয়ান ও জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন। হোসেন কুলি খান নওয়াজিসের নায়েব ছিলেন। নবাব তাঁর জামাতা জৈনুদ্দিন খানকে বিহারের নায়েব নিযুক্ত করেন। জয়েন উদ্দিন খান ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার পিতা। তার বৈমায়েয় বোন শাহ খানমের স্বামী মুহাম্মদ জাফর খান পুরাতন সৈন্যদলের বখশী ছিলেন। এর বাইরে নুরুল্লাহ বেগ খানকে নতুন সৈন্যদলের বখশী পদে নিয়োগ করা হয়। তার প্রশাসনে আলীবর্দী চিনরায়কে খালসা বিভাগের দিওয়ান এবং জানকী রামকে নিজের পরিবারের দিওয়ান নিযুক্ত করতে দেখা যায়। গোলাম হোসেন খানকে হাজিব পদ দেয়া হয়। নবাব আলীবর্দী তাঁর জামাতা সৈয়দ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি আতাউল্লাহ খানকে রাজমহল ও ভাগলপুরের ফৌজদারের দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে সৈন্যবাহিনী, নৌবহর, কামান-বারুদ, খাজানিখানা থেকে শুরু করে অস্ত্রাগারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বর্তায় নানা যোগ্য ব্যক্তির উপর। নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ ছিলেন উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা। তিনি আলীবর্দী খানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে বালেশ্বরের নিকট ফুলয়ারী নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে রুস্তম পরাস্ত হয়ে দক্ষিণাভ্যে পালিয়ে যান। আলীবর্দী বিদ্রোহ দমন করে উড়িষ্যা তার আধিপত্য নিশ্চিত করেন। এদের তৎপরতা তাঁর প্রতিপত্তি বিস্তারের পথে অন্তরায় হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলায় মারাঠা আক্রমণের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ:
আলীবর্দী খান শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির নবাব ছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুণীদের কদর করতেন। তাঁর সময় বাংলায় ফার্সি সাহিত্য ও পারসিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারের অনুমতি দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন বাংলার জন্য। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই তাঁর ৮০ বছর বিস্তৃত জীবনের অবসান ঘটে।	



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. আলীবর্দী খানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েবে নাজিম ছিলেন-
ক) মুর্শিদকুলি খান খ) সুজাউদ্দিন খান গ) সরফরাজ খান ঘ) মীর হাবিব
২. আলীবর্দী খান সরফরাজ খানকে পরাজিত করেন-
ক) বকসারের যুদ্ধে খ) মহিশূরের যুদ্ধে গ) গিরিয়ার যুদ্ধে ঘ) পলাশির যুদ্ধে
৩. আলীবর্দী খান সিংহাসনে আরোহণ করেন-
ক) ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গ) ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে
৪. বাংলায় মারাঠা অভিযানের সেনাপতি ছিলেন-
ক) শিবাজী খ) রঘজী ভোঁসলে গ) ভাস্কর পণ্ডিত ঘ) বালাজী রাও



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিকেলে কলেজ থেকে বাসায় ফিরে টিভি সেটের সামনে বসেছে আলী। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট জনৈক ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিয়েছেন। তাকে কামানের মুখে বসিয়ে গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই সংবাদে পুরো বিশ্ব হতবাক। পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নানাবিধ হুমকির কথাও শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করছেন এই সিদ্ধান্তও হঠকারী শাস্তি বিধান দেশটির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আলী ভাবতে থাকে এভাবেই সরফরাজ খানের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও হঠকারিতা শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী খানকে বাংলার সিংহাসনে আসীন করেছিল।

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন-

১. আলীবর্দী খান কে ছিলেন? ১
২. আলবর্দী খানের প্রাথমিক জীবন কেমন ছিল? ২
৩. পরিচয়সহ তাঁর কর্মময় জীবনের বিবরণ দিন। ৩
৪. আলীবর্দীর রাজত্ব কালে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৪

পাঠ-৭.৫

নবাব সিরাজউদ্দৌলা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাণিজ্য সুবিধার অপব্যবহার করেছিল তার বিচার করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

জৈনুদ্দিন খান, ময়মুনা ও আমিনা



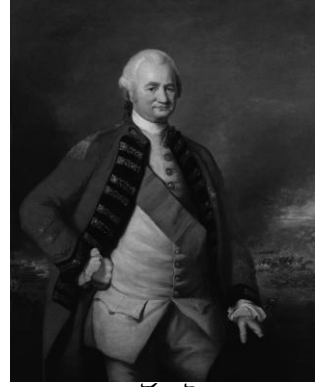
ভূমিকা: নবাব আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন মেয়ে ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে আমিনা, ময়মুনা ও ঘষেটি বেগম ময়মুনা ও আমিনার দুই ছেলে ছিল। তবে ঘষেটি বেগমের কোনও সন্তান ছিল না। আলীবর্দী খান আমিনার ছেলে সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ কারণে নবাব তাঁকেই তাঁর জীবিত কালে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। সিরাজের জন্ম ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ছিল জৈনুদ্দিন খান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা ও বিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসার পর থেকেই ঘরে-বাইরে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও বাধা বিপত্তির মুখে পড়েছিলেন। তাঁর নবাবির দায়িত্ব গ্রহণকে আলীবর্দী খানের অন্য দুই মেয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করে। এতে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ এবং ঘষেটি বেগমের দিওয়ান রাজা রাজবল্লব। সুযোগ বুঝে ইংরেজরা এই ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করে। সিরাজউদ্দৌলা পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল রাজ দরবারের প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাদের অপকর্মে ইন্ধন যোগায় সুবিধাভোগী ইংরেজ বেনিয়ারা। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী অনেক ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। তারা সিরাজের বিরুদ্ধে দিনরাত নানামুখী ষড়যন্ত্রের ডানা মেলতে থাকে। তাদের সব ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে এক নির্মম পরিণতি হয়ে এসেছিল পলাশীর যুদ্ধ। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীন শাসনের সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা পেতে দেখা যায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন।



নবাব সিরাজউদ্দৌলা

সিংহাসনে আরোহনের পর নানা দিক থেকে চাপে ছিলেন নবাব সিরাজ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জাল ছিল করতে তার অনেক সময় লেগে যায়। বলতে গেলে ঘরে বাইরে সবদিক থেকে বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এই সুযোগ কাজে লাগায় সুবিধাভোগী ইংরেজগণ। তারা সিরাজউদ্দৌলাকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করেনি। এমনকি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে আসেনি। আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে তারা কোনো ধরনের উপঢৌকনও প্রেরণ করেনি। ইংরেজদের এরূপ অবাধ্যতার জন্য নবাব স্বভাবতই তাদের প্রতি বিরাগভাজন হন। ইংরেজরা বহুদিন থেকে বাংলার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শওকত জঙ্গ, ঘষেটি বেগম তাদের সামনে সে সুযোগ নিয়ে আসে। পাশাপাশি দিওয়ান রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে ইংরেজরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিটি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ফলে সিরাজ এই বিদেশী শত্রুদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন শুরু থেকে। তারা শেষ পর্যন্ত সরাসরি বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজরা বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল।



রবার্ট ক্লাইভ

প্রথমবারের মত তাদের এই অনুমতি প্রাপ্তি মূলত সব সর্বনাশের সূচনা করে। তবে তারা তখন দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। এদিকে সিরাজের রাজত্বকালে তারা নানা বিশৃঙ্খলা থেকে সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে। তাদের দেখাদেখি ফরাসিরাও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। নবাব সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা তার এ আদেশ মেনে নিয়েছিল। তবে সুযোগ সন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী ইংরেজরা তার নির্দেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সরাসরি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে হলওয়েলের কল্লকাহিনীতে ‘অন্ধকূপ হত্যা’ বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল যা এক অর্থে নবাবের সম্মান হানি করে।

সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের সমর্থন জানায়। এর ফলে ইংরেজদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নেয়। এদিকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর ধনরত্নসহ পালিয়ে যায় কলকাতায়। সে সেখানে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয়লাভ করে। সম্পদসহ কৃষ্ণদাসকে ফেরৎ দিতে পুরো অস্বীকার করে ইংরেজরা। শুধু অস্বীকার করেই তারা চুপ থাকেনি। উপরন্তু নবাবের প্রেরিত দূতকে পর্যন্ত ইংরেজরা অপমানিত করে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আলীবর্দী এক অর্থে বাংলার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন ইংরেজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে। তারা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগানোর পাশাপাশি প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার অব্যাহত রেখেছিল। কোম্পানির কর্মচারিরা ব্যক্তিগতভাবে বেআইনী ব্যবসায় যুক্ত ছিল। তারা এভাবে অনেক শুল্ক ফাঁকি দিত। নবাব এর প্রতিকার দাবি করেন। তার জবাবে ঔদ্ধত্যের সব সীমা অতিক্রম করে ইংরেজ গভর্নর ড্রেক তা উপেক্ষা করে বসেন। সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা যায় নবাব আলীবর্দী খানের সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়টি। এই সন্ধি অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে। পাশাপাশি তারা নবাবকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অবনতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে মোড় নেয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	নবাব সিরাজ উদ্দৌলার উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।
--	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ:
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগত ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আরোহণ করে। স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে তারা অনেক আগে থেকেই ক্ষমতায় আরোহনের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করেছিল। পরের দিকে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় তাদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি সাধারণ উপলক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়।	



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত খ্রিস্টাব্দে মসনদে বসেন?

ক) ১৭৫৫

খ) ১৭৫৬

গ) ১৭৫৭

ঘ) ১৭৫৮

২। “অন্ধকূপ হত্যা” নামক কল্প কাহিনীর জনক কে?

ক) হলওয়েল

খ) ড্রেক

গ) রবার্ট ক্লাইভ

ঘ) ওয়াটসন



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণের পর সেখানকার শাসক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী বন্দী করে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনকে। ঈদের দিন বিকালে প্রকাশ্যে তাঁর ফাসি কার্যকর করা হয়। টেলিভিশন সংবাদ দেখে অনেক মন খারাপ হয় আকিবের। তার বাবা বললেন বাংলার ইতিহাসও এমনি নৃশংস নানা ঘটনার স্বাক্ষী। এভাবেই বিশ্বাস ঘাতকের দল হত্যা করেছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন—

১. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে ছিলেন ?

১

২. নবাবের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল?

২

৩. কিভাবে বাণিজ্য সুবিধার অপব্যবহার করেছিল?

৩

৪. পলাশী যুদ্ধের পটভূমি লিখুন?

৪

পাঠ-৭.৬

পলাশীর যুদ্ধ: ঘটনা, কারণ ও ফলাফল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পলাশী যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ ও ফলাফল জানতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	পলাশী যুদ্ধ, অন্ধকূপ হত্যা, আলী নগরের সন্ধি ও মুহাম্মদী বেগ
-----	------------	---



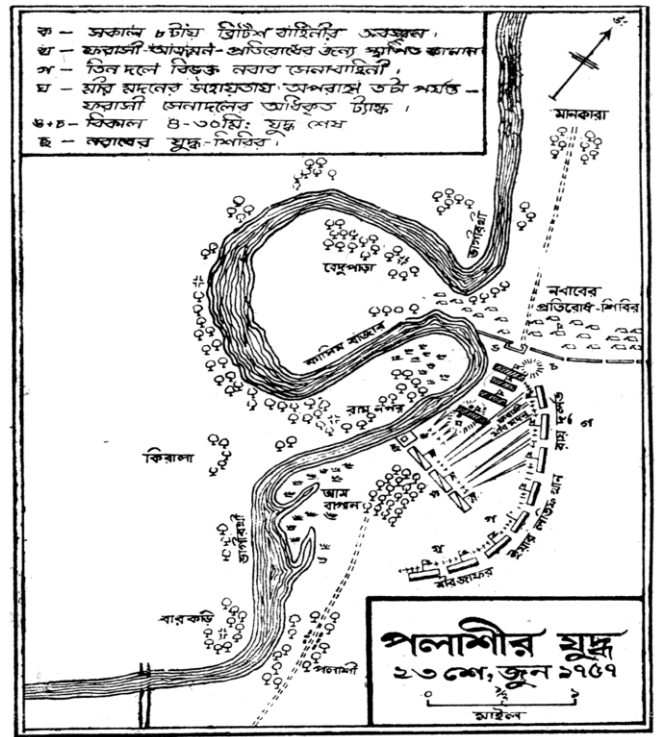
ভূমিকা: ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইংরেজদের নানা ধরনের অবাধ্যতা প্রত্যক্ষ করেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তিনি তাদের উদ্ধৃত্যপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সমুচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এজন্য কলকাতার দিকে অগ্রসর হন তিনি। পথিমধ্যে নবাব কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন। নবাবের এ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে গভর্নর ড্রেক ও তাঁর সাথীরা ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে ‘ফলতা’ নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। নবাব কলকাতা দখল করেন এবং আলীবর্দী খানের নামানুসারে এর নাম রাখেন ‘আলীনগর’। হলওয়েল ও তার সাথীরা পরাজিত হয় নবাবের বাহিনীর কাছে। তারা অনেকেই আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। আত্মসমর্পণের পর তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করা হয়নি। ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামক বীভৎস কাল্পনিক কাহিনীর জন্ম দেয় ইংরেজরা। কথিত আছে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায় বাকী ২৩ জন কোন রকমে বেঁচে যায়।

কলকাতা অধিকার করে মানিকচাঁদকে এর দায়িত্বে রেখে নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। ইতোমধ্যে ইংরেজরা মাদ্রাজ থেকে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে। ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে কলকাতা পুনরায় দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের শত্রুতা ধীরে ধীরে চূড়ান্ত রূপ নিতে থাকে। নবাব বেশ ভালবাবে বুঝতে পেরেছিলেন কোনোরকম ছাড় দিতে থাকলে ইংরেজরা কতটা হিংস্র, ধ্বংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ইংরেজরা আবার কলকাতা অধিকার করেছে এমন সংবাদ পেয়ে নবাব আবারও কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সেনাপতির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগে। আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের সম্ভাবনাও তাঁর জন্য অস্বস্তির কারণ ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের সাথে আরও একটি সন্ধি করেন। ইতিহাসে এটি ‘আলীনগরের সন্ধি’ নামে খ্যাত। ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এ সন্ধি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। অন্যদিকে এ সন্ধির শর্তানুসারে নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি প্রদান, টাকশাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার করার অনুমতি প্রদান করেন। ‘আলীনগরের সন্ধি’ ইংরেজ নেতা রবার্ট ক্লাইভকে খুশী করতে পারেনি। তিনি ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন তিনি। বিশেষ করে নানা ধরনের দুর্নীতি, অপকর্ম আর ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত নানা দেশীয় মানুষ তার এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে তার প্রতিক্রিয়া ভারতীয় উপমহাদেশেও দেখা দেয়। নবাবের নির্দেশ অমান্য করে ইংরেজরা ফরাসিদের কুঠি চন্দননগর অধিকার করে নেয়। নবাব তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হন। পাশাপাশি পলাতক ফরাসিরা নবাবের দরবারে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা ফ্রান্সে-বাংলা আক্রমণের আশঙ্কা করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায় ইংরেজদের। পাশাপাশি দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দিতে দেখা গেছে তাদের। নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ, আন্তাভাজন উমিচাঁদ, দিওয়ান রাজবল্লভ প্রমুখ। তাঁরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর বিনিময়ে মীরজাফর ইংরেজদেরকে পৌনে দুই কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। উমিচাঁদ এ গোপন চুক্তি ফাঁসের ভয় দেখায়। তখন ক্লাইভ তাকে প্রচুর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারসহ একটি জালচুক্তি পত্র তৈরি করেন। তবে এই জাল চুক্তিপত্রের ভুলগুলো সেভাবে ধরতে পারেননি উমিচাঁদ। ফলে তিনি প্রতারণিত হন।

পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, স্বার্থপরতা ও দেশদ্রোহিতার নিকৃষ্ট এক উদাহরণ সৃষ্টির উপলক্ষ হয়ে এসেছিল পলাশী যুদ্ধ। বাংলার ইতিহাসে এখনও নেতিবাচক কোনো অধ্যায় বলতে এই পলাশী যুদ্ধকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব আগে থেকেই ইংরেজদের দূরভিসন্ধি এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ কারণে তিনি ৫০টি কামানসহ ৫০ হাজার পদাতিক ও ১৮ হাজার অশ্বরোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। নবাব তার বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দেন। অন্যদিকে ক্লাইভ ৮টি কামানসহ ১০০০ জন ইউরোপীয় ও ২০০০ জন দেশীয় সৈন্যসহ পলাশীর আমবাগানে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে বাংলার ইতিহাস নতুন করে লিখতে হয়েছিল। বিশেষত এই লড়াই যতটা না যুদ্ধ ছিল তার থেকে অনেকাংশেই নবাবের ভাগ্য পরীক্ষা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। মীর মদন ও মোহন লাল নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। মীরমদন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোলার আঘাতে শহীদ হন। এদিকে মোহনলালের বীর বিক্রমে লড়াই ধীরে ধীরে ইংরেজদের বিপক্ষে চলে যায়। এ সময় মীরজাফরের কুপরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয়।

যুদ্ধ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে সংঘটিত হয়ে ইংরেজরা পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে নবাবের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নবাব কোন রকম প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। প্রাথমিকভাবে যুদ্ধে নবাবের ৫০০ জন সৈন্য নিহত হয়েছিলেন। তবে মোহনলাল প্রথম দিকে যুদ্ধে যেভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাতে ইংরেজদের ২৩ জন্য সৈন্য শুরুতেই নিহত হয়েছিল। তবে যুদ্ধে বন্ধের আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি আর লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। অন্যদিকে ফরাসি নেতা সিনফ্রেও যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পক্ষে প্রবল বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠনে ব্যর্থ হন। পরে পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পাটনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি রাজধানী থেকে পলায়ন কালে পথিমধ্যে রাজমহলের কাছে ধরা পড়েন। বিশ্বাসঘাতক নতুন নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরন তাকে হত্যার আদেশ দেয়। এ আদেশ বাস্তবায়ন করে মুহাম্মদী বেগ। ১৭৫৭ সালে ২ জুলাই ছুরিকাঘাতে নবাবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রায় দু'শ বছরের স্বাধীনতা অন্তিমিত হল।



পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি নানা কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছিল অনেক আগে। আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি দরবারের আস্থাভাজন অনেকে আস্থাহীন আচরণ করায় ইংরেজদের কাছে পরাজয় তার পতনের একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পলাশীর এই খণ্ডযুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নবাব পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। এ পরাজয়ের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল—

বিশ্বাসঘাতকতাঃ মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের মূল কারণ। বিজয়ের পূর্বক্ষণে প্রধান সেনাপতি হিসেবে তিনি নবাবকে ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মীরজাফর বিশ্বাস ঘাতকতা করে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ না দিলে মোহনলাল যেভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজ বাহিনীর

পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। প্রথম দিকের নানা বিশ্বাসঘাতকতা শেষ পর্যন্ত তেমন কাজে আসেনি। অন্তত শেষ পর্যায়ে সেনাপতি হিসেবে মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে এ যুদ্ধে নবাবেরই বিজয়ী হওয়ার কথা।

অদূরদর্শিতা : তরুণ নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যাধিক স্নেহ প্রাচুর্যে বেড়ে উঠা সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সাহসী হন নি। এই সিদ্ধান্তগত দুর্বলতার জন্যই তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

অবিশ্বাস ও অনাস্থা: যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্বতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে। তিনি নিজের সেনাবাহিনীর উপর সেভাবে আস্থা রাখতে পারেননি। ফলে মীর জাফরের মত বিশ্বাস ঘাতকের পরামর্শ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই অবিশ্বাস ও অনাস্থা শেষ পর্যন্ত তার পরাজয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

দৃঢ়তার অভাব: নবাবের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব থাকায় সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজরা। ফরাসিরা তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল আগেই। তিনি তাদের এই পরামর্শ কানে তোলেন নি। নবাব আলীবদী খানও মৃত্যুর আগে সিরাজকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে গেলেও তিনি ইংরেজদের দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ রণকৌশল: নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা রবার্ট ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকেও এগিয়ে ছিল। সে দক্ষ কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্মানে নবাবের বিশাল বাহিনীর থেকে এগিয়ে ছিল। তার বাহিনীর পারদর্শীতার কাছেও নবাব অনেকাংশে কুপোকাত হয়েছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটানোর পরোক্ষ কারণ হিসেবে ক্লাইভের দক্ষতাকেও উল্লেখ করা যায়।

ফলাফল: আপাত দৃষ্টিতে পলাশীর যুদ্ধ একটি খণ্ড যুদ্ধের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তবে এর ফলাফল ছিল দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিমিত এবং এর প্রভাবেই বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার উপহার হিসেবে প্রথম দিকে মীর জাফর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। নিচে পলাশী যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো—

নবাবের পতন: পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। এরপর পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়ে ঘাতকের হাতে তাঁর অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের জন্য অন্তিমিত হয়।

ক্ষমতা বদল: পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করলেন। কিন্তু প্রকৃত রাজক্ষমতা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তিনি সকল কাজই করতেন ইংরেজদের পরামর্শে। ফলে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা মতান্তরে চলে গিয়েছিল ইংরেজদের হাতেই।

বাংলার দেউলিয়াত্ব: পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছে থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগণার বিশাল জমিদারী লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়। এর মধ্য গিয়ে বাংলা পুরোপুরি দেউলিয়া হতে বসে।

একচেটিয়া ইংরেজ বাণিজ্য: এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। পাশাপাশি তারা ইউরোপের অন্য দেশের বণিকদেরও বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফরাসিদের দুর্ভোগ: এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দক্ষিণাভ্যে প্রভাব বিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। তবে তারা সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছিল ফরাসিদের। বলতে গেলে এই যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ফরাসিদের সব সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

ভারত দখল: এ যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে তারা মীর কাসিমকে পরাজিত করে। পাশাপাশি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে পরাজিত করে পুরো ভারত উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের কারণ কি ছিল তা জানতে পারবেন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ:
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগত ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আরোহণ করে। স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে তারা অনেক আগে থেকেই ক্ষমতায় আরোহণের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করেছিল। পরের দিকে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় তাদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি সাধারণ উপলক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পক্ষে প্রাণপণ দেশ প্রেমিকের মত যুদ্ধ করেন-
ক) রায়দুর্লভ খ) ইয়ার লতিফ গ) মোহন লাল ঘ) মীরজাফর
- পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন-
ক) ওয়াটসন খ) ক্লাইভ গ) সিনফ্রে ঘ) কর্ণওয়ালিস
- ইংরেজগণ আলীনগরের সন্ধিকে-
ক) মেনে চলে খ) নবায়ন করে গ) অমান্য করে ঘ) ভঙ্গ করে

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ছোট চাচার কাছে মায়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির নাম শুনেছে ইকবাল। তার মনে পড়ছে সুকি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে মিয়ানমারে যা ঘটছে তার সঙ্গে সে কিছুতেই এই শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টিকে মেলাতে পারছে না। বিশেষ করে নারীদের উপর জঘন্য নির্যাতন, মানুষের ঘড়ি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া। শিশু, নারী, বৃদ্ধ কিংবা সবল পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে কুপিয়ে হত্যা করার মত জঘন্যতা সেখানে ঘটছে। টিভি খুলে এর আগে সে ইরাকের নানা স্থানে যুদ্ধের সংবাদ দেখেছে। কিন্তু মিয়ানমারের এমন নৃসংশ গণহত্যা সে এর আগে কখনও দেখেনি। যুদ্ধের কথা ভাবতেই তার মনে পড়ে পাঠ্য বইয়ের উল্লিখিত পলাশী যুদ্ধের কথা। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? ১
- আলীনগরের সন্ধির বিবরণ দিন। ২
- উদ্দীপকের আলোকে আপনার পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দিন। ৩
- নবাবের পতনের কারণগুলো কি কি ছিল-সংক্ষেপে লিখুন? ৪

পাঠ-৭.৭

নবাবি শাসনের পতন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মীরজাফর ও মীর কাসিমের নবাবি লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বক্সারের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- বক্সারের যুদ্ধ পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।



মূখ্য শব্দ

মীর জাফর, মীর কাসিম, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও সুজাউদৌলা



ভূমিকা: বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে নবাবি শাসনের পতন ঘটানোর পর থেকে ব্রিটিশদের আনুগত্য থেকে নবাবি লাভ করেছিলেন মীর জাফর। তিনি এর আগে থেকে নবাব সিরাজের প্রতি মিথ্যা আনুগত্য দেখাতেন। পলাশীর যুদ্ধে তিনি নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থচাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তারা মীর কাসিমকে অল্প কিছুদিনের জন্য নবাব করেছিল। তবে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। তিনি বাংলায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাব, এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ইংরেজদের প্রতিরোধে শাহ আলমের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি করেছিলেন। তারপর ২২ শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে তার নেতৃত্বে ইংরেজদের বিপক্ষে বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। তবে নবাব মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। তারপর মীর জাফরকে তারা নতুনভাবে নবাব ঘোষণা করেছিল।

মীর জাফর

মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। এরপর তাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হলে ইংরেজ সেনাপ্রধান কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ প্রকাশ্য দরবারে মীর জাফরকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসনে বসান। তখন তার উপাধি হয়েছিল ‘সুজা-উল-মূলক-হিশাম-উদ-দৌলা মীর মোহাম্মদ জাফর আলি খান মহাবত জং।’ অর্থাৎ সাহসী, সাম্রাজ্যের তলোয়ার, মীর মোহাম্মদ জাফর আলি খান। এর আগে মীর জাফর ক্লাইভের সাথে একটি গোপন চুক্তি করেছিলেন। ঐ চুক্তির শর্তানুসারে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধিকারে থাকা রাজভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দখল ও ভাগাভাগির কাজ শুরু করেছিলেন। রাজভাণ্ডারে তখন ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা রৌপ্যমুদায়, ৩২ লাখ টাকা স্বর্ণমুদায়, দুই সিঁদুক ভর্তি সোনার পাতা, চার সিঁদুক ভর্তি হীরা-জহরত ও অপেক্ষাকৃত ছোট দুই সিঁদুক ভর্তি মণিমুক্তা পাওয়া গিয়েছিল। এর পাশাপাশি নবাবের হারেমে একটি গোপন ভাণ্ডারে আরও ৮ কোটি টাকা ছিলো।

ক্লাইভকে বঞ্চিত করে সুকৌশলে এই ৮ কোটি টাকার পুরোটাই মীর জাফর, আমির বেগ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে নবাবের ভাণ্ডারে অর্থ না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয় ইংরেজরা। পাশাপাশি গোপন চুক্তির শর্তানুসারে ক্লাইভকে দেড় কোটি টাকা দিতে ব্যর্থ হন মীর জাফর। ফলে বাধ্য হয়েই মীর জাফরকে বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইংরেজদের কাছে ইজারা দিতে হয়েছিল। সিংহাসনে বসার পর ক্লাইভ প্রচলিত রীতি অনুসারে নবাবকে আনুষ্ঠানিক নজরানা প্রদানের পাশাপাশি তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তবে মীর জাফরের প্রতি বিরাগভাজন হতে তাদের বেশি সময় লাগেনি। শেষে তারা মীর কাসিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়।

মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ সালের ২০ অক্টোবর মীর জাফরকে সরিয়ে দিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তার মাত্র চার বছরের রাজত্বকাল ১৭৬০ থেকে শুরু হয়ে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। মীর

কাসিম নবাব হয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে বন্ধপরিকর হয়েছিলেন। ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। তিনি ক্ষমতায় বসার পর থেকেই কলকাতা কাউন্সিলের বেশিরভাগ সদস্য তার প্রতি সন্দেহ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকেন। তবে দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে মীর কাসিম দ্বিতীয় শাহ আলমের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি রাজকোষের আয় বাড়ানোর জন্য রাজ্যের কতকগুলো বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচন করেছিলেন। পাশাপাশি ধনী নগরবাসীর অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি জমিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে সৈন্যদল শক্তিশালীকরণে মন দিয়েছিলেন তিনি।

ক্ষমতায় বসেই শাসনকার্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন মীর কাসিম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনাশুন্ধে বাণিজ্য করার অন্যায় অধিকার থেকে ইংরেজ কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ফায়দা নিতে থাকে। এর ফলে নবাবের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। তিনি ইংরেজ গভর্নরের কাছে এর প্রতিকার দাবি করেছিলেন। তবে তারা এর উপযুক্ত সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মীর কাসিম পরবর্তী সময়ে দেশীয় বণিকদের ওপর থেকেও বাণিজ্য শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এতে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের অযৌক্তিক সুবিধা পাওয়ার পথ বন্ধ হলে তারা তা মেনে নিতে পারেনি। নবাব মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধ চরমে উঠলে তা পাটনায় সংঘর্ষের রূপ নেয়। এরপর ১৭৬৩ সালের ৭ জুলাই নবাব বাহিনীর সাথে ইংরেজদের ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। পরপর কাটোয়া, ঘেরিয়া, মুর্শিদাবাদ, সুটি, উদয়নালা ও মুঙ্গেরে নবাব বাহিনীর সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। নবাব তখন পরাজিত হয়ে পাটনায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য নিয়ে তিনি বাংলাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সার নামক স্থানে দু'পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তাদের সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্য ভোগ করে ১৭৭৭ সালের ৬ জুন জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে শাজাহানাবাদের এক অখ্যাত পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মীর কাসিম।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাসিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানি হয়ে উঠেছিল পুরো দেশের আসল শাসনকর্তা। কেন্দ্রীয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশ তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তখন। তখন কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপটোকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। অন্যদিকে যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য নতুনভাবে ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দান করে বাংলায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেন (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি.)। বাংলায় এসে ক্লাইভ সবার আগে মীর কাসিমের মিত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। তিনি বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করেন। পাশাপাশি কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি জায়গীর হিসেবে নিয়ে অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। বাস্তবে ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করেছিলেন। বস্তুত ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানির সনদ লাভ করেছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করবেন।
---	-----------------	---



সারসংক্ষেপ:

নবাবি শাসনের পতন ঘটানোর পর থেকে ব্রিটিশদের আনুগত্য থেকে নবাবি লাভ করেছিলেন মীর জাফর। পলাশীর যুদ্ধে তিনি নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থচাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তারা মীর কাসিমকে অল্প কিছুদিনের জন্য নবাব করেছিল। তবে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। তিনি বাংলায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। ২২ শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে তার নেতৃত্বে ইংরেজদের বিপক্ষে বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। নবাব মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাসিমের মিত্র কে ছিলেন

ক) সুজাউদ্দৌলা

খ) কার্টিয়ার

গ) ওয়াটসন

ঘ) কর্নওয়ালিস

২। কত খ্রিস্টাব্দে ক্লাইড দ্বিতীয় বার বাংলায় আসেন?

ক) ১৭৬৪

খ) ১৭৬৫

গ) ১৭৬৬

ঘ) ১৭৬৭

৩। ইংরেজদের পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব মওকুফ করেছিলেন কে?

ক) মীর কাসিম

খ) শাহ আলম

গ) ক্লাইড

ঘ) সুজাউদ্দৌলা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

হাসান ও রুবেল দুই বন্ধু। হাসানের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে রুবেলের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। রুবেল হাসানকে শায়েস্তা করতে স্থানীয় সন্ত্রাসী বিপুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিপুল সুযোগ বুঝে একদিন পেছন থেকে ছুরিকাঘাতে হাসানকে চরম আহত করে। এরপর কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার রোষের শিকার হয় রুবেলও। মার খেয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় রুবেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার মনে হয় পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস। সে ভাবতে থাকে বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হয়? উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন-

১. বাংলায় নবাবি শাসনের পতন কবে হয়েছিল।

১

২. বাংলায় নবাবি শাসনের পতন কিভাবে হয়েছিল?

২

৩. বক্সারের যুদ্ধের কারণগুলো লিখুন?

৩

৪. নবাবি শাসন পতনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন?

৪

পাঠ-৭.৮

নবাবি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবাবি বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নবাবি বাংলার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ও
- নবাবি বাংলার মানুষের সামাজিক জীবন কেমন ছিল তা জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

মিল্লাদ, সুরমা, পানদানী ও মহররম



ভূমিকা: নবাবি বাংলার আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও বিকাশধারা বিসয়ে গবেষণা অপ্রতুল। বাংলার নবাবদের দুর্বল শাসনের বিপরীতে নানা ধরনের স্বৈচ্ছাচারিতা দেশবাসীকে হতাশ করেছিল। পাশাপাশি নানা ধরনের ব্যবসায়ী শ্রেণি সাধারণ মানুষের উপর অনেকটাই জেঁকে বসে। এই সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর নানা উপদ্রবে নবাবি শাসনের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। এর আগে পর্যন্ত শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল নবাবি বাংলা। বিশেষ করে দিল্লির শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর থেকে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি। তবে এই সংস্কৃতিতে ক্ষমতার বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল তুলনামূলক কম। বিশেষ করে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজকে এই সংস্কৃতি সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

নবাবি যুগের বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্পষ্ট হয় তখনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কেমন ছিল। বিশেষ করে নবাবি আমলের ঢাকার সমাজ জীবন বিশ্লেষণ করতে গেলে নানা সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। তখনকার ঢাকায় সামাজিক জীবনও গড়ে উঠেছিল নানা জাতি-ধর্মের সংমিশ্রনে। তার পরেও বেশিরভাগ সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন ছিল ধর্মভিত্তিক। খুব সমারোহের সঙ্গে তখন এই সব উৎসব পালিত হতো। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ধর্মের মানুষ একে অপরের উৎসবে যোগ দিতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উৎসবে পালা-পার্বণ পালনে একত্রিত হতে দেখা গেছে সবাইকে। যেমন মুহররম আসলে হিন্দু-মুসলিম মিলে মিশে তা বেশ উৎসব মূখর পরিবেশে পালন করতো। অন্যদিকে কোথাও কোনো মসজিদ তৈরি হলে উৎসব হতো সেখানেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৭০০ সালের দিকের ঢাকায় বেগম বাজারের করতলব খানের মসজিদ নির্মাণের শুরুতে বেশ বড় আয়োজন হয়েছিল। নবাবি বাংলায় গৃহজীবনের বিশ্লেষণ করতে গেলে চোখে পড়ে প্রায় বেশিরভাগ বাড়িতেই বৈঠকখানা কিংবা মজলিশ ঘর থাকতো। সেখানে পান সুপারি থেকে শুরু করে আতর-সুরমা এবং নানা উপকরণ সাজানো থাকতো। নানা রকম মশলা ও সুগন্ধী উপাদানে মেয়েরা পান বানানোর কৌশল আয়ত্ত্ব করেছিল। অন্যদিকে চীন থেকে আমদানী করা মাটির পাত্রে খাবার সাজিয়ে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হতো। ঢাকার কারিগরদের তৈরী আতরদানি, পান রাখার পাত্র ও সুরমাদানির সুস্বন্দ কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন অনেক বিদেশীও। ভাষা-হিসেবে বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে তখন ছিল আরবি ও ফারসির প্রচলন। সামাজিক যোগাযোগের একটি বড় সুযোগ ছিল নানা রকম মিলাদের আসরে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ঢাকা শহর জুড়ে তখন মিলাদের চর্চা ছিল। প্রায় প্রতিটি পরিবারে ছেলেমেয়েদের সুর করে দোয়া দরুদ পাঠ ও শিক্ষায় উৎসাহিত করা হতো। নবাবি বাংলায় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। বাংলার নবাবগণ শুধু রাজনীতিই নয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান দিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি নানা সমাজসেবামূলক কাজেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেছে। এ ধরনের নানা উদ্যোগের ফলে নবাবি বাংলার মানুষ আর্থিকভাবেও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিল।

নবাবি বাংলার শাসন কাঠামোতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সে সময়ের সমাজ সংস্কৃতিকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তখন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করা হত। উদাহরণ হিসেবে দুই ঈদের কথা বলা যেতে পারে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র ও অবস্থাসম্পন্ন মানুষ নির্বিশেষে একত্রিত হতেন। এসময় তাঁরা পরস্পর কুশল বিনিময় করতেন। অনেক স্থানে নবাবের আনুকূল্যে স্থানীয়

শাসকরা দুস্থদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এমন সব অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষাকৃত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা পর্যন্ত করতেন বলে জানা যায়। তবে এই সময়ের নানা আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজধানীর আশেপাশের মানুষের প্রাধান্য ছিল। গ্রামের মানুষের জীবন ছিল সাদামাটা। বেশিরভাগ উৎসবের বর্ণিল আয়োজনে তাদের অতি সাদামাটা জীবনকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	নবাবি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ:
মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে বাংলার বিপন্নতার আয়োজন শেষ দিকে এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে সংঘটিত হয় পলাশী যুদ্ধ। বয়সে নবীন সিরাজ উদ্দৌলাকে তখন লড়াইয়ে হয়েছিল এক সংঘবদ্ধ ও সচেতন বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে। অপেক্ষাকৃত উন্নত হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে আসা ইংরেজ বাহিনী প্রথমে পরাজিত হয়। তবে বিশ্বাসঘাতকরা শেষ পর্যন্ত নবাবের জয়লাভের সে সুযোগ নষ্ট করে দেয়। এর আগে পর্যন্ত শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল নবাবি বাংলা।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নবাবি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব কোনটি?

ক) মিলাদ

খ) জিকির

গ) জলসা

ঘ) ওয়াজ

২। করতলব খান মসজিদ নির্মাণের সময় কি করা হয়েছিল?

ক) জনসবাবেশ

খ) বজ্রতা

গ) জসলে জুলুস

ঘ) উৎসব

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাহবুবের ছোট ভাই মাসুম নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাদের স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক নবাবি বাংলার শাসন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর আলোচনার পুরোটা জুড়ে ছিল নানা রকম যুদ্ধ আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। মাসুম অবাক হয়ে লক্ষ করে এতক্ষণের আলোচনায় নবাবি বাংলার সাধারণ মানুষ সম্পর্কিত কোনো কিছুই জানতে পারেনি সে। বাসায় ফেরার পর সে তার বড় ভাই মাহবুবের কাছে জানতে চায় এই সময়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বিষয় নিয়ে। উদ্দীপকটির আলোকে উত্তর দিন।

১. বাংলার নবাবের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে?

১

২. নবাবি বাংলায় সাধারণের জীবন কেমন ছিল?

২

৩. উদ্দীপকের আলোকে নবাবি বাংলার উৎসবগুলো সম্পর্কে লিখুন?

৩

৪. নবাবি বাংলায় সামাজিক শ্রেণির বিকাশের চিত্র তুলে ধরুন।

৪

	উত্তরমালা
---	-----------

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। খ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১। গ ২। খ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১। ক ২। খ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১। ক ২। গ

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন (১৭৫৭ - ১৯৪৭ খ্রি:)

ইউনিট
৮

ভূমিকা:

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতার উপহার হিসেবে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খান বাংলার সিংহাসন লাভ করেছিল। তবে রাজকোষ শূন্য থাকায় প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য মীর জাফর তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্ণালঙ্কার, ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতিও দিতে হয়েছিল তাকে। ঢাকা ও পূর্ণিয়ার সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা গেলেও বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি। মীরজাফর নবাবি পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি তার ছিল না। ফলে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরও একটা সময় বিরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পূর্বতন বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধবোধ ও অযোগ্যতা এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্থায়ী গভর্নর ভ্যানসি ট্রাট মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলতে গেলে তখন থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বাংলার ইতিহাসে ঘটে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে এ ইউনিটে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ:

- পাঠ- ১ : ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি: বঙ্গারের যুদ্ধ
- পাঠ- ২ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ
- পাঠ- ৩ : বাংলায় দ্বৈত শাসন
- পাঠ- ৪ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
- পাঠ- ৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
- পাঠ- ৬ : বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন
- পাঠ-৭ : বাংলায় সংস্কার আন্দোলন
- পাঠ-৮ : সর্বভারতীয় কংগ্রেস
- পাঠ ৮.৯ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.) রদ ও প্রতিক্রিয়া
- পাঠ ৮.১০ : সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
- পাঠ ৮.১১ : লক্ষ্মী চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)
- পাঠ ৮.১২ : খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
- পাঠ ৮.১৩ : বেঙ্গল প্যাক্ট
- পাঠ ৮.১৪ : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
- পাঠ ৮.১৫ : ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব
- পাঠ ৮.১৬ : ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান
- পাঠ ৮.১৭ : ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৮.১

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি: বঙ্গারের যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবাব মীর কাশিম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বঙ্গার-যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ সম্পর্কে জানবেন এবং
- বঙ্গার যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

মীর কাশিম, বঙ্গারের যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন



ভূমিকা: পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজিত হওয়ার পর মীর জাফর নামমাত্র নবাব হতে পেয়েছিলেন। তার অল্পদিন পরে ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। তিনিও কোম্পানিকে নানা সুবিধাদানের শর্ত দিয়েই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তবে মীর কাশিম মীরজাফরের মতো অযোগ্য ও নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার স্বাধীনচেতা স্বভাবের পাশাপাশি জনসাধারণের কল্যাণে সচেতনতা ছিল উল্লেখ করার মত। এক্ষেত্রে তিনি ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। প্রথমে মীরজাফরের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে নানা কারণে নবাব মীর কাশিমও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। এদিক থেকে দেখলে এই বঙ্গারের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ইংরেজ আধিপত্য উপমহাদেশে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলার নামমাত্র টিকে থাকা স্বাধীনতা এর মধ্য দিয়েই পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছিল।

বঙ্গার যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ

মীর কাশিম বাংলার সিংহাসনে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে ইংরেজদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য। ইংরেজদের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব না জড়ালেও তাদের প্রভুর আসনে রাখতে চাওয়ার মনোবৃত্তি ছিল না তাঁর। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় গিয়ে তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেশ, জাতি এবং নিজের প্রয়োজনে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন মূলত বঙ্গারের যুদ্ধের নেপথ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে—

১. রাজধানী স্থানান্তর: মীর কাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। এ কাজে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে তারাই এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠবে। তাই তিনি রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসনকার্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এক্ষেত্রে নতুন স্থাপিত রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি এর চারপাশে নানা ধরনের পরিখা-খনন করেছিলেন। পাশাপাশি এখানে শক্তিশালী দুর্গও নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন ইংরেজরা পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে পারে। তাই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি সামরিক ও মার্কার নামে দু'জন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে বাংলার সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে তিনি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করেন। এজন্য মুঙ্গেরে তিনি কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজ প্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষ্য করে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলে মীরকাশিমের উপর ক্ষিপ্ত হয় ইংরেজরা। এই অসন্তোষ একটা পর্যায়ে গিয়ে যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল।

২. ফরমান অবমাননা: মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে প্রাপ্ত একটি ফরমান বলে ইংরেজ কোম্পানি বিনাশুল্ক বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। দস্তক নামে পরিচিত ছাড়পত্র দ্বারা কোম্পানির মালামাল চিহ্নিত করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা এই দস্তকের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত মালামালকেও কোম্পানির হিসেবে দেখিয়ে

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করেছে। ফলে দেশীয় বণিকগণ ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হন। অনদিকে এবং নবাব নিজেও প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হতে থাকেন। যা একটা পর্যায়ে ভয়াবহ সংঘাতের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

৩. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এমনিতেই অনেক সুবিধা ভোগ করত। তার উপর কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবৈধ আন্তঃবাণিজ্য দেশীয় বণিকদের কোণঠাসা করে ফেলে। দস্তক নামে পরিচিত ছাড়পত্র দ্বারা কোম্পানির মালামাল চিহ্নিত করার ব্যবস্থা ছিল। এই দস্তকে সাক্ষর করতেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। কিন্তু কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা এই দস্তকের অপব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত মালামালকেও কোম্পানির বলে বহন করেছেন। পক্ষান্তরে ইংরেজ বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না তারা। মীর কাশিম এ বিষয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি এক পর্যায়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে নবাবের রাজস্ব আয় কমে গেলেও দেশীয় বণিকদের সাথে বিদেশী বণিকদের অন্যায্য প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ নতুন ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা চেষ্টা করে নবাবকে শায়েস্তা করার জন্য।

বক্সারের যুদ্ধের ঘটনাবলী

নবাব মীর কাশিমের গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত ইংরেজদের ক্ষোভের কারণ হয়। তারা নবাবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতেই কলকাতায় ইংরেজ কুঠির প্রধান এলিসের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ বাধে। ইংরেজ নেতা এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে শহরটি দখল করে নিলে বাধ্য হয়ে নবাবকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। মীর কাশিম পাটনা হতে এলিসকে তাড়িয়ে দিয়ে পুরো এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তারপর কোলকাতা-কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মীর কাশিম মেজর অ্যাডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। সৈন্য সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালায় যুদ্ধে (১৭৬৩ খ্রি:) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন মীর কাশিম। এরপর বাধ্য হয়ে তিনি অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মীর কাশিমের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজগণ আবার মীরজাফরকে নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছিল। নতুনভাবে নবাব হয়ে বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফর মীর কাশিম কর্তৃক জারীকৃত ইংরেজ স্বার্থবিরোধী প্রত্যেকটি ঘোষণা ও বিধি প্রত্যাহার করে নেয়। বার বার পরাজিত হয়েও মীর কাশিম হাল ছাড়েননি। তিনি এরপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাদের সহযোগিতায় গঠিত সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ১৭৬৪ সালে মীর কাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে বরাবরের মত এবারেও ভাগ্য সহায় হয়নি তার। তিনি বিহারের বক্সার নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে মেজর মনরোর সেনাদলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বলতে গেলে এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীনতা ধরে রাখার শেষ সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর ইতিহাসের পাতায় মীর কাশিমের নাম সেভাবে পাওয়া যায়নি। অনেকের মতে তিনি আত্মগোপনে চলে গেছেন। কারও কারও বিশ্বাস নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মত তাকেও হত্যা করা হয়েছিল।

ফলাফল ও গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ বাংলার পাশাপাশি পুরো ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিল। তাই এর ফল যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী। অনেক দিক থেকে এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। নিচে এর গুরুত্বগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

১. এ যুদ্ধে পরাজিত দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে। মূলত সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে ইংরেজদের একটা চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির বলে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে।
২. অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
৩. যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ সালের দিকে দিল্লির কাছে তার মৃত্যু হয়। অনেকের ধারণা বাংলার এই শেষ স্বাধীনতাকামী নবাবকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে ইংরেজদের একটি চুক্তি হয়েছিল যে চুক্তির বলে কোম্পানি বাংলা বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে।
৪. এ যুদ্ধের ফলে মীরকাশিমের ইংরেজ বিতাড়ণ ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। বলতে গেলে উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।

৫. এ যুদ্ধের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। তারা এর পর থেকেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে কুঠি নির্মাণ শুরু করে।
৬. কোম্পানির যোদ্ধারা অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দু'টি কেড়ে নিয়েছিল।
৭. বক্সারের যুদ্ধে কেবলমাত্র মীর কাশিম পরাজিত হননি। এযুদ্ধে স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে দিল্লি থেকে শুরু করে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে গিয়েছিল।
৮. বক্সার যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মীর কাশিমের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।
---	-----------------	-------------------------------------

	সারসংক্ষেপ:
পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করেও প্রকৃত নবাব হতে পারেননি। ১৭৬৩ সালে কলকাতা কাউন্সিল যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীর কাশিম পরপর গিরিয়া, উদয়নালা ও কাটোয়া সেনাপতি অ্যাডামসের কাছে পরাজিত হন। পরবর্তীকালে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি:) পুনরায় ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদাটুকু হারিয়েছিলেন মীর কাশিম।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। মীর কাশিম কত সালে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৬০ খ) ১৭৬১ গ) ১৭৬২ ঘ) ১৭৬৩
- ২। কত সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৭৬২ খ) ১৭৬৩ গ) ১৭৬৪ ঘ) ১৭৬৫
- ৩। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন—
ক) এলিস খ) মনরো গ) এডামস ঘ) হলওয়েল
- ৪। মীর কাশিম রাজধানী স্থানান্তর করেন কোথায়?
ক) মুঙ্গেরে খ) পাটনায় গ) কলকাতায় ঘ) উদয়নালায়

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসায়। তারপর মীর জাফরের স্থলে যিনি আসেন তিনি বিশ্বাসঘাতক নন। তিনি ইংরেজদের প্রভু মানতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে ইংরেজ ও এ দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে পরিস্থিতি বদলে যায়। নতুন এক নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজদের আধিপত্য থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন—

- ক) মীর কাশিম কে ছিলেন? ১
- খ) বক্সারের যুদ্ধের মূল কারণ কি? ২
- গ) উদ্দীপকে আলোচিত যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের কি কি মিল রয়েছে? ৩
- ঘ) বক্সারের যুদ্ধের সুদূর প্রসারী প্রভাব কি আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দিউয়ানি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- রবার্ট ক্লাইভ কিভাবে কোম্পানির পক্ষে দিউয়ানি লাভ করে তা জানতে পারবেন এবং
- ক্লাইভের দিউয়ানি লাভের ফলাফল কি ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

দিউয়ানি, রবার্ট ক্লাইভ ও কোর্ট অব ডিরেক্টর্স



ভূমিকা: পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাংলায় এক অর্থে নবাবি শাসনের পতন ঘটিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইংরেজদের আত্মবাহ হয়েই শাসনকাজ চালাতে শুরু করেন। তখন ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশে আর কারো ছিল না। তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা রাজনৈতিক প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিজের মত করে নিতে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে মুঘল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ শাসনের জন্য দু'টি সমপর্যায়ের পদ ছিল। এর একটি পদ ছিল সুবাদারি অন্যটি ছিল দিউয়ানি। সুবাদার ও দিউয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লির সম্রাটের কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে প্রশাসনিক সহযোগিতা করতেন। তবে তারা কেউ একে অন্যের অধীনও ছিলেন না। তখনকার দিকে সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা। পাশাপাশি দিউয়ানের দায়িত্ব বর্তায় রাজস্ব তথা খাজনা আদায়ের। কোনওভাবে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠতে পারেন। এই ভেবেই ক্ষমতা বিভাজনের এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনও ছিল এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৭১৭ সালে সুবেদারের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত মুর্শিদ কুলি খান বাংলার দিউয়ান ছিলেন। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসনকারী এই নবাব এবং তাঁর উত্তরসূরীরা একইসঙ্গে সুবাদার ও দিউয়ানের দায়িত্ব পালন করতেন। শুধু তাই নয়, মারাঠা উৎপাতের কারণে আলীবর্দী খান কেন্দ্রকে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি হয়ে ওঠে পুরো দেশের হর্তাকর্তা। তারপর কেন্দ্রীয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতি বদলে যায়। তখন সবকিছু এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যা থেকে উত্তোরণের পথ ছিল না। ফলে সুবে বাংলা আবার আগের মতো দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দেয়। বলতে গেলে সম্রাট শাহ আলম বাংলা থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমনি পরিস্থিতিতে সম্রাট কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপটোকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তখন তার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল কোম্পানি। পরে বক্সার যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। তাদের হঠকারিতায় বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হয়। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বাংলায় প্রেরণ করে (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি:)। বাংলায় এসে ক্লাইভ মীর কাশিমের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দেন। বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের নিকট থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টির দখল নেয়া হয়। এরপর তিনি অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপনের পাশাপাশি দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথেও সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের কাছ থেকে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর ১৭৬৫ সালে ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানির সনদ অর্জন করেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভের ফলাফল ও গুরুত্ব

বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে নতুন গতিপথ লাভ করে বাংলার ইতিহাস। এক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়েছিল তা হচ্ছে—

রাজনৈতিক বিজয়: বাংলায় কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। এর ফলে সম্রাট ও নবাব একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের অধিকার এবং সেনাদল রাখার মতো অর্থবল ছিল না নবাবের। নবাবকে নামমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে রেখে কোম্পানিই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বাংলায় কার্যত: ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে।

অর্থনৈতিক সুবিধা: বাংলায় দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে কোম্পানি নিজের দেউলিয়া অবস্থা হতে রক্ষা পায়। দিউয়ানি লাভের সুযোগ সুবিধা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভ উল্লেখ করেন যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা দিয়ে, সম্রাট ও নবাবের নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যয় বাদ দিলেও কোম্পানির হাতে প্রকৃত আয় থাকবে ১২ কোটি টাকারও অধিক।

কোম্পানির পুঁজি বৃদ্ধি: লর্ড ক্লাইভ এক পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানিয়েছিলেন যে, ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানির গোটা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট। ফলে দিউয়ানি লাভের আগে এ দেশে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ হতে কোম্পানি যে বিপুল পুঁজি নিয়ে আসতো দিউয়ানি লাভের পর তার আর প্রয়োজন থাকে না এবং ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগ্রহ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্য: বাংলায় দিউয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা শুদ্ধহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এতে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসদুপায়ে রাজস্ব আদায় করলেও কোম্পানির কর্তারা কোন পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

সম্পদ পাচার (Drain of Wealth): কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ও সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। তাই ১৭৬৫ সালে বাংলার দিউয়ানি লাভ প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর ফলে বাংলা ধীরে ধীরে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। একটা পর্যায়ে এসে এদেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলায় কোম্পানির দিউয়ানি লাভের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ :
বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের পর বাংলা তথা উপমহাদেশে ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মীরকাসিমের নবাবি লাভের আগেই ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এদেশে কোম্পানির দুর্নীতি দমনের ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আবার তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে দ্বিতীয় বার এদেশে প্রেরণ করে। তিনি মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। এর বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২
---	-------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কত সালে কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে?

ক) ১৭৬৪

খ) ১৭৬৫

গ) ১৭৬৬

ঘ) ১৭৬৭

২। প্রতি বছর কত টাকার বিনিময়ে কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করে?

ক) ২৪ লক্ষ

খ) ২৫ লক্ষ

গ) ২৬ লক্ষ

ঘ) ২৭ লক্ষ

- ৩। কোন নবাবের সময় থেকে দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়?
 ক) আলীবর্দি খান খ) সিরাজদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মীর কাশিম
- ৪। মুঘল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে কে প্রথম সুবাদারির পদটিও নিজে দখল করেন?
 ক) আলীবর্দি খান খ) সিরাজউদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মুর্শিদকুলী খাঁন
- ৫। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভের ফলে—
 i. বাংলায় আইনত: ও কার্যত: ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়
 ii. ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়
 iii. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii
 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুন একজন প্রাদেশিক সুবাদার। মুঘল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ প্রশাসনে দুটি সমপর্যায়ের পদ ছিল। একটি সুবাদার অন্যটি দিউয়ান। সুবাদার ও দিউয়ান উভয়ই সরাসরি সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতেন; কিন্তু একে অন্যের অধীনও ছিলেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, অন্যদিকে দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব প্রশাসন। দিউয়ানের অর্থই হলো— রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন সেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা বিভাজনের এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মামুন মুঘল শাসনতান্ত্রিক এই প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করেন।

- ক. ক্লাইভকে কখন লর্ড উপাধি প্রদান করা হয়? ১
- খ. “হয় খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর”— ব্যাখ্যা করুন। ২
- গ. উদ্দীপকের মামুনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে সুবাদারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার শাসন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ৩
- ঘ. ইংরেজদের দিউয়ানি লাভের ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৩

বাংলায় দ্বৈতশাসন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বৈত শাসন বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলায় দ্বৈত শাসনের ফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ও
- ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর কি তা জানতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তর, ডালহৌসি, এলাহাবাদ ও আমিলদারী



ভূমিকা: ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তি বলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করেছিল ইংরেজরা। তখন দ্বিতীয় বারের মত বাংলার গভর্নর হয়ে এসে এদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এক নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। দিউয়ানি এবং নিয়ামত-এই দুটি শাসন কাজের ভাগাভাগিকে এক অর্থে দ্বৈত শাসন বলা যায়। রাজস্ব আদায় ও দেশ রক্ষার ভার ছিল কোম্পানির উপর। অন্যদিকে নিজামত তথা বিচার ও প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব বর্তায় নবাবের উপর। কোম্পানির সরাসরি দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন তা যেমন ছিলনা, তেমনি এদেশীয় ভাষা ও আইন কানুন সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞানও ছিল না। তাই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। এ সকল দিক চিন্তা করেই তারা দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল।

বাংলায় দ্বৈতশাসন

সরাসরি রাজস্ব আদায় করা কোম্পানির জন্য বিপদজনক হয়ে দেখা দেয়। কেননা সরাসরি কোম্পানি রাজস্ব গ্রহণ করলে বাংলায় বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। বিশেষ করে, বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় ছিল দিউয়ানির কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। অন্য সব ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এদেশীয় সরকারকে শুল্ক দিতে রাজী থাকলেও ইংরেজদের শুল্ক দেয়ার কথা নয়। ফলে লর্ড ক্লাইভ কৌশলে দিউয়ানির সমস্ত শাসনভার নামমাত্র দিয়েছিলেন নবাবের উপর। আর কোম্পানির কাছে রাখা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা। নবাবের ভাতা এবং শাসনকাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকড়ি বরাদ্দ রেখেছিল। উদ্বৃত্ত প্রায় সব অর্থ কোম্পানি গ্রহণ করতো। তাদের গৃহীত এ ব্যবস্থার ফলে দায়দায়িত্ব কাগজে কলমে না নিয়েও প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। এক্ষেত্রে নবাব প্রায় ক্ষমতাহীন থেকেও প্রায় সব দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাকে। আর কোম্পানি কাগজে কলমে কোনো ক্ষমতা না রেখেও পুরো শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে যায় এই দ্বৈতশাসন নীতির মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের শাসনে বাংলার নবাবগণ ছিলেন একাধারে নাজিম ও দিউয়ান। নাজিম হিসেবে তাঁরা শাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার কাজ চালাতেন। আর দিউয়ান হিসেবে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বটাও ছিল তাদের। তবে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বেড়ে যায় অনেকাংশে। অর্থ ও ক্ষমতা ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে তাদের রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে ফৌজদারী ও দিউয়ানি বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রকৃত কর্তৃত্ব কোম্পানির হাতেই থেকে যায়। নবাব অনেক দায়িত্ব বহন করে শুধুমাত্র বৃত্তিভোগী হিসেবে নানা দুর্ভোগের শিকার হন। প্রথমত, নবাব নাবালক হওয়ার অজুহাতে ক্লাইভ তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজস্ব বিশারদ সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাকে নায়েব নাজিম উপাধি দান করা হয়। বাস্তবে তার উপরেই বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে দেখা যায়। পাশাপাশি বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা সেতাব রায়কে। এরা কোম্পানির প্রতিনিধি বিশেষ দিউয়ান। তাদের উপাধি দেয়া হয় নায়েব দিউয়ান। কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে এরা রাজস্ব আদায় করত। পাশাপাশি কোম্পানির প্রায় সব আদেশ মেনে চলতে দেখা যায় এদের। পক্ষান্তরে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের উপর নজর রাখা হয়। এজন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধিও অবস্থান করত তখন। ফলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নানামুখী জটিলতার সৃষ্টি হয়। আদায়কৃত রাজস্ব থেকে শাসন কার্যের সকল ব্যয় মেটানোর

পর উদ্বৃত্ত অর্থ রেজা খানকে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হতো। রাজস্ব সংগ্রহের হার বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতে। এক পর্যায়ে রেজা খান ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তখন তার প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি:) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

ফলাফল

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে বাংলার সমৃদ্ধির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে কুফল ছিল বস্তুত অস্বাভাবিক রকম বেশি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এক অর্থে বাংলার মানুষের শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করেছিল। বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এর ফলাফল বর্ণনা করা হলো—

ক্ষমতাহীন নবাব: দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের দেশ শাসনের দায়িত্ব ছিল নামমাত্র। বাস্তবে নবাবের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অন্যদিকে, কোম্পানির হাতে সব ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হলেও তাদের কোনও দায়িত্ব ছিল না। কর্তৃত্বের এরূপ বিভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলায় অবহেলার দরুন ডাকাতরা গ্রাম-বাংলায় লুণ্ঠরাজ চালাতে থাকে। নবাব ও কোম্পানি কোন পক্ষই এদের শাস্তি করার চেষ্টা করেনি। ফলে অভাব অনটন আর নিরাপত্তাহীনতায় গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হতে থাকে।

কৃষি ও শিল্পের অবনতি: অনৈতিক দ্বৈত-শাসনের ফলে বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলে বহু বিদেশি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এদেশের পণ্য কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু কোম্পানির নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে দেশী ও অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের রপ্তানি আয় তলানিতে নেমে যায়। তখন ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে কমদামী মুর্শিদাবাদী রেশম আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বেশি দামী রেশম শিল্পকে বাঁচাতে তারা আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর মাধ্যমে এদেশীয় কারিগররা বিলুপ্তির মুখে পড়ে।

‘আমিলদারী’-প্রথা: দ্বৈত শাসন-প্রবর্তনের ফলে, বাংলায় ‘আমিলদারী’-প্রথার উদ্ভব হয়। রেজা খান বিভিন্ন জেলার আমিলদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতেন। যেহেতু আমিলদের দায়িত্বের মেয়াদ ছিল স্বল্পদিন, তাই তারা যেভাবেই রাজস্ব বেশি করে আদায় করতো। কারণ জেলার যে জমিদার যত বেশি রাজস্ব দিতে পারতো আমিলরা তাঁদেরকেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিত। এতে করে জমিদাররা ইজারাদারে পরিণত হয়। ফলে বাংলার জনজীবন আমিলদারী ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কৃষক নিপীড়ন: কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে দেশের সম্পদ কমে যায়। সম্পদ পর্যায়ক্রমে ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকায় রাজস্বের হার প্রতিবছর বাড়তে দেখা যায়। এক পূর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব মাত্র চার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে সত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। অতিরিক্ত এই রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানের উপর চাপ আসে। রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফলে অনেক পরগনা হতে রায়তরা আমিলদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় বা পেশা পরিবর্তন করে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর: দিউয়ানি ও দ্বৈত শাসনের চূড়ান্ত পরিণাম ছিল বাংলায় ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’। দ্বৈত শাসনের দায়িত্বহীনতার ফলে বাংলার জনজীবনে অরাজকতা নেমেছিল যেমন একদিকে, অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেষ্টভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে পরপর দু’বছর অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দেয়। ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। এটাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এসময় টাকায় একমণ হতে চালের মূল্য বেড়ে গিয়ে টাকায় তিন সেরে এসে দাঁড়ায়। খোলাবাজারের খাদ্যশস্য বেশি লাভের আশায় কোম্পানির কর্মচারীরা মজুদ শুরু করে। ফলে খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। দলে দলে সাধারণ মানুষ শুধু খাবারের আশায় কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটতে থাকে। তবে কোম্পানির পাশবিক নীতির মুখে এ সময়েও খাজনা মওকুফ করা হয়নি। ইংল্যান্ডের ভয়াবহ র‍্যাক ডেথের মত এই দুর্ভিক্ষের মৃত্যুখাবা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল একঅর্থে ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা। এর ফলে গ্রাম-বাংলা প্রায় জনশূন্য হয়। এই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো ছিল নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, যশোহর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও চব্বিশ পরগণা।

অন্যদিকে বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে বিশেষ ফসলহানি হয়নি। ফলে এখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া ‘নাজাই’ প্রথার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা ভিটে মাটি ছেড়ে পালায়। ‘নাজাই’ প্রথার অর্থ ছিল, কোন একজন রাজস্ব বাকী ফেললে সেই গ্রামের অন্য কৃষকদের সেই রাজস্ব দিতে হতো। এই বিশেষ কারণে ময়মনসুরের ফলে বহু কৃষক মারা যাওয়ায় তাদের বকেয়া রাজস্বের দায়িত্ব জীবিত কৃষকদের উপর বর্তায়। এই চাপ বহন করতে না পেরে বহু কৃষক জমির স্বত্ব ছেড়ে সরাসরি পাইকে পরিণত হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি ও অনাবৃষ্টির ফলে এই ভয়াবহ দুর্ভোগ বাংলার জনজীবনকে গ্রাস করেছিল। এ সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের চিহ্ন বাংলায় প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষের প্রাণহানির পর শেষ পর্যন্ত দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানির রাজস্ব আহরণ থেকে আয়-কমে যায়। তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দেয়। তাই কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বাংলার কৃষি ও শিল্পকে বাঁচাতে নানা উদ্যোগ নিতে দেখা যায় ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এজন্য ইংল্যান্ড থেকে দ্বৈত শাসন লোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যার অংশ হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব আহরণ ও শাসনের দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে নানা কুফল যাচাই করে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে ছিয়াত্তরের ময়মনসুর সম্পর্কিত চিত্রকর্মগুলো দেখবেন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের পর বাংলার দিউয়ানি ও দ্বৈত-শাসন লাভের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় কোম্পানির শাসন। রবার্ট ক্লাইভ এদেশে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। দিউয়ানি ও দেশরক্ষার দায়িত্ব কোম্পানির হাতে থাকায় নামমাত্র বিচার ও শাসনভার নিয়ে অনেকটাই নখদন্ডহীন হয়ে পড়েছিলেন নবাব। সাধারণ মানুষের জন্য দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। কৃষির অবনতি, কৃষক শোষণ ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ সালে দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার পেছনে দায়ী এই দ্বৈত শাসনই। ইতিহাসে এ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের ময়মনসুর নামে পরিচিত। অবশেষে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- কত সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৭ ঘ) ১৭৭০
- বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?
ক) রেজা খান খ) সেতাব রায় গ) নজমুদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ন
- কত সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়?
ক) ১৭৭০ খ) ১৭৭১ গ) ১৭৭২ ঘ) ১৭৭৩
- ছিয়াত্তরের ময়মনসুরে বাংলায় কত লোক মারা যায়?
ক) এক ষষ্ঠাংশ খ) এক পঞ্চমাংশ গ) এক চতুর্থাংশ ঘ) এক তৃতীয়াংশ
- কত সালে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান।
ক) ১৭৭৫ খ) ১৭৭৬ গ) ১৭৭৭ ঘ) ১৭৭৮



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জুলির নানা ব্রিটিশদের রাজকর্মচারী ছিলেন। মায়ের কাছে জুলি ব্রিটিশ শাসনের গল্প শুনছিল। মা বললেন— তখন বাংলা ১১৭৬ সাল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে মানুষ জর্জরিত। কোম্পানির হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়া হলো। উপরোক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর দুই বছর মাঠে কোন ফসল ফলেনি। না খেয়ে মারা যায় বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ। যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে পরিশোধ করতে হলো মৃত্যু মানুষের খাজনা। ফলে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম-বাংলার জনপদ। মায়ের চোখ-ঝাপসা হয়ে আসে। জুলি মাকে থামিয়ে দেয়।

ক. কত সালে ছিয়াত্তরের মঞ্চস্তর হয়?

১

খ. নাজাই কর কী?

২

গ. উদ্দীপকের জুলির মায়ের গল্পের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সে দুর্ভিক্ষের সাদৃশ্য আছে তা বর্ণনা করুন।

৩

ঘ. “দ্বৈত শাসন বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল”— বিশ্লেষণ করুন।

৪

পাঠ-৮.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ পদ্ধতিটির সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মূল্য শব্দ	ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস ও উপ-স্বত্বভোগী
---	------------	--

ভূমিকা: ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় কোম্পানির শাসন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পর ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। তার শাসনকাল নানাবিধ সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এর মধ্যে বেশী উল্লেখযোগ্য। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। এজন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত এক নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব কোম্পানির কাছে উপস্থাপন করেন, যা ১৭৯৩ সালে অনুমোদন পায়। বাংলার ইতিহাসে এই ব্যবস্থা ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সবমিলিয়ে এর প্রভাব ছিল বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

১৭৭২ সালের পর থেকেই ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর পক্ষে কর্নওয়ালিস নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করতেন ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়ীত্ব এলে স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগ করবেন। পরে তারা নিজ স্বার্থে উদ্ধৃত্ত অর্থ জমির উন্নয়নে ব্যবহার করবেন। এটা করা সম্ভব হলে জমি উন্নত হবে। উন্নত জমিতে চাষ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। আর কৃষি উন্নয়ন বাড়লে চাঙ্গা হবে দেশের অর্থনীতি। কর্নওয়ালিস তার ব্যক্তি জীবনে একজন জমিদারের ছেলে ছিলেন। ফলে সহজেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংল্যান্ডে যেমন ভূম্যধিকারী সমাজ কৃষিতে বিপ্লব সাধন করেছিল, তেমনি উপমহাদেশেও অনুগত জমিদার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হবে। তাই তিনি প্রজার দিকে তেমন নজর দিতে চেষ্টা করেননি। উল্টো তিনি এমন এক অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজদের অনুগত থাকবে। আর এমনভাবেই এ শ্রেণী হবে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখার অন্যতম রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

কর্নওয়ালিস যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না। এর আগের গভর্নর হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসনা বন্দোবস্ত (১৭৭২ খ্রি:) চালু করেছিলেন। এতে ভূমি রাজস্ব নিলাম করা হতো। শেষ পর্যন্ত যিনি সর্বোচ্চ দরদাতা হতেন তিনিই জমির মালিক হতেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে নিলাম ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় না হওয়ার পাশাপাশি সময়সীমা থাকায় জমিদারগণ প্রজাপীড়ন করলেও ভূমির উন্নয়ন করেনি। ফলে বছরের পর বছর কৃষকগণ জমি চাষ থেকে বিরত থাকে। এই সব জমি বছর ধরে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। সময়ের আবর্তে এসব জমির দাম কমে যেত। এই কুফল দূর করতে হেস্টিংস জমিদারগণের সাথে ‘একসনা’ ব্যবস্থা চালু করেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুফল হয়নি। এখানেও সরকার, জমিদার ও প্রজাদের অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে কর্নওয়ালিস দশসনা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন (১৭৮৯ খ্রি:)। সাথে সাথে কর্নওয়ালিস এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে স্যার জন শোরের সাথে কর্নওয়ালিসের নানা তর্ক বিতর্ক হয়েছিল।

অবশেষে কোম্পানি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এর অনুমোদন লাভের পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে দশসনাল বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা, ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি হস্তান্তর বা দান করার ক্ষমতাও

লাভ করেছিলেন তারা। অন্যদিকে জমিদারগণ নিজ খুশী মত শর্ত সাপেক্ষে জমি পত্তন বা ইজারা দেয়ার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র শুদ্ধ আদায়ের ক্ষমতা, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা বাদে প্রায় সব ক্ষমতাই চলে যায় জমিদারদের হাতে। নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলেও এই ব্যবস্থায় জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে সক্ষম না হলে জমি নিলামে বিক্রি করার বিধান ছিল। ইতিহাসে এ অনৈতিক নিয়ম ‘সূর্যাস্ত আইন’ নামে পরিচিতি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে সুফলের পাশাপাশি কুফলও ছিল চোখে পড়ার মত। বলতে গেলে এর নামমাত্র সুফলগুলো কুফলের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সুফল

পজমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। তারা ক্ষেত্রবিশেষে জমির উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। এর ফলে জমির উৎপাদন শক্তি ও মূল্য বেড়ে যায়। সরকার প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। ফলে নতুন জমিদারশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট নতুন প্রভাবশালী জমিদারগণ ইংরেজ সরকারের নানা কাজে সহায়তা করে। পাশাপাশি তাদের প্রভাবে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা ক্ষেত্রবিশেষে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এর পর থেকে অনেকটা লোক দেখানো হলেও বাংলার সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় তারা। বিত্তবান জমিদারগণ নিজের সুনাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। পাশাপাশি তারা অনেক জলাশয় ও দীঘি খনন করে। বেশকিছু রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পালা পার্বন ও সামাজিক উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে দেখা যায় জমিদারদের। অন্যদিকে বাংলার গ্রামীণ জীবন সচল হয়ে উঠতে দেখা যায় নানা আয়োজনে। এ সময়েই জমিদার শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে সংযোগের মাধ্যমরূপে কৃষিজমির উপ-স্বত্বভোগী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণি ব্রিটিশদের রাজ্য শাসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। আয় সুনিশ্চিত হওয়াতে কোম্পানির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ধৃত কুফলগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়েছিল।

কুফল

প্রথমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সঠিক জরিপের মাধ্যমে জমি ভাগ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে নিষ্কর জমির উপর বেশি পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি জমির সীমানা নির্ধারিত ছিল না। ফলে পরবর্তীকালে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হতে থাকে যা পুরো ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীকালে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে তার ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়নি। বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হলেও সরকার বর্ধিতাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ প্রজা ও কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি। জমিতে প্রজাদের পুরাতন স্বত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে তারা জমিদারদের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। জমিদার ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তাকে উচ্ছেদ করতে পারতেন। পরিশ্রম করেও কৃষকগণ যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়ায় চরম দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার জন্য অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে বর্ধমানের, নাটোরের, দিনাজপুরের, নদীয়ার, বীরভূমের ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া আর অন্য সব জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্থলে ফড়িয়ারা জমিদার হয়ে এসে রায়তদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। জমিদারীর স্বত্ব ও আয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নায়েব গোমস্তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জমিদারগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করে। শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বটে গ্রাস ধারণ করে বিবর্ণরূপ। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে। জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করে অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় শিল্প-বাণিজ্য পরিত্যক্ত হতে থাকে। ফলে গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প ও শ্রম শিল্প ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বেশিরভাগ মানুষ তখন জমিদারির দিকে ঝুঁকে পড়ায় শেষ পর্যন্ত কৃষি এবং শিল্প প্রায় বিপন্নের দিকে মোড় নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়। উইলিয়াম হান্টারের মতে, “গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর অস্তিত্ব হয় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, না হয় ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন ধনী সমাজের নীচে এ সময় ঢাকা পড়েছে।” এর মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বন্দোবস্তের পর বিভিন্ন জমিদারের নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালে রাজস্ব আইন দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করেন। ১৮৮৫

সালে প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ভারত-পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখবেন।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ :
১৭৮৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি হেস্টিংস কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাগুলো লক্ষ করেন। পরে অন্য অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য এক নতুন প্রকার প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যার সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি। তবে এর মধ্য দিয়ে এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪
---	-------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?

ক) কর্নওয়ালিস	খ) ওয়েলসলি	গ) বেন্টিংস	ঘ) ডালহৌসি
----------------	-------------	-------------	------------
- কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদিত হয়?

ক) ১৭৯২	খ) ১৭৯৩	গ) ১৭৯৪	ঘ) ১৭৯৫
---------	---------	---------	---------
- কর্নওয়ালিসের বাবা ছিলেন-

ক) রাজা	খ) লর্ড	গ) জমিদার	ঘ) সাধারণ প্রজা
---------	---------	-----------	-----------------
- প্রজাস্বত্ব আইন করা হয় কত সালে?

ক) ১৮৮২	খ) ১৮৮৩	গ) ১৮৮৪	ঘ) ১৮৮৫
---------	---------	---------	---------
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত সালে উঠিয়ে দেয়া হয়?

ক) ১৯৪৭	খ) ১৯৫০	গ) ১৯৫২	ঘ) ১৯৫৪
---------	---------	---------	---------
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে-
 - রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়
 - জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়
 - জমিদাররা জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা পায়
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii	খ) i ও iii
গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	---------------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জনৈক ব্যক্তি একটি গার্মেন্টস তার পূর্বের মালিকের কাছ থেকে প্রচুর অর্থমূলে কিনে নিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কর্মচারীদের রাত দিন শ্রম দিতে বাধ্য করেন। তাদের বেতন আগের তুলনায় কমে গেছে। তাদের অনেকে অতিরিক্ত শ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ পালিয়ে যেতে থাকে গার্মেন্টস ছেড়ে। একটা সময় ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন-

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ১
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনো করা হয়েছিল? ২
- এ বন্দোবস্তের ফলে লাভবান হয় কারা উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করুন। ৩
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৮.৫

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলো জানতে পারবেন;
- প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কেনো ব্যর্থ হয়েছিল তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মূল্য শব্দ

স্বত্ববিলোপনীতি, লাখেরাজ সম্পত্তি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ধর্মীয় স্বাধীনতা



ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের প্রায় এক শতক পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের অংশগ্রহণে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণের পাশাপাশি সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করে এদেশীয় মানুষকে। পাশাপাশি তারা যখন ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাতের চেষ্টা করে তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ভারতীয় সেনারা। অনেকগুলো কারণ এই মহাবিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তার সময়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, বাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী প্রভৃতি অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে দেখা যায়। এই স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। তারা সুযোগ বুঝে এই নীতির মাধ্যমে কর্ণাটের নবাব ও তাজপোরের রাজার দত্তক পুত্রকে সাম্রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পাশাপাশি রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ব্রিটিশের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এই আত্মসন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়েছিল। এসব ঘটনায় জমিদার থেকে শুরু করে স্বদেশী রাজারা অনেক ক্ষেপে গিয়েছিলেন ব্রিটিশদের উপর। অন্যদিকে ডালহৌসি নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার পর পর দিল্লির সম্রাট পদ বিলুপ্ত করেন। সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও এর ফলে চরম ক্ষিপ্ত হন।

অর্থনৈতিক কারণ

চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা অরাজকতা শুরু হয়। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় কৃষি ও শিল্পকে। পাশাপাশি দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পাশ করা হয় হঠকারি সব আইন। এই আইনগুলোর প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারা সুযোগ বঞ্চিত হয়ে সামাজিকভাবেও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। অন্যদিকে কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর এ অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ, সোনা রূপাসহ মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করে। এর ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। নানা স্থান থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশরা। সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকুরি আইন প্রবর্তিত হয়। ফলে দেশের অনেক মানুষ বেকার ও কর্মহীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আর সিপাহী জনতার রোষ এক্ষেত্রে শেষ প্রদর্শনী হয়ে দেখা দেয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

১৮ শতকের শেষার্ধ্বে এবং ১৯ শতকের প্রথমভাগে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার প্রভৃতি এক অর্থে কিছুটা জনকল্যাণমূলক ছিল। তার পরেও জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলিম সমাজের কেউই এটা সেভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন এগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত। এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ

সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নানা বৈষম্য ছিল। বিশেষত, পদবি, বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও ছিল বেশ কম। অন্যদিকে পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল নানা দিক থেকে। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল যা একটা পর্যায়ে এসে দাবানলের রূপ নেয়।

সিপাহী বিপ্লব তথা তখনকার বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। কিন্তু হিন্দু সিপাহীদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের ব্যবহারের জন্য ‘এনফিল্ড’ রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। তখন সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল টোটা গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও প্রচার করা হয় যে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই গুজবের এক পর্যায়ে দুই ধর্মের সৈন্যরা ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা নানা স্থানে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইংরেজদের নানা অরাজকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী। দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাত, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ফলে এক পর্যায়ে এসে এই আন্দোলন অনেকটা সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল। সবমিলিয়ে আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।



বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা

বিপ্লবীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে সিপাহী জনতার এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। বাস্তবে অনেক নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করা হয় বিপ্লব। এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সৈনিকদের বেশির ভাগ যুদ্ধে সরাসরি শহিদ হয়েছিলেন। তাদের যারা পরাজিত বা বন্দী অবস্থায় ধরা পড়েন তাঁদের সরাসরি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিপ্লব ব্যর্থ হলে শেষ মুঘল সম্রাট সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসন দেয়া হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধের পরাজয় আসন্ন দেখে আগুণে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সাধারণ সৈনিক বিপ্লবীদের উপর নেমে এসেছিল অমানবিক নির্যাতনের খড়গ। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের আশেপাশের অনেক গাছে সরাসরি অনেকদিন ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক বিপ্লবীর লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ-

১. বিপ্লবী সৈনিকদের সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একক নেতৃত্বের অভাব ছিল।
২. তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের অভাব শেষ পর্যন্ত আন্দোলন সফল হতে দেয়নি।
৩. ইংরেজদের থেকে সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি এখানে অনেকটাই নীরব ছিল। দেশের অধিকাংশ রাজা, জমিদার, সৈন্যদের একটি অংশের অসহযোগিতা একে ব্যর্থ করে দেয়।
৪. ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল, উন্নতমানের অস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের জয়ী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব

১. অীভষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম না হলেও ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যাবে না। বস্তুত এর ফলেই ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটেছিল।
২. ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।
৩. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল।
৪. নতুন ঘোষণা পত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৫. ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় গুরুত্ব হচ্ছে এরপর থেকে বিদ্রোহ আর থেমে থাকেনি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ নতুনভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। নানা স্থানে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি। এইসব মিলিত আন্দোলনের ফল হিসেবেই ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।
--	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ:
১৮৫৭ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসৃত নীতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আর ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তারই বহিঃপ্রকাশ এই সংগ্রাম। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫
---	-------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় কত সালে?
(ক) ১৮৫৭ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯৪৭
- ২। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে মিশ্রিত ছিল- (অনুধাবন)
i) গরুর চর্বি ii) মহিষের চর্বি iii) শুকরের চর্বি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৩। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল-
i) নেতৃত্বের অভাব ii) বিচ্ছিন্ন আন্দোলন iii) উন্নত সমরাস্ত্র ও সুসজ্জিত বাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা কলিঙ্গ যুদ্ধ, সম্রাট অশোকের চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার তথা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিহার করেন।

৪। উদ্দীপকে সম্রাট অশোকের রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহারের সাথে ভারত ব্রিটিশ শাসনামলে কার ঘোষণার মিল দেখা যায়?

(ক) রাজা পঞ্চম জর্জ

(খ) রানী ভিক্টোরিয়া

(গ) রানী মেরী

(ঘ) রাজা ২য় চার্লস

৫। উক্ত ঘোষণার পর ভারতে

i) ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয়

ii) স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয়

iii) ভারতীয়, ব্রিটিশ সমঅধিকার নিশ্চিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ইকবাল ও শাহিন মামার সাথে বাহাদুর শাহ পার্কে বেড়াতে আসে। মামা জানান যে এ পার্কটি এদেশের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষী, চাচার বক্তব্য শুনে নীনা এ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরদিকে মীরা মনে করে ঐ সংগ্রাম দানা বেঁধেছিল দেশের শিল্প কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

ক. মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন?

১

খ. এনফিল্ড রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল কেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগ্রামটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।

৩

ঘ. ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অর্থনৈতিক কারণই মূলত দায়ী- ব্যাখ্যা লিখুন।

৪

পাঠ-৮.৬

বাংলায় সংস্কার আন্দোলন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলার সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রেখেছেন তা জানবেন।

	মূখ্য শব্দ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী
--	---



ভূমিকা: আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি:) প্রভাব এসে পড়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় ‘রেনেসাঁস’ বা নবজাগরণের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। বাংলার সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা, যা ইঙ্গিত করে এক নবযুগের। এই নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাভাবিক তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

রাজা রাম মোহন রায়

উনিশ শতকে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত (ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এভাবেই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় প্রথম নবজাগরণ বা ‘রেনেসাঁসের’ উদ্ভব ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাহ্বান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ সময় বাংলার প্রবাদ পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুফি মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন কিছুকাল তিব্বতে বসবাস করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ‘তুহফাত-উল-মোয়াহিদীন’ (একেশ্বরবাদ সৌরভ) ‘মানাজারাতুল আদিয়ান’ (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি ‘সম্বাদ কৌমুদী’, ‘মিরাত-উল-আখবার’ ও ‘ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন’ নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন। রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করেন। নিজ চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে



রাজা রামমোহন রায়

প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তখনকার হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করে তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘আত্মীয় সভা’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘এ্যাংলো হিন্দু কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইংরেজি, দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য আবেদন করেন। ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন ডিরোজিও। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিও তাঁর স্কুল শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষকের আদর্শ ধারণ করে। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ডিরোজিওর অনুসারী ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা দেশবাসীকে বার বার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমির তরুণদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গৌড়াপন্থী খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। ডিরোজিও এবং তার ছাত্রদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতেও সমাজ, ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশিত হয়। যে কারণে তারা রক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বারবার। বাংলার ‘রেনেসাঁস’ যুগের এই প্রতিভাবান তরুণ মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তার বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়, মা ভগবতীদেবী। দারিদ্রের কারণে শৈশব থেকে শিক্ষাজীবন তেমন সুখকর ছিল না তাঁর। কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে দাড়িয়ে-বসে পড়ালেখা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকে লেখা সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে। অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। উদার ও সংস্কারমণ্ডিত বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যাসহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী, মানবতা বিরোধী সব ধরনের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য ‘সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট’ প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৮৯১ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ

ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম হতাশার কাল হিসেবে ১৯ শতকের কথা বলা যায়। বিশেষ করে এসময়ে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে। তারা ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিমুখ হওয়ার কারণে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে দারিদ্রের নিম্নতম ধাপে নেমে আসে। এই অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কোলকাতা মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। আবদুল লতিফ প্রথম বারের মত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চালান। তিনি এর প্রয়োজন এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ‘মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল’ শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু ও বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ। বলতে গেলে তার প্রচেষ্টায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায় নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল।

সৈয়দ আমির আলী

১৯ শতকের শেষভাগে এসে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন সৈয়দ আমির আলী। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন। সৈয়দ আমির আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিঙ্কস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এরপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সৈয়দ আমির আলী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমির আলী কোলকাতা মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন। মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত আমির আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে— ‘The Spirit of Islam’ এবং ‘A Short History of the Saracens’। এতে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সৈয়দ আমির আলী ১৯২৮ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

বেগম রোকেয়া

বাংলাদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন অগ্রদূত। ব্রিটিশ আমলে নারীরা ইংরেজ আমলে বেশ পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই

বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যিনি আহবান জানান তিনি বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতননেসা সাবেরা চৌধুরী। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশীন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুননেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তার সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা- বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন সাবলীল লেখনীর মাধ্যমে। বেগম রোকেয়ার লিখিত গ্রন্থ অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময় নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলার নারী জাগরণের এই অগ্রদূত ১৯৩২ সালে কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।



শিক্ষার্থীর কাজ

নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর জীবন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।



সারসংক্ষেপ :

আঠারো শতকে বাংলায় ‘রেনেসাঁস’ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। তখনকার নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাভাবিক তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। অন্যদিকে নারীমুক্তির জন্য কাজ করেন বেগম রোকেয়া।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। এ্যাংলো হিন্দু কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	খ) রাজা রামমোহন রায়	গ) হাজী মুহম্মদ মুহসিন	ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ
---------------------------	----------------------	------------------------	---------------------
- ২। রাজা রামমোহন আত্মীয়সভা গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)

ক) পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য	খ) সামাজিক সংস্কার সাধন কল্পে
গ) ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য	ঘ) জনগণকে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য
- ৩। ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) একুশ	খ) বাইশ	গ) তেইশ	ঘ) চব্বিশ
---------	---------	---------	-----------
- ৪। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে নিচের কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

ক) রাজা রামমোহন রায়	খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	গ) হেনরী লুই ডিরোজিও	ঘ) প্যারিচাদ মিত্র
----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------
- ৫। বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) ভাগলপুর	খ) রংপুর	গ) বগুড়া	ঘ) দিনাজপুর
------------	----------	-----------	-------------
- ৬। বেগম রোকেয়ার সময়কালে মেয়েরা কেমন ছিল? (অনুধাবন)

ক) উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন	খ) লাজুক প্রকৃতির	গ) অত্যন্ত পর্দানশীন	ঘ) ভীরু প্রকৃতির
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

করটিয়া গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হঠাৎ বদলে যাচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ সেখানকার সমাজ বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। সাব্বির, মাসুম, ইফতেখার, মোহাইমিন এবং সুশান্ত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে নারীদের নানা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে নাবিলা। ব্রিটিশ আমলে এমনি অনেকের ভূমিকায় বদলে গিয়েছিল বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন-

১. বাংলার নবযুগে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কি ছিল? ১
২. ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট সম্পর্কে কি জানেন? ২
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩
৪. নারী মুক্তিতে বেগম রোকেয়ার অবদান কি? ৪

পাঠ-৮.৭ বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা বলতে পারবেন এবং
- ফরায়েজি মতবাদ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীর, নীল বিদ্রোহ ও ফরায়েজি আন্দোলন
-----	------------	---



ভূমিকা: বাংলার অভাবী কৃষকের জীবনে প্রাচুর্য ছিল না কখনও। তারা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতে পারত কোনভাবে। কিন্তু সে অবস্থাও নষ্ট হয় ১৭ শতক থেকে। ১৭ ও ১৮ শতকে ইংরেজ বণিক শ্রেণির আত্মসন কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ উৎসব। ইংরেজরা শুরুতে ধ্বংস করেছিল গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয় বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ। ফলে তীব্র শোষণে অসহায় কৃষক সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষাবধি থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের। যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়।

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ

ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বাংলার সাধারণ অধিবাসী। এরা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি দল, যারা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠী পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হতে এবং অস্ত্র ধারণ করতে হয়। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ। আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বিদ্রোহের শুরু। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে। বাংলার নবাব মীর কাসিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তখন তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা যুদ্ধ করেছিল। পরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখে। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তাদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। অন্যদিকে তারা নিজেদের সাথে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র রাখতেন। প্রথম দিকে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিলেন অনেকটাই স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করলে তা এক পর্যায়ে সংঘাতে রূপ নেয়। ১৭৬০ সালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। এ অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীদের বহু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীরা অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং কোম্পানির বহু কুঠি লুণ্ঠ করে। অন্যদিকে ফকির মজনু শাহর



মজনু শাহের বিদ্রোহ

যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি, অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবানশাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী তথা তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের (তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া) জোয়ার চলছিল। পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৯ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার ওয়াহাবিরাও তিতুমীরের নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শাহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তিতুমীর হজকরার জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। তিনি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান, বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফলে জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। প্রথম দিকে তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন।



মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন ইতিহাস খ্যাত তাঁর 'বাঁশের কেলা'। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠে শাসক-শোষক, জমিদার শ্রেণি। জমিদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার তিতুমীর এবং তার অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। এক পর্যায়ে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক। তিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে বিশাল সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেলা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। গোলায় আঘাতে বাঁশের কেলা উড়ে যায়। এ ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। এই যুদ্ধে তিতুমীরের ৫০ জন অনুসারী নিহত হন। গোলাম মাসুমসহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

নীল বিদ্রোহ

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিশেষ করে ১৮ শতকে নীল ব্যবসা খুবই লাভজনক হয়ে উঠেছিল। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা বাংলার কৃষককে নীল চাষে বাধ্য করে। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকদের সবথেকে উৎকৃষ্ট জমিটাই বেছে নিতো। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো। ফলে এই সব অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে এক দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। তাছাড়া প্রথম দিকে ইংরেজরা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করা। পরের দিকে তা বন্ধ করে দিলে নীল চাষ কৃষকদের জন্য

অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। এ অবস্থায় নীলকররা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোদাঁড় প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীল চাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। ফলে নীল চাষিদের বিদ্রোহ হয়ে ওঠে সময়ের দাবি, চরম অত্যাচার আর শোষণে বিপর্যস্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই।

বাংলার এ অঞ্চলে যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলীতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ে এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো বাংলার সংগ্রামী বিদ্রোহী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ‘ইন্ডিগো কমিশন’ বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে কৃত নানা সংস্কারের প্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তিকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে নীলচাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি শব্দটি আরবি ‘ফরজ’ (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যাঁরা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরিয়ত উল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। শরিয়ত উল্লাহ যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। এই মৌলনীতিগুলো হচ্ছে— ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য হাজী শরিয়ত উল্লাহ মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।



হাজী শরিয়ত উল্লাহ

বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়ত উল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস এবং তাঁর নেতৃত্বগুণ নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে এবং নানা ধরনের কর আরোপ করে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশ জুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদার শ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে শরিয়ত উল্লাহ প্রজাদের রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মতো পণ্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন। পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই অঞ্চলগুলোতে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ ফলে কৃষকরাও হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। দুদু মিয়া তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল লিখুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম সোচ্চার হয়েছিল নানাবিধ সামাজিক সংস্কার ও প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। প্রাথমিক পর্বে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় প্রথা ও কুসংস্কার বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর অধিকার আদায়ের নিমিত্তে আন্দোলন শুরু করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী। এমনি অনেক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছিল ভারত ছাড় আন্দোলন, যার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কতদিন চলেছিল? (সময়কাল অনযায়ী)

ক) ১৭৬০ থেকে ১৭৭১	খ) ১৭৬০ থেকে ১৮০০	গ) ১৭৭৭ থেকে ১৮০০	ঘ) ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রি:
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------
- ফকিরদের বিদ্রোহী দলের নেতা কে ছিলেন—

ক) বলাকি শাহ	খ) চেরাগ আলী শাহ	গ) মজনুশাহ	ঘ) মাদার বকস
--------------	------------------	------------	--------------
- তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী?

ক) তাহরিক-ই-মুহাম্মদিয়া	খ) ফরায়েজি	গ) খিলাফত	ঘ) ওয়াহাবি
--------------------------	-------------	-----------	-------------
- তিতুমীরের দুর্গ কিসের তৈরি ছিল? (অনুধানব)

ক) ইটের	খ) মাটির	গ) বাঁশের	ঘ) টিনের
---------	----------	-----------	----------

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম শিকদার ২০১৬ সালে রক্ত বরা মার্চের এক শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তারা ইতিহাসের একজন বীর যোদ্ধার আত্মত্যাগ থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সেই যোদ্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তায় তৈরি কেল্লা তৈরি করে। আর ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহীদ হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন।

- | | |
|---|---|
| ক. কোন গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন? | ১ |
| খ. তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ব্যাখ্যা করুন। | ২ |
| গ. ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে উদ্দীপকের সাথে মিল রেখে পাঠ্য বইয়ের সবচাইতে বিখ্যাত যোদ্ধাকে তুলে ধরুন। | ৩ |
| ঘ. সকল স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আত্মত্যাগ হবে অনুপ্রেরণার উৎস- এর সপক্ষে যুক্তি দিন। | ৪ |

পাঠ-৮.৮ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয় জানতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কাদের ভূমিকা প্রধান ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেসের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্মসূচি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ABC	মূখ্য শব্দ	কংগ্রেস, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন', ভারত সভা ও লর্ড লিটন
-----	------------	---

 **ভূমিকাঃ** ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশের সময়টা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের উষ্মালগ্ন। ব্রিটিশ নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ও পরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। এ সবের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তবে তাদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হতে দেখা যায় এদেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও। এক বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ভারতীয় জনগণের নায্য অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠন ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব সমিতি শিক্ষিত অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুকরণে মুম্বাই ও মাদ্রাজে অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠে। শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশ শাসনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের নায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এ সব প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

বাংলার নেতা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সত্তার বজায় রাখা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরীসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন যখন চলছিল সেই সময়ের মধ্যেই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সময়কালের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের দরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা একুশ থেকে উনিশে আনা হলে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আখা, দিল্লি, আলীগড়, লাহোর, কানপুর, বেনারস ও অমৃতসরসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। এ বিক্ষোভের পরপরই শুরু হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের বর্ণ বৈষম্যমূলক অস্ত্র আইন, সাম্রাজ্যবাদী আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জাঁকজমকপূর্ণ দিল্লি দরবার ইত্যাদিও অসন্তোষের কারন হয়েছিল। লর্ড রিপনের সময়কার ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক ধীরে ধীরে একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ বিতর্কের ফলে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এক নিদারুণ বর্ণ বৈষম্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক আইন বলে ভারতে ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচারকার্যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ক্ষমতা পাবেন বলে স্থির হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য সি.পি. ইলবার্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলোর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও ভারতীয় সেনস জজরা ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবেন। এটা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ শুরু করে। সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুটা আপোষ করেন এবং স্থির হয় যে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষেত্রে জুরী মণ্ডলীর উপস্থিতি লাগবে এবং তাদের অর্ধেক হতে হবে শ্বেতাঙ্গ। বর্ণবাদী এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রস্তুত করেছিল।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

শিক্ষিত হিন্দুরা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এলবার্ট হলে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে তখন। বিশেষত, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ দিকে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা ভীত হয়। ভারতীয়দের দাবি ও আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য সরকার মনোযোগী হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলান অক্টেভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করেন। দুজন মুসলমানসহ সত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছিলেনঃ

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা দেশ সেবায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা;
২. জাতি ধর্ম আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করা;
৩. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে বের করা এবং
৪. রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরবর্তী বছরের কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন। শুরুতে অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে যোগদান করেন। কিন্তু এর কর্মসূচি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সহ প্রমুখ মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সাথে জড়িত হতে নিষেধ করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যপন্থী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিষয়গুলো আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান হতো। কিন্তু সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ও সহযোগিতার এ নীতি অচিরেই পরিবর্তিত হতে থাকে। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে ভারতের জন্য স্বরাজ বা স্বাধীনতার আন্দোলন করে এবং সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও এই কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মত।

	শিক্ষার্থীর কাজ	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ:
ভারতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায় এর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক দলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮
---	-------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক দল কোনটি?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | খ) নিখিল ভারত মুসলিমলীগ |
| গ) ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন | ঘ) ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি |

২। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কী ছিল?

- i. দেশ সেবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন
 - ii. ধর্মীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
 - iii. আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে বিরোধী ব্যক্তিত্ব কে?

ক) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

খ) উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

গ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান

ঘ) এলান অক্টাভিয়ান হিউম



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটি জাতি ক্রমশই অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। এহেন অধিকার সচেতনতা যাতে বিপথগামী না হয় এজন্য শাসকগোষ্ঠী উক্ত জাতির শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করে। এ সময় শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছু কাল এ দলটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হলেও একটি সম্প্রদায় কোন অধিকার না পেলে তারাও একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে এ নতুন দলটির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাপক।

ক. কোন বিভক্তিকে ‘বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ’ বলা হয়?

১

খ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলীর অবদান ব্যাখ্যা করুন।

২

গ. বর্ণিত প্রথম রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

৩

ঘ. ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৪

পাঠ-৮.৯

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.): রদ ও প্রতিক্রিয়া



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তা জানতে পারবেন;
- কেন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হল এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন ও
- এতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ, হিন্দু-মুসলমান, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও লর্ড কার্জন
--	------------	--



বঙ্গভঙ্গের পটভূমি:

মুঘল আমলের ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে ‘বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি’ নামে একটি প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হয়েছিলো। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় সংগঠিত দূর্ভিক্ষ ও যথাসময়ে সূষ্ঠ ত্রাণ না পৌঁছানোর কারণে অনুসন্ধান গঠিত কমিটি মত প্রকাশ করে যে, প্রদেশটির ভৌগোলিক বিশালতাই এই দূর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। কেননা, তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের আয়তন ছিলো এক লক্ষ উননব্বই হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিলো সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ফলে একজন প্রশাসকের পক্ষে এত বড়ো একটি প্রদেশে সূষ্ঠভাবে শাসনকার্য পরিচালনা সত্যিই কঠিন ব্যাপার ছিলো। এছাড়াও কমিটি বাংলার প্রশাসনিক উন্নয়নে আরো কিছু সংস্কারের সুপারিশ করে। অবশ্য বাংলা বিভক্তির দাবি অনেক পুরোনো কারণ ইতিপূর্বে স্যার চালস্ গ্রান্ট ১৮৫৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেছিলো। লর্ড ডালহৌসিও ১৮৫৪ সালে বাংলা বিভক্তির পক্ষে মত দেন। এছাড়াও ১৮৬৬ সালে ভারত সচিব লর্ড নর্থকোট প্রশাসনিক দুর্বলতা দূর করে বাংলা প্রদেশের সীমানা রদবদলের কথা বলেন।

একথা ইতিহাস স্বীকার করে যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দান করেছে বাংলা ও বাঙালি জাতি। ১৮৯৮ সালে ভারতের বড়লাট হিসেবে আগমনের অল্পকালের মধ্যেই লর্ড কার্জন বুঝতে পারেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি জাতির এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা এক সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জন্য বিপদজনক অবস্থায় পরিণত হতে পারে। সুতরাং বাংলা ও বাঙালি জাতিকে দুর্বল করতে ‘ভাগ কর শাসন কর নীতি’ এর আবারো সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে। অবশ্য বাংলা বিভক্ত করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা ছাড়াও লর্ড কার্জনের কাছে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কারণও গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ১৯০৪ সালে পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন শেষে বুঝতে পারেন যে, ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা অবহেলিত হয়ে আসছে। বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী কোলকাতা হওয়ায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। তাঁর আশা ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন:

লর্ড কার্জন তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সির পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ নামে প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ভারত সচিব ব্রডারিক পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে ১০ জুলাই একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন এবং ১৬ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হবে বলে ঘোষিত হয়। ঢাকাকে এই নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী এবং চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসময় এই প্রদেশের আয়তন ছিলো ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিলো প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া:

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও এর বাস্তবায়ন শুরু থেকেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে ছিল। নতুন প্রদেশ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা একজোট হয়ে কাজ করেন। এমনকি তারা নানা শ্রেণি পেশার মানুষকে বুঝাতে থাকেন যে, বঙ্গভঙ্গ কোলকাতার হিন্দুদের জন্য অভিশাপ বয়ে আনবে। তারা পত্রপত্রিকায়, সভা-সেমিনারে বক্তৃতায় একে বাঙালি বিরোধী,

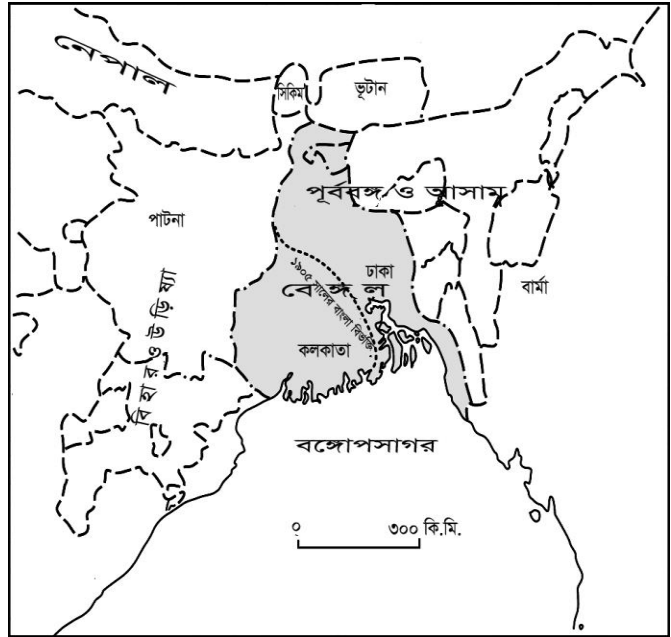
জাতীয়তাবাদী বিরোধী, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করতে থাকেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ লাভ করতে থাকে। ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় বলা হয়, বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতির সম্মুখে এরূপ বিপর্যয় আর কখনো আসেনি। ১৩ জুলাই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ‘সঞ্জীবণী’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বাণীতে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন- ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ‘বয়কট’ যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। মূলত, বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত ছিল কোলকাতার হিন্দুদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা। আইন আদালতসহ নানাবিধ হিন্দু পেশাজীবী মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বাংলা। তাই হিন্দুরা এরকম একটা ফলবান বৃক্ষকে হাতছাড়া করতে চায়নি। এজন্যই তারা প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর না হওয়ার জন্য এবং পরবর্তীতে তা রদ করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া:

বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল বলে মুসলমানরা একে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ছিল। ঢাকায় ছোটলাট হিসেবে আগমন করলে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ লিখেছেন, এর মাধ্যমে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরাত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণ ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, তাদের কল্যাণের জন্যই এই বিভক্তি। পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় তারা সরকারের নিকট থেকে বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও এখানকার দরিদ্র ও বেকার যুবকেরা উপযুক্ত চাকরি পেত না। কিন্তু নতুন প্রদেশে তারা চাকরি পাচ্ছে। সুতরাং পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানদের সমর্থন যে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গভঙ্গ রদ:

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর না রাখার দাবিতে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ছিল মুসলমানদের তুলনায় বেশি। তারা কলকাতার বর্ণ হিন্দুদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এটা কার্যকর থাকলে তাদের বেশি ক্ষতি হবে। কারণ, নতুন প্রাদেশিক রাজধানীতে অবশ্যই শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং সেখানে নতুন পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। ফলে কলকাতার ব্যবসায়ীদের একক কর্তৃত্ব খর্ব হবে ও মুনাফা কম হবে। আইনজীবীরা দেখলেন, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়বে কারণ তাদের বেশিরভাগ মক্কেলই ছিল ঢাকার জনগণ। এরকম ছোট বড় ক্ষতির কথা চিন্তা করে কলকাতার নানা শ্রেণি পেশার মানুষ গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আবার বঙ্গভঙ্গ এমন এক সময় কার্যকর হয় যার অনেক আগে থেকেই স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের ঘোষণা যেন সেই আন্দোলনে রসদ যোগাল। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে বিপুলসংখ্যক তাদের সর্বাত্মক এমনকি সম্ভ্রাসবাদী কার্যক্রমও শুরু করল। ১৯০৮ সালে এরকমই আন্দোলনে যোগদান করায় প্রাণ দিতে হয় ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি প্রমুখকে। উল্লেখ্য যে, শুরুতে অনেক মুসলমান যুবকও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু যখন হিন্দুরা তাদের দেবী কালীর



১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ

নামে শপথ গ্রহণ করে এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত চালু করে তখন থেকে মুসলমানরা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। তবে একথা ঠিক যে, ইংরেজরা বিশেষ করে লর্ড কার্জন বাংলা বিভক্তি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এমন কি নানারকম পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। ফলে হিন্দুদের আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু ১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় হিসেবে ভারতে এসে ঘোষণা দেন যে, আগামী বছর ব্রিটিশ সম্রাট ৫ম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারতে এসে দিল্লিতে দরবার করবেন

এবং মীমাংসা করবেন। তাদের আগমন মসৃণ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে লর্ড হার্ডিঞ্জ তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোষ নীতি গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা ১৯১২ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল ও গুরুত্ব:

বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা যে হিন্দুদের উল্লসিত করবে এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা ছিল তাদের আন্দোলনের একমাত্র ও শেষ দাবি। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার ব্রিটিশদের রাজনীতি জ্ঞানের ব্যাপক প্রশংসা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পটুভি সীতারাম লিখেছেন, “১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। আর বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।” অন্যদিকে বঙ্গের মুসলমানরা এতে চরমভাবে ব্যথিত হয়। কারণ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে উল্লতির যে লাল সূর্য আলো দান করতে শুরু করেছিল তা দুপুরের আগেই অস্ত যেতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা, মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন যে, এ অঞ্চলের মুসলমানদেরকে তাদের রাজভক্তির প্রতিদানে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এরকম মন্তব্য ছিল প্রায় বাংলার প্রতিটি মুসলমানের। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মান্বিত হয়েছিলেন বোধহয় নবাব সলিমুল্লাহ। এব্যাপারে তিনি এত আঘাত পেয়েছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। ক্ষোভে দুঃখে রাজনীতি থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তবে রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও মুসলমানদের উল্লতির চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলায় এসে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও পদ্মা নদীর উপর একটি রেল ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। যাইহোক ক্ষুদ্র হলেও ব্রিটিশদের এ ক্ষতিপূরণ পূর্ববাংলার আকাঙ্ক্ষা কিছুটা হলেও পূরণ করেছিল। কেননা পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার স্বাধিকার ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা।

শিক্ষার্থীর কাজ		বঙ্গভঙ্গের কারণগুলো উল্লেখ করুন।	
কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল?	বঙ্গভঙ্গের পর সৃষ্ট নতুন প্রদেশের গঠন উল্লেখ করুন।	বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের কী লাভ হয়েছিল?	বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

সারসংক্ষেপ :
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ ভারতের একটি অন্যতম রাজনৈতিক এবং অনন্যসাধারণ ঘটনা। তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল ‘বাংলা প্রদেশ’। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ নামে নতুন এক প্রদেশ সৃষ্টি করেন যা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের পেছনে কতগুলো যৌক্তিক কারণ থাকলেও এখানে ব্রিটিশদের ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতির সফল বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও বর্ণ ও সামন্ত হিন্দুরা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা এটাকে ‘বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ’ বলে প্রচারণা চালায়। হিন্দুদের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গভঙ্গ কত সালে হয়েছিল?

(ক) ১৯০৫

(খ) ১৯১৫

(গ) ১৮০৫

(ঘ) ১৯১১

২। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে?

(ক) ১৯১১

(খ) ১৯২৩

(গ) ১৯০৭

(ঘ) ১৯২১

৩। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়?

- i. ঢাকা ii. জাহাঙ্গীরনগর iii. চট্টগ্রাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ঢাকা (খ) জাহাঙ্গীরনগর (গ) কলকাতা (ঘ) চট্টগ্রাম



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাংলাদেশে মধুপুর নামে বিশাল আয়তনের ঘনবসতিপূর্ণ এক ইউনিয়ন রয়েছে, যেখানে হিন্দু-মুসলিমসহ অসংখ্য মানুষ বসবাস করে। তবে আদমশুমারী অনুযায়ী সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাই বেশী। সেকারণে এখানকার সবকিছুই তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। ইউনিয়নটি প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এবং প্রশাসনিক সহায়তার অভাবে অনেকেই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সদৃশতা থাকলেও একক প্রশাসনের পক্ষে এতবড় ইউনিয়নের প্রত্যেকের নিকট দ্রুতগতিতে সাহায্যসেবা পৌঁছে দেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে মধুপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু সুবিধাভোগীগোষ্ঠীর আন্দোলনের মুখে প্রশাসনকে উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়।

- ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১
খ. বঙ্গভঙ্গ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বঙ্গভঙ্গের ফলাফলসহ হিন্দু-মুসলিম প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূত্রধরে ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ও ফলাফল লিখুন। ৪

পাঠ-৮.১০

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ(১৯০৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- আরো জানতে পারবেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলাফল এবং হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া



মুখ্য শব্দ

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, স্যার সলিমুল্লাহ ও বঙ্গভঙ্গ



মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি

বিংশ শতাব্দির শুরুতে ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের শুভোদয় ঘটে। যা হিন্দুদের মধ্যে আরো আগে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি চড়াই-উড়াই পেরিয়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের মধ্যে দল গঠনের মনোভাব জাহত হয় ১৮৮৫ সালে অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম কর্তৃক ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুপ্রাণিত করতে পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট একদল শিক্ষিত যুবক জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন মুসলমানদের অন্যতম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এই বলে যে, হিন্দুরা কখনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে না। এজন্য তিনি আলীগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন বেগবান করার প্রয়াস নেন। যা ‘আলীগড় আন্দোলন’ নামে পরিচিত। তিনি ও তৎকালীন অন্যান্য মুসলমানরা বুঝতে সক্ষম হন যে, মুসলমানদের অবশ্যই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ বিরোধী মনোভাব থেকে সহযোগিতা নীতি মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম এবং অধিক কার্যকর একটি মাধ্যম। এর জন্য সবার আগে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

শিক্ষা ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৯৭৭), ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৮) প্রভৃতি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে বছরে অন্তত একবার ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হতো। ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। বঙ্গভঙ্গের গৌড়া সমর্থক ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ কংগ্রেস সমর্থকদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ মোকাবেলা করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হিন্দুরা যেমন বঙ্গভঙ্গ হলে তাদের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে অন্যান্যদের তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ করছে তেমনি ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুরা কখনই মুসলমানদের উপকারে আসবে না। মুসলমানদেরকেই তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। ৩০ ডিসেম্বর সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ভিকার-উল-মূলক। এই অধিবেশনেই নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের একটি পৃথক দল গঠনের প্রস্তাব করেন এবং তাতে সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান। ফলে ঐ অধিবেশনেই আগা খানকে সভাপতি, সলিমুল্লাহকে সহ-সভাপতি, নবাব মহসিন উল মূলক এবং নবাব ভিকার উল মূলক কে যুগ্ম-সম্পাদক করে ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ গঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নবাব সলিমুল্লাহ এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী দলটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। যথা:

- ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বাড়ানো এবং সরকারের প্রতি মুসলমানদের কোন রূপ ভুল ধারণা হয়ে থাকলে তা যথাসম্ভব দূর করা।
- খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানো ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের নিকট পেশ করা।
- গ) মুসলিম লীগের উপর্যুক্ত লক্ষ্যের কোন রূপ ক্ষতি সাধন না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উল্লেখ্য যে, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগের আলাদা দুটি শাখা স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামে কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করতে চৌধুরী কাজেম উদ্দীন সিদ্দিকীকে সভাপতি ও সলিমুল্লাহকে সম্পাদক করে অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। অন্যদিকে ১৯০৯ সালের ২১ জানুয়ারি প্রিন্স জাহান্দার মির্জাকে সভাপতি ও সৈয়দ শামসুল হুদাকে সম্পাদক করে মুসলিম লীগের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কমিটি গঠিত হয়।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া:

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের টানা পোড়েন সবচেয়ে জোরালোভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। বঙ্গভঙ্গে যেমন হিন্দু নেতারা বিরোধিতা করেছে তেমনি তারা বিদ্বেষের হাসি হেসেছেন মুসলিম লীগ গঠনের সংবাদে। তাদের আশংকা ছিল যে, যদি মুসলমানরা কোন দল গঠন করতে পারে তাহলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁরা আলাদাভাবে মূল্যায়িত হতে পারে। হিন্দুদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকাগুলো পরবর্তী দিন বিদ্বেষপাতক সংবাদ প্রকাশ করে। যেমন- সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় মুসলিম লীগকে “সলিমুল্লাহ লীগ” বলে ঘোষণা করে এবং এটিকে ব্রিটিশ সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি এটি বেশীদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করা হয়।



নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

ফলাফল ও পরবর্তীতে প্রভাব

মুসলিম লীগ গঠন মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিল। কেননা এতদিন মুসলমানরা পালহীন নৌকার মতো দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল এবং সেই সাথে সকলের অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে নিতে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য প্লাটফর্ম খুঁজে পেল। তারা রাজনৈতিক দিক থেকে বলীয়ান হবার পাশাপাশি শিক্ষা, অর্থনীতিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে তাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলো। তারা মুসলিম লীগকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতে লাগলো। আবার মুসলিম লীগও মুসলমানদের একমাত্র মূখপত্র হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতো। যেমন: মুসলিম লীগের প্রচেষ্টার কারণেই হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ব্রিটিশ সরকারের ছয় বছর সময় লেগেছিল। তবে মুসলিম লীগ গঠন ছিল ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো বাঁধার প্রাচীর। যেহেতু হিন্দুদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ছিল আর এখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলো ফলে সাম্প্রদায়িকতা আরো ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করলো। মুসলিম লীগের বড়ো সাফল্য ছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ। ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের জন্য মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাশ হয়। মুসলিম লীগের আরেকটি সাফল্য হলো মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করা অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি ধরা হয় ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপিত ‘একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা’ নামক প্রস্তাবটি। পরবর্তীতে এই প্রস্তাবটি মুসলমানদের গণদাবিতে রূপান্তরিত হয় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে। যার সফল পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপন করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ ছিল ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হতেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদিক হতে অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলমানরা কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং ১৯০৬ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০
---	-------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯০৬ খ) ১৮৮৫ গ) ১৯৪৮ ঘ) ১৮০৬
- কংগ্রেস কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৭৮৫ খ) ১৮৮৫ ঘ) ১৯০৫ ঘ) ১৯০৬
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) লর্ড কার্জন খ) এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম গ) এ্যালান হিউম ঘ) প্যাটেল
- সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কয়টি?
ক) ৫টি খ) ৭টি গ) ৩টি ঘ) ৮টি

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অধিকার আদায়ের জন্য ‘ক দল’ নামক একটি রাজনৈতিক দল থাকলেও, মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য তেমন কোন দল নেই। সে-কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এম এল নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সে অনুযায়ী কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

- | | |
|--|---|
| (ক) মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? | ১ |
| খ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় কারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন? | ২ |
| গ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি উল্লেখ কর। | ৩ |
| ঘ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভারতীয় মুসলিম রাজনীতিতে এর প্রভাব মূল্যায়ন কর | ৪ |

পাঠ-৮.১১

লক্ষ্মী চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

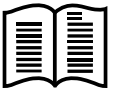
এ পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষ্মী চুক্তির পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- চুক্তির ধারাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিতে এই চুক্তির গুরুত্ব।



মুখ্য শব্দ

হিন্দু-মুসলিম, মর্লি-মিন্টো সংস্কার, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ



১৯১৬ সালের লক্ষ্মী চুক্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালে রদ হলে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) সময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সাহায্য কামনা করলে দৃশ্যপট পালটে যায়। এ পরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই উভয় দলের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। উভয় দল পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌঁছে যা ইতিহাসে লক্ষ্মী চুক্তি নামে পরিচিত।

লক্ষ্মী চুক্তির পটভূমি : লক্ষ্মী চুক্তির পটভূমি তৈরিতে একক কোন ঘটনা ভূমিকা রাখেনি। এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনা।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের সীমাবদ্ধতা

লক্ষ্মী চুক্তির পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন বেশ খানিকটা ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করা হয়। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দমন এবং মুসলমানদের সম্ভূষ্ট করার জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে। মুসলমানরা তাত্ক্ষণিকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখালেও কিছুদিনের মধ্যে এই আইনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে। ফলে ১৯১০ সালের পর থেকে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় একে অন্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে থাকে। এ সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বমূলক মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। একইসঙ্গে তারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এলাহাবাদ বৈঠক

১৯১০ সালে মুসলিম লীগের নাগপুর অধিবেশনের পর ১৯১১ সালের জানুয়ারিতে এলাহাবাদে হিন্দু ও মুসলমানদের একটি যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৬০ জন হিন্দু ও ৪০ জন মুসলিম নেতা অংশ গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদন মোহন মারাভিয়া, মতিলাল নেহেরু, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং মুসলমানদের মধ্যে নবাব ভিকার-উল-মূলক, আগা খান, ইব্রাহিম, রহিমউল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হন। ১৯১৩ সালের এপ্রিলে ঢাকার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এ কে ফজলুল হক ব্রিটিশ সরকারের মুসলমান স্বার্থবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হবে। তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগের সদস্য হয়েও কংগ্রেসে যোগ দেন।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

কিছু সংখ্যক মুসলিম কবি, লেখক ও সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শিবলি, আকবর, ও ইকবাল। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আবুল কালাম আজাদের উর্দু ভাষায় প্রকাশিত *আল হেলাল*, জাফর আলী খানের সম্পাদনায় *জামিনদার*, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* এবং উর্দু ভাষায় প্রকাশিত *হামদর্দ* পত্রিকা।

ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি

ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ায় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতিও মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। ১৯১৫ সালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের *আল হেলাল*, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* পত্রিকা সরকার বন্ধ করে দেয়। ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্যে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, তার ভাই মাওলানা শওকাত আলী, মাওলানা জাফর আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে অন্তরীণ রাখা হয়। এ সব কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

লক্ষ্মী অধিবেশন

হিন্দু ও মুসলিমদের যৌথ সংস্কার পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯১৬ সালে কলকাতার উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা। লক্ষ্মী অধিবেশনের প্রাক্কালে এ কমিটি যৌথভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বরে লক্ষ্মীতে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই উভয় সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলিম যৌথ সংস্কার প্রস্তাবনা গৃহীত হয় যা ইতিহাসে লক্ষ্মী চুক্তি নামে পরিচিত।

লক্ষ্মী চুক্তির ধারাগুলো নিম্নরূপ

এই চুক্তির প্রধান প্রধান ধারাগুলো নিম্নরূপ:

১. ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একযোগে আন্দোলন করবে।
২. কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য বিরোধিতা করলে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল পাস করা যাবে না।
৩. কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা হবে ১৫০ জনের মধ্যে ১২০ জন হবেন নির্বাচিত এবং ৩০ জন হবেন মনোনীত।
৪. নির্বাচিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ মুসলিম এবং তারা মুসলিম ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হবেন।
৫. গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্য ভারতীয় হবেন।
৬. সামরিক বাহিনীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নিযুক্ত করতে হবে।

লক্ষ্মী চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লক্ষ্মী চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম-

ক. কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা: এতোদিন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে কাজ করলেও এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। এ চুক্তিটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ঐক্যের দলিল। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লক্ষ্মী চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে।

খ. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ: লক্ষ্মী চুক্তি ভারতের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যেমন ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছে। তারা যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দাবি জানায়। ফলে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে কিছু রদবদলসহ সরকার লক্ষ্মী চুক্তি অনেকটাই মেনে নেয়। এতদসত্ত্বেও কোন সম্প্রদায়ই ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্যোগে খুশি হতে পারেনি। তারা স্বরাজ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

গ. স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের স্বীকৃতি লাভ: চুক্তির ফলে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সভা অর্থাৎ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রকাশ্য স্বীকৃতি অর্জন করে। এ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার অনুমোদন লাভ করে। এটিকে কেউ কেউ মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্যে এটার প্রয়োজন ছিল।

ঘ. অসম্প্রদায়িক রাজনীতির শুভসূচনা: এতাদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চরম সাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে অসম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়। দীর্ঘদিনের রেঘারেঘির পর এই প্রথম উভয় সম্প্রদায় কাছাকাছি আসার সুযোগ লাভ করল।

সমালোচনা: কোন কিছুই সমালোচনার উর্ধে নয়। লক্ষ্মৌ চুক্তি রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এ কে ফজলুল হক, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তিলক, ও মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এ চুক্তিকে স্বাগত জানান। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী লক্ষ্মৌ চুক্তি যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক এ দাবীকে উড়িয়ে দেন। তিনি এটাকে শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু- মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া বলে অভিহিত করেন। এভাবে লক্ষ্মৌ চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকলেও এ চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯০৫ সালের পর থেকে ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু- মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এ চুক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনীতিতে স্বস্তি ফিরে আসে। এ হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।



শিক্ষার্থীর কাজ

লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি আলোচনা করুন।



সারসংক্ষেপ :

লক্ষ্মৌ চুক্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের পর হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করেছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব ‘লক্ষ্মৌ চুক্তি’ নামে পরিচিত।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. লক্ষ্মৌ চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯২৬

খ. ১৯১৬

গ. ১৮১৬

গ. ১৯৩৬

২. লক্ষ্মৌ চুক্তির বিপক্ষে ছিলেন

ক. মহাত্মা গান্ধী

খ. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

গ. তিলক

গ. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

৩. চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা কত?

ক. ৫০ জন

খ. ৪০ জন

গ. ১২০ জন

গ. ৩০ জন



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

ব্রিটিশ শাসিত পূর্ব তিমুরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুটি বিবদমান গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিল। ব্রিটিশরাও তাদের ‘ভাগ কর শাসন কর’ নীতির আলোকে উভয় দলের মধ্যে তিক্ততা টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু বিবদমান সম্প্রদায় দুটি ব্রিটিশ চাল বুঝতে পেরে, তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করে এবং নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে একদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় অন্যদিকে সংঘাতে লিপ্ত সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

(ক) লক্ষ্মৌ চুক্তি কী?

১

(খ) লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তাদের নাম লিখুন?

২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরের ধারণার আলোকে লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রধান শর্তগুলো লিখুন?

৩

(ঘ) ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৪

পাঠ-৮.১২

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং
- ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

খলিফা, তুর্কি খিলাফত, অসহযোগ, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস



খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এটি এমন এক সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন সারা বিশ্বে সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে। ভারতবাসী আশা করেছিল মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় উপমহাদেশে উদার শাসন নীতি প্রচলিত হবে। কিন্তু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটানোর কারণে এখানে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে যেখানে হিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে যা ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। যদিও আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক ছিল অন্যতম। তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তি (ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স) চরম অবমাননাকর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল খিলাফত বাতিল ঘোষণা করা। তুর্কি সুলতানরা নিজেদের মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে দাবি করতেন। কিন্তু উসমানীয় সালতানাতের অবসান ঘটিয়ে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হলে খিলাফতের অবসান ঘটে। ফলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মতই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্যের অবসান মেনে নিতে পারেনি। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে তুরস্ক বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের ন্যাকারজনক ভূমিকার নিন্দা করেন এবং সরকার বিরোধী এক শক্তিশালী আন্দোলনের ঘোষণা করেন। খিলাফতকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ খিলাফতকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে আন্দোলন পরিচালিত হওয়ায় এটিকে ‘খিলাফত আন্দোলন’ বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ডঃ আনসারীর নেতৃত্বে ‘খিলাফত কমিটি’ গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর। আর ঐ তারিখটি ‘খিলাফত দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯১৯ সালের ১৪ নভেম্বরে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত বৈঠকের প্রথম অধিবেশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তুরস্কের অখণ্ডতা ও খলিফার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দাবি করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি না পেলে মুসলমানগণ সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে চলবে। অবশ্য বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও খিলাফত বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছিল। মহাত্মা গান্ধীও খিলাফত বৈঠকের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি সভাপতির ভাষণে খিলাফত বিষয়ে কংগ্রেস সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মাওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে খিলাফতের দ্বিতীয় বৈঠক লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে তুরস্ক ও খলিফার ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জানানোর জন্য বড় লাট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ড. আনসারীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলিমদের একটি প্রতিনিধিদল ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের অভিযোগগুলো তুলে ধরেন। কিন্তু সরকার তাদের নিরাশ করেন এই বলে যে, জার্মানির অনুকূলে অস্ত্র ধারণ করার শাস্তি তুরস্ককে পেতেই হবে।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে আহৃত খিলাফত সম্মেলন অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটি প্রতিনিধিদলকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সেভার্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সংবাদ প্রচারিত হয়। এ সন্ধির শর্তগুলো এদেশের মুসলমানদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। জুন মাসে খিলাফত কমিটি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল:

- যথা: ১) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক পদ বর্জন করা,
 ২) সরকারের বেসামরিক পদগুলো থেকে ইস্তফা দেয়া,
 ৩) পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করা
 ৪) খাজনা বন্ধ করা প্রভৃতি

উপরোক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় গ্রামবাসী খাজনা দিতে অস্বীকার করে। এছাড়াও ব্রিটিশ পণ্য, অফিস আদালত বয়কট করা হয়। ১৯২০ সালের পহেলা আগস্ট বিশালাকারে সারাদেশে হরতালসহ খিলাফত দাবি পালিত হয়। ব্রিটিশ সরকার খিলাফত ও রাওলাট আইন সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন একীভূত হয়। ফলে এদুটি আন্দোলন মিলে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি, জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ প্রভৃতি দলের নেতৃত্ব এককভাবে গ্রহণ ও পরিচালনা করেন। আন্দোলন এতই গতিশীল ছিল যে, সারা দেশে ১৯২০ সালেই ২০০ এর অধিক ধর্মঘট সফলভাবে পালিত হয়। গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করতে থাকে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গ্রন্থ রচয়িতা অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর ভাষায়, এ তিনজন (আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও গান্ধী) তখন পরিণত হয়েছিল মুকুটহীন ভারত সম্রাটে। ১৯২১ সালে আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। কোন কোন জায়গায় অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে সরকার দমননীতি পুরোপুরি ভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। ১৯২১ সালেই মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখকে সহ প্রায় ২০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঐ বছরই খিলাফত আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং সেই সাথে দমননীতিকে আরো সম্প্রসারিত করে। ফলে ধীরে ধীরে আন্দোলন ম্রিয়মান হতে থাকে।

খিলাফত আন্দোলনের ফলাফল ও গুরুত্ব

খিলাফত আন্দোলন তার চাহিদা অনুযায়ী পরিণতি লাভ করতে পারেনি। এর বড়ো কারণ হলো- এই দাবিটি সময়োপযোগী ছিল না। কেননা এটি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মাথা ব্যাখার কারণ ছিল না। এটি ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা। কিন্তু আরবদেশ গুলো থেকে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। আবার যোগ্য নেতৃত্বের অভাবও আন্দোলনকে সফল পরিণতি দেয়নি। কারণ আলী ভ্রাতৃদ্বয় বার বার গ্রেফতার হওয়ায় আন্দোলন পালহীন নৌকার মত দিকবিদিক চলেছিল। তবে ব্যর্থতার জন্য উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে দায়ী করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

ইতিহাসে কোন দেশ কখনই অন্য কোন দেশ বা ব্যক্তির অধীনে থাকতে পছন্দ করেনি। তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বারবার স্বাধীকার বা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন মুখর হয়েছে। ১ম মহাযুদ্ধের পর একদল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক রাওলাট আইন পাশ করতে উদ্যত হলে অনেক হিন্দু নেতা বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী এটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তৎকালীন গভর্নর জেনারেল চেম্‌সফোর্ডকে আইন পাশে তার সম্মতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জেনারেল চেম্‌সফোর্ড গান্ধীর অনুরোধ উপেক্ষা করে রাওলাট আইনে সম্মতি দান করেন এবং তা বলবৎ করেন। ফলে গান্ধী সারা দেশে সত্যগ্রহ ও গণআন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধী তাঁর আন্দোলনে শান্ত, নিরস্ত্র ও অহিংস নীতি গ্রহণ করেন। তথাপিও কোন কোন স্থানে অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূপলাভ করে। যেমন: পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুজরানওয়ালা এবং দিল্লিতে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে তা দমনের জন্য সরকারও কঠোর নীতি গ্রহণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে অমৃতসরের শাসনভার বেসামরিক থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর প্রতিবাদে জনগণ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি উদ্যানে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল সমবেত হয়। এই উদ্যানের প্রবেশের একটি মাত্র পথ এবং বহিঃগমনের জন্য চারটি পথ ছিল। আর চারপাশে অটালিকা বেষ্টিত ছিল। সহিংসতার আশংকায় জেনারেল ডায়ার এর নির্দেশে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই প্রায় ১০ মিনিট ধরে নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। সরকারি হিসাব মতে এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০০ জন আহত হয়। কিন্তু অনেকের মতে মৃতের সংখ্যা হাজারের উপরে। মূলত ভারতের সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। তবে একথা ঠিক যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সারাদেশে তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে এবং ইংরেজদের প্রতি দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ সমগ্র ভারতে এক মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ নৃশংসতার প্রতিবাদে ব্রিটিশ ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। যার সদস্য

ছিলেন- মতিলাল নেহেরু, এ. কে. ফজলুল হক, এম আর জয়াকার, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস তৈয়াবজী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ। উক্ত কমিটি জেনারেল ডায়ারকে দায়ী করে এবং তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করে। কিন্তু তার পরও ভারত সরকার জেনারেল ডায়ারের কার্যকলাপকে সমর্থন দান করে। যাইহোক ভারতবাসী কিন্তু তাদের আন্দোলন থেকে পিছপা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ‘তুরস্ক বাঁচাও, বাঁচাও খিলাফত’ এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল আগেই। কিন্তু ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে গান্ধী কংগ্রেসের একটি বিশেষ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের রূপকল্প ঘোষণা করেন। রূপকল্পের মধ্যে ছিল- সরকারি খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি বর্জন, ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন, রাজ বিচারালয় বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি। এই অসহযোগ আন্দোলনকে ব্যাপকতর রূপদান করতে সারা দেশ থেকে ১ কোটি স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও দেশীয় বস্ত্র প্রসারের নানাবিধ ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিদেশী বিদ্যালয়ের পরিবর্তে এদেশীয় পাঠশালা ও বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তর প্রদেশ, বাংলা বিহার, উড়িষ্যা সহ নানা প্রদেশে প্রায় ৮০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সরকারি গোয়েন্দা ব্যামফোর্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশদের পরিচালিত কলেজে ১৯১৯-২০ সালে যেখানে শিক্ষার্থী ছিল ৫২,৪৮৬ সেখানে ১৯২১-২২ সালে শিক্ষার্থী কমে দাড়ায় ৪৫,৯৩৩ জনে। এরকম এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সরকারি অফিস আদালতসহ নানা জায়গায় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সরকারের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গান্ধী সারা দেশে আন্দোলনের বীজবপন করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি মুসলমানদের থেকে জোরালো সমর্থন আদায়ের জন্য ‘খিলাফত আন্দোলনে’ নৈতিক সমর্থন দেন এমনকি বিভিন্ন জনসভায় মুসলমানদের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও গান্ধীর আন্দোলনে তাদের সমর্থনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একারণে ভারতের দুটি জাতি প্রথমবারের মত কোন একটি বিষয়ে আন্দোলনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে।

গান্ধী তার আন্দোলনের সূচনাতেই এটিকে অহিংস বলে প্রচার করেন। কিন্তু এটি ক্রমেই সহিংসতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। ফলে সরকারও কঠোর হস্তে তা দমন করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশে যেকোন প্রকার সভা সমিতি, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। এছাড়াও সরকার গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করেন। এতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাতদের গ্রেফতার করা হয়। যেমন-লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহেরু, চিত্তবঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসুসহ প্রায় ২০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। এই দমন নীতির ফলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। একটি দূর্ঘটনা ঘটে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। একটি শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করা শুরু করে। কিন্তু পুলিশের দূর্ভাগ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে তারা নিরুপায় হয়ে থানায় আশ্রয় নেয় এবং উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নি-সংযোগ করে। ২২ জন পুলিশ সদস্য জীবন বাঁচানোর তাগিদে বাইরে আসলে তাদের সকলকেই পুড়িয়ে মারা হয়। এই ঘটনায় গান্ধী চরমভাবে মর্মান্বিত হন এবং তিনি বারদৌলি প্রস্তাব অনুসারে অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেন। অবশ্য অনেকে গান্ধীর এই ঘোষণা মেনে নিতে পারেননি। তারা এটাকে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করেন।

ব্যর্থতার কারণ

অনেকে অবশ্য এই আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য গান্ধীর একক নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন। আবার অনেকে এই অসহযোগ আন্দোলনকে মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের সাথে একিভূত করাকে বেশি দায়ী করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, গান্ধী এটিকে অহিংস ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তারপরও কতিপয় স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। যদি ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতো তাহলে হয়তোবা এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অন্য ভাবে ইতিহাসে লিখা হতো।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব

অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব তেমন একটা না থাকলেও এটির সুদূর প্রসারী কিছু প্রভাব অবশ্যই ছিল। সভা সমাবেশ, বয়কট ও হরতালসহ নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সাফল্য অর্জিত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়। এমনকি মুসলিম লীগও তাদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সক্ষম হয়। তবে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা ছাড়াই গান্ধী আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করলে কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি তারা কংগ্রেস থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে ‘স্বরাজ দল’ একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ফলে এতে করে কংগ্রেস ক্ষমতা

কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। কেননা ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ দল কেন্দ্রীয় আইন সভার ১০১ টি আসনের মধ্যে ৪৫ টি আসনেই জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করুন।
খিলাফত আন্দোলন কী?	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড	তুর্কি খিলাফতের বিলুপ্তির কারণ কী?

	সারসংক্ষেপ :
খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই মঞ্চে সমাবেশ হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হতে পারেনি। আন্দোলনটি প্রকৃতপক্ষে সফল না হলেও এ আন্দোলনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয় তা পরবর্তীকালে বহু আন্দোলনের গতিপথ নির্দেশ করে। প্রাথমিকভাবে ভারতীয় মুসলমান তথা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় খিলাফত আন্দোলন আর হিন্দু সম্প্রদায় তথা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় অসহযোগ আন্দোলন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২
---	-------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কতসালে শেষ হয়?

ক. ১৯১৪

খ. ১৮১৪

গ. ১৯১৯

গ. ১৯১৮

২. কত সালে 'খিলাফত কমিটি' গঠিত হয়?

ক. ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর

খ. ১৯২৯ সালের ২৭ নভেম্বর

গ. ১৯১৯ সালের ১৭ মার্চ

গ. ১৯১৯ সালের ১৭ আগস্ট

৩. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে কতজন নিহত হয়?

ক. ৩৭৯

খ. ৪৭৯

গ. ৬৭৯

গ. ৩৮৯

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জালালাবাদ ইউনিয়ন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস হলেও মূলত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কুটকৌশলের কারণে তারা নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আসছিল। একপর্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের আলোচনা, সভা-সমাবেশ ও চুক্তির মাধ্যমে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং ইউপি চেয়ারম্যান আর.কে চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। একইসাথে আন্দোলনকারীরা জালালাবাদ ইউনিয়নের মেধাবী ছাত্র অমিয় রায়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য চেয়ারম্যানের নিকট সম্মিলিত ভাবে দাবি জানান, এই উদ্যোগও আন্দোলনে একটা ভিন্নমাত্রা যোগ করে কিন্তু দুঃখজনক হল আন্দোলন চলাকালেই অমিয় রায় মৃত্যুবরণ করে, ফলে আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

(ক) খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কী ?

১

(খ) খিলাফত কমিটির কর্মসূচিগুলো লিখুন?

২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লিখুন।

৩

(ঘ) কেন আন্দোলনটি ব্যর্থ হয়েছিল?- ব্যাখ্যা করুন।

৪

পাঠ-৮.১৩ বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রি.)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলী ও গুরুত্ব সম্পর্কে।



মুখ্য শব্দ

চিত্তরঞ্জন দাস, শুদ্ধি ও সংগঠন, তাবলীগ ও তানজীম এবং স্বরাজ (পার্টি) দল



ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হলেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে বাঙলার শতকরা ৬০ জন মানুষ মুসলমান অথচ সরকারি চাকুরি ও অন্যান্য সংস্থায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অবমূল্যায়ন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সর্বপ্রথম তিনি হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই উদ্যোগের সাথে যারা সহমত পোষণ করে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন- এ কে ফজলুল হক, আবদুল করিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ সকল নেতাদের যৌথ উদ্যোগেই বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু।

বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলী

১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল বাংলায় হিন্দু- মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বেঙ্গল প্যাক্ট-এর প্রধান প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১. স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে।
২. স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০ টি আসন পাবে।
৩. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। যে পর্যন্ত এ সংরক্ষিত পর্যায়ে না ওঠে, ততদিন মুসলমানদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। অমুসলমানরা শতকরা ৪৫ ভাগ চাকরি পাবে এবং মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দুরা শতকরা ২০ জন চাকুরি পাবে।
৪. কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি নিতে হবে।
৫. মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

বেঙ্গল প্যাক্টের গুরুত্ব:

বেঙ্গল প্যাক্টের গুরুত্ব নিম্নরূপ-

ক. এই চুক্তির ফলে হিন্দু- মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৩ সালের অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদ নির্বাচনে স্বরাজ দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। বাংলায় ৩৯ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২১টি এবং হিন্দু এলাকার ৪৭ টি আসনের মধ্যে স্বরাজ দল ৩৬টি আসন লাভ করে। বেঙ্গল প্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনে ২৫ জন মুসলমান চাকুরি পায়।

খ. বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে অচল করার লক্ষ্যে উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

গ. বেঙ্গল প্যাক্ট বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেতনা দান করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়নের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে।

ঘ. বেঙ্গল প্যাক্ট এর ফলে মুসলমানরা ব্যবস্থাপক পরিষদ, কলকাতা কর্পোরেশনসহ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোতে মুসলমানরা বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে মুসলিম নেতৃত্ব বিকশিত হয়। মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটি আবাসভূমির দাবি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট বিলুপ্তি

বেঙ্গল প্যাক্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি আশা জাগানিয়া পদক্ষেপ হলেও শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গান্ধীর সমর্থক কংগ্রেস দল এবং স্বরাজ দল বিরোধী হিন্দুরা বেঙ্গল প্যাক্টের তীব্র বিরোধিতা করে। হিন্দু মহাসভার ‘শুদ্ধি ও সংগঠন’ নামক আন্দোলন এবং মুসলমানদের ‘তাবলীগ ও তানজিম’ নামক আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতোমধ্যে স্থাপিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাছাড়া ১৯২৫ সালের ১৬ জুন বেঙ্গল প্যাক্ট অন্যতম প্রধান প্রবক্তা চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাটুকুও তিরোহিত হয়। অন্যদিকে স্বরাজ দলের নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলে বেঙ্গল প্যাক্ট এবং স্বরাজ দল টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

 শিক্ষার্থীর কাজ		বেঙ্গল প্যাক্টের সফলতা ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত করণ।	
বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য কী?	বেঙ্গল প্যাক্টের কী সফলতা ছিল?	বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কারা?	কেন বেঙ্গল প্যাক্ট বিলুপ্ত হল?

 সারসংক্ষেপ :
ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। এই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হলেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি জানতেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অবমূল্যায়ন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সর্বপ্রথম তিনি হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যা ইতিহাসে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

 পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান উদ্যোক্তা কে?

ক. এ কে ফজলুল হক

গ. বালগঙ্গাধর তিলক

খ. চিত্তরঞ্জন দাশ

ঘ. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

২. বেঙ্গল প্যাক্ট কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯২৩

খ. ১৯৩৩

গ. ১৮২৩

ঘ. ১৮৩৩

৩. বেঙ্গল প্যাক্ট অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা কতটি আসন পাবে?

ক. ৬০

খ. ৪০

গ. ৬৫

ঘ. ৩০



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মধুপুর গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস তবে হিন্দুরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানরা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। হিন্দুদের নেতা বাবু তরুণ কুমার দাশ মনে করলেন যে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য জরুরী, সেকারণে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের উপস্থিতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন যাতে হিন্দু ও মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিনিধিত্বের ধরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

(ক) বেঙ্গল প্যাক্ট কী?

১

(খ) বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদের কী ধর্মীয় সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল?

২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রধান ধারাগুলো লিখুন।

৩

(ঘ) উল্লিখিত চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪

পাঠ-৮.১৪ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারত শাসন আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন ভারত শাসন আইনের পটভূমি, ধারা, রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব সম্পর্কে



মুখ্য শব্দ

নেহেরু রিপোর্ট, সাইমন কমিশন, হিন্দু-মুসলমান, স্বরাজ দল ও দ্বৈত শাসন



ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের অন্যতম মূলভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ভারত শাসন আইন হঠাৎ করেই তৈরি হয়নি, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯১৯ সালের আইনের ব্যর্থতা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, আইন অমান্য আন্দোলন, গোল টেবিল বৈঠক ও ব্রিটিশ সরকারের শ্বেতপত্র প্রকাশসহ নানাবিধ ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারত শাসন আইনের পটভূমি তৈরি হয়। ভারতবাসীর দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও গণঅসন্তোষ প্রশমনের জন্যে ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে আইন প্রণয়ন করেন।

ভারত শাসন আইনের পটভূমি:

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের হিন্দু মুসলমানদের সম্মুখিত করতে পারেনি। কারণ এই আইনের মধ্যে নানাধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় যেমন-গভর্ণর জেনারেলের লাগামহীন ক্ষমতা, সীমিত ভোটাধিকার, ত্রুটিপূর্ণ দপ্তর বন্টন, আইন পরিষদকে একটি গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ফলে ভারত শাসনের জন্য নতুন একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষণার পর ব্যাপক সহিংসতা দেখা দেয়। ভারতীয়রা মনেপ্রাণে আইনটি মেনে নিতে পারেনি। তারা এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস (মার্চ, ১৯১৯) করে এবং এ আইনের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার চরম পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং মুসলমানদের চলমান খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যদিও শেষপর্যন্ত এ দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়। ভারত শাসন আইনের পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় কংগ্রেস থেকে এক দল ত্যাগী নেতা বেরিয়ে এসে স্বরাজ দল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বরাজ দলের পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক বেঙ্গল প্যাক্টের (১৯২৩) মাধ্যমে সরকারকে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান হয়। এ উদ্যোগটি ফলপ্রসূ না হলেও, এটি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতীয়দের অসন্তোষ দূর করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সংবিধানের কার্যক্রম তদন্ত, দ্বৈত শাসনের কার্যকারিতা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন। যদিও ভারতীয়দের পাশ কাটিয়ে গঠিত কমিশন এবং কমিশনের প্রতিবেদনকে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। তথাপিও এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯) ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করায় ভারতীয়দের মনে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত শাসন আইন তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়। নেহেরু রিপোর্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, ডোমিনিয়নের মর্যাদা, যুক্তরাষ্ট্র গঠন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্ট এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বাতিলের প্রস্তাব করা হয়। অন্যদিকে জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার কারণে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে আইন অমান্যের ডাক দেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার একদিকে এই আন্দোলন

দমনের চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রের শিরোনাম ছিল-“ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব সমূহ”। শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিবেচনা এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের জন্য লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর এর প্রতিবেদন পেশ করে। যদিও এই কমিটি শ্বেতপত্রে উল্লেখিত কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করেনি। তবে প্রাদেশিক ও ফেডারেল আইন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ভারত শাসন বিল প্রণীত হয় যা ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট কার্যকর হয়।

ভারত শাসন আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (ধারা):

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বলা হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হবে। এই ব্যবস্থায় কমপক্ষে ৫০% দেশীয় রাজ্য থাকতে হবে অন্যথায় সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না।
২. এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন। প্রাদেশিক বিষয়গুলো পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইতোপূর্বে গভর্নর তার ইচ্ছামত প্রাদেশিক প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।
৩. এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও যোগাযোগ। প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে কৃষি ভূমিরাজস্ব, কারাগার বানিজ্য শিল্পসহ ৫৪টি বিষয়।
৪. দ্বৈত শাসন এই আইনের আরেকটি বিশেষ দিক। প্রদেশে দ্বৈত শাসনের অবসান হলেও এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। গভর্নর জেনারেল ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যস্থার প্রধান। তিনি ব্রিটিশ রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন।
৫. এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইন সভা উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নামক দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রস্তাব করা হয়। এই আইনসভার মেয়াদ হবে ৫ বছর তবে গভর্নর জেনারেল চাইলে কার্যকালের মেয়াদেও আগেই আইনসভা ভেঙ্গে দিতে কিংবা মেয়াদ বাড়াতে পারতেন।
৬. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রাখার প্রস্তাব করা হয়। আদালতটি একজন বিচারপতি ও ২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে যারা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান এবং কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করবে। এ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার ব্যবস্থা থাকবে।
৭. এই আইনের মাধ্যমে উড়িষ্যা ও সিন্ধু নামক দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় এবং বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) ভারত বর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।
৮. এই আইনে প্রথমবারের মতো স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও রাজ প্রতিনিধি পদ সৃষ্টি করা হয়। একই ব্যক্তি গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি হতে পারবেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কংগ্রেস এটাকে ‘দামি মুখোশের আড়ালে দেশবাসীর উপর বৈদেশিক শাসন ও শোষণ চালানোর অপচেষ্টা বলে অভিহিত করেন। আর কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এটাকে A new chapter of Slavery বলে আখ্যায়িত করেন। মুসলিম লীগও এই আইনকে সমর্থন করেনি। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এটিকে ‘একেবারেই অগ্রহণযোগ্য’ বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি এই আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। লেবার পার্টির নেতা এটলির মতে, ‘The kenote of the bill is mistrust’ তিনি আরো বলেন, কংগ্রেসকে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই এ আইন রচিত।

ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব:

বিভিন্ন ধরণের দ্রুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক কুপল্যান্ড এ আইনকে সৃজনশীল রাজনৈতিক চিন্তার অনন্য অর্জন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দেও ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সুগম হয়।

- এই আইনের মাধ্যমে সংবিধান তৈরির ভিত্তি রচিত হয়।
- স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম হয়।
- প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে এ আইন তুলনামূলকভাবে সফল হয়। এতে সীমিত আকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বাস্তবায়ন হয়। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কার্যকর হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ধারণা দিন।
---	------------------------	---------------------------------------

ভারত শাসন আইন কী?	ভারত শাসন আইনের প্রয়োজনীয়তা কী? ছিল?	সাইমন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কী?	ভারত শাসন আইনের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি?
-------------------	--	--------------------------------	---

	সারসংক্ষেপ :
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গণঅসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেন। এই আইনকে বলা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তি স্তম্ভ। ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের বিভিন্ন দাবী মেনে নেয়া হলেও এ আইন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকে খুশী করতে পারেনি। এমনকি ব্রিটেনের তৎকালীন বিরোধী দলও ভারত শাসন আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। নানামুখী সমালোচনা সত্ত্বেও ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৪
---	--------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ব্রিটিশ সরকার কত সালে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে?

ক. ১৯৩৩	খ. ১৯৩৪	গ. ১৯৩২	ঘ. ১৮৩৩
---------	---------	---------	---------
- ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন	গ. দ্বৈতশাসন	ঘ. সব গুলো
-----------------------------	----------------------------	--------------	------------
- ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য কতগুলো আসন সংরক্ষণ করা হয়?

ক. অর্ধেক	খ. এক-তৃতীয়াংশ	গ. এক-চতুর্থাংশ	ঘ. এক-পঞ্চমাংশ
-----------	-----------------	-----------------	----------------

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	---------------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

পাইকান্দী গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন যার চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মো. শাহজাহান। ইউনিয়নবাসীরা দীর্ঘদিন তাদের নানাধরনের দাবী নিয়ে চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করলেও কোন লাভ হয়নি ফলে তারা চেয়ারম্যান ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এতে কওে চেয়ারম্যান বাধ্য হয়ে ইউনিয়ন পরিষদেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং একটি নীতিমালার মাধ্যমে দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদেও পক্ষ থেকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলেও অনেকেই এই নীতিমালার তীব্র সমালোচনা করেন।

- | | |
|---|---|
| (ক) ভারত শাসন আইন কবে কার্যকর হয়? | ১ |
| (খ) ভারত শাসন আইনের প্রতিক্রিয়া লিখুন | ২ |
| (গ) উদ্দীপকের আলোকে ভারত শাসন আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলো লিখুন। | ৩ |
| (ঘ) ভারত শাসন আইনের পটভূমিসহ এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। | ৪ |

পাঠ-৮.১৫

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে



মুখ্য শব্দ

দ্বিজাতি তত্ত্ব, গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, লাহোর ও পাকিস্তান প্রস্তাব



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ‘লাহোর প্রস্তাব’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল ‘মুসলিম লীগের’ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার জন্য শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় যা ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। অবশ্য পরবর্তীতে এটিকে পরিবর্তন করে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে রূপদান করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা যতই থাকুক এটি মুসলমানদের একক পতাকাতলে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

প্রেক্ষাপট:

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হলেও এটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল অনেক আগে, ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদের ধারণা প্রদান করেন। তিনি মনে করতেন যে, ভারতে দুটি ভিন্ন জাতির বসবাস। যেহেতু তাদের জীবনাচার আলাদা তাই তাদের রাজনীতিসহ নানাবিধ কার্যক্রম আলাদাভাবেই করা উচিত। মূলত তার প্রচারণার কারণেই মুসলমানদের অনেকে হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাকে। মুসলিম লীগ গঠিত হলে হিন্দুরা বিদ্বেষাত্মক প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে এবং ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনীতি মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকে আরো বেগবান করে তোলে। হিন্দুরা তাদের রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে তাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। জওহরলাল নেহেরু তার একটি বক্তব্যে বলেন যে, ভারতে দুটি শক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। যথা- ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস। আবার দল মত নির্বিশেষে সকল দলের অংশগ্রহণে সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনে নেহেরু কমিটি গঠিত হয় ১৯২৩ সালে। কমিটি ইতিপূর্বে মুসলমানদের অনুমোদিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেবার সুপারিশ করে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বিষয়টিকে আরো গতিহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাই দুটি জাতি বিষয়টিকে মনে, প্রাণে বিশ্বাস করতো। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবের অগ্রজ হিসেবে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে দেয়া আল্লামা ইকবাল এর একটি ভাষণকে মনে করা হয়। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫ টি এলাকার জন্য ‘পাকিস্তান’ নামের উদ্ভাবন করেন। পরে অবশ্য ভারত, বাংলা ও হিন্দুস্থান নামক তিনটি রাষ্ট্রের প্রস্তাবও করা হয়েছিল একবার। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মুসলিম লীগ শুধুমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও একক মন্ত্রি সভা গঠন করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতেও কংগ্রেস বিজয়ী হওয়ায় তারা মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা ছাড়াই মন্ত্রিসভা গঠন করলে মুসলিম লীগ নেতারা এটিকে তাদের জন্য অপমানকর হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তারা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার বিষয়ে ঐক্যমত হবার চেষ্টা করছিল। যা বাস্তবায়নের জন্য একটি বড় ধরনের ধাক্কার প্রয়োজন ছিল এবং লাহোরে উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য একটি প্লাটফর্ম। ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশনে তৎকালীন সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম দিনের সভাপতির ভাষণে ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ ঘোষণা করেন। মূল কথা ছিল মুসলমানের জন্য

আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে শেরে বাংলা, একে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য একাধিক রাষ্ট্রের কথা উত্থাপন করলে তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে তিনি লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্রের এই বহুত্ববোধক (States) শব্দটিকে অসাবধানতাবশত এবং মুদ্রণ প্রমাদ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। সুতরাং এ প্রস্তাবের প্রথমে States এর বদলে State হবে।

লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন ও এর বৈশিষ্ট্য

লাহোর অধিবেশনের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ দিনে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হককে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একই সাথে তাকে ‘বাংলার বাঘ’ শেরে বাংলা উপাধি প্রদান করা হয়। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেদুজ্জামান। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়-

নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা তা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নলিখিত মূল নীতিভিত্তিক না হয়। যথাঃ প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস সাধন করে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে যেমন- ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোকে একত্রিত করে একাধিক স্বাধীনরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং এদের অঙ্গরাজ্য গুলোও স্বায়ত্ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে, যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বপ্রকার অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে আসে-

১. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. এ সমস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্ত্বশাসিত।
৩. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৪. দেশের যে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়সমূহকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

ভারত বিভাগকে মহাত্মা গান্ধী ‘পাপ কাজ’ বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, যদি আমরা শ্রী জিন্নাহর অভিমত গ্রহণ করি তাহলে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ আলাদা ও স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হবে। হিন্দু সংবাদ পত্রিকাগুলোও লাহোর প্রস্তাবের সমালোচনা করতে থাকে। তারা এটিকে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে আখ্যা দেয়। তবে এই লাহোর প্রস্তাবটি মুসলমানদের মধ্যে দারুণভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এটি তাদের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এটির উত্থাপনকারী হলেও পরবর্তীতে এটিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপলাভ করায় তিনি তাতে সমর্থন দেননি। কারণ প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে এই প্রস্তাবটির ইংরেজি অনুবাদে মুসলমানদের নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হলেও এটিকে পরবর্তীতে ‘একটি মুসলিম রাষ্ট্র’ গঠন করার বিষয়টি প্রচার করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং জমিয়াতুল ওলামায়ে-ই-হিন্দ এর প্রধান নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বাঙালি মুসলমানরা লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল কারণ এই প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের বীজ বোপিত ছিল। জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৬ সালে শঠতার আশ্রয় না নিলে ১৯৪৭ সালেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হতো, অপেক্ষা করতে হতো না ১৯৭১ পর্যন্ত। তবে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার একটু কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। ভারত সচিব মন্তব্য করেন যে, ব্রিটেনের কোন সরকার বা পার্লামেন্ট ভারতের মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবেন বলে তিনি মনে করেন না। এতে মুসলিম লীগ নেতারা আশ্বস্ত হন। তবে লাহোর প্রস্তাবটি পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপান্তরিত হলে সহিংস আন্দোলন ভারত সরকারকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যে, মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে কোনো শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভক্তির পথ বেছে নেয়। ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামক নতুন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব:

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। যদিও ‘একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অথবা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র’ এ বিষয়টিতে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এটি ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে আশার আলো হিসেবে পরিচিত হয় এবং মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকা তলে দলে দলে সমবেত হতে থাকে। এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপুল ভোটে বিজয়ের মাধ্যমে। এই ফলাফলে তাদের আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	লাহোর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরুন।
---	------------------------	---

লাহোর প্রস্তাব কী?	লাহোর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কী?	লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া লিখুন।	দ্বি-জাতিতত্ত্ব কী?
--------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------

	সারসংক্ষেপ :
লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সেটাই লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্ত্বশাসন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কারণ এতে শাসন ক্ষমতা বাঙালি মুসলমানদের হাতে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে জিন্নাহ রাষ্ট্রের এই বহুত্ববোধক শব্দটিকে মুদ্রণ প্রমাদ বলে উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৫
---	--------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন?

ক. এ কে ফজলুল হক খ. চিত্তরঞ্জন দাশ গ. বালগঙ্গাধর তিলক ঘ. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

২. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়?

ক. ১৯৪০ খ. ১৯৩৩ গ. ১৮৪০ ঘ. ১৮৩৩

৩. লাহোর প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ করে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক. বাংলা প্রস্তাব খ. পাকিস্তান প্রস্তাব গ. সিন্ধু প্রস্তাব ঘ. পাঞ্জাব প্রস্তাব

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	---------------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘ক’ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যেটি ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে চলেছে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন। ক এর জনগণ হিন্দু-মুসলিম দুভাগে বিভক্ত, তারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী। মুসলমানদের জনৈক বাঙালি নেতা জনাব আজমল হক তাদের কেন্দ্রীয় দলীয় সভায় এ ধরনের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

- (ক) শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কে? ১
- (খ) লাহোর প্রস্তাবের মূলবক্তব্য কী? ২
- (গ) উদ্দীপকের আলোকে লাহোর প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৩
- (ঘ) উল্লেখিত লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৬

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ও ভারত বিভক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন ব্রিটিশ শাসনের অবসান সম্পর্কে



মুখ্য শব্দ

গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রস্তাব



১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। আর ভারতের স্বাধীনতা আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অবসান ঘটে ব্রিটিশ শাসনের যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে। ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন ও ভারত বিভক্তি এর সফল বাস্তবায়ন একদিনের আন্দোলন ও প্রচেষ্টার প্রতিফলন নয়। এর জন্য ভারতীয়দের অতিক্রম করতে হয়েছে সুদীর্ঘ ও বন্ধুর পথ।

ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতি প্রকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ অবসানের প্রক্রিয়া হচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারও একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থা স্থানীয় জনগণের ওপর ভারতের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে যা ‘আগস্ট প্রস্তাব’ নামে বেশি পরিচিত। এতে বলা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করা হবে। সকল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সর্বোপরি ভারতকে একটি ব্রিটিশ ‘ডোমিনিয়নের’ মর্যাদা দেওয়া হবে। প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্তৃক যেমন গৃহীত হয়নি তেমনি মুসলিম লীগ কর্তৃকও সমর্থিত হয়নি। ফলে সরকারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একটি সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আগমন করেন। তিনি ১৯৪২ সালের ৩০ মার্চে একটি প্রস্তাব প্রদান করেন। যেখানে বলা হয়েছিল- ভারত অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মত মর্যাদা পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি ইউনিয়নে পরিণত হবে। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ গণপরিষদ ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এবারও অথও ভারতের দাবিতে কংগ্রেস প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেনি। আবার মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূ-খণ্ডের কথা উল্লেখ না থাকায় মুসলিম লীগও এটিতে সমর্থন দেয়নি। ফলে এচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদেশীয়দের হাতে ক্ষমতা প্রদানের জন্য ১৯৪৫ সালের ১৪ জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিকট একটি পরিকল্পনা প্রদান করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল। এটি ওয়াভেল পরিকল্পনা নামেও পরিচিত। এতে বলা হয় যে, অচিরেই নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে এবং ততদিন এদেশে অন্তর্বর্তী কালীন সরকার দেশ পরিচালনা করবে। প্রশাসনে একমাত্র বড়োলাট ও সেনাপ্রধান ব্যতীত অন্য সকল পদে এদেশীয়দের নিয়োগ দেয়া হবে। গঠিত শাসন পরিষদে হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা হবে সমানুপাতে। সিমলায় ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দলের সাথে ওয়াভেলের আলোচনা বৈঠক হলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সমর্থন পেতে নানা রকম প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যুদ্ধ শেষে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড পি. লরেন্সের নেতৃত্বে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ. ভি. আলেকজান্ডারসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে ভারত পাঠানো হয়। মে মাসে তারা ভারত শাসন সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা পেশ করে যা ক্যাবিনেট মিশন নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, শুরুতে ভারতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকার গঠিত হবে। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যপাল নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে। তিন ধাপে প্রদেশ গুলোকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান, মুসলিম প্রধান, বাংলা ও আসাম গ্রুপ গঠিত হবে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এছাড়াও প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন ও কার্যকর হলে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় সার্বভৌমত্বের

অবসান ঘটবে। যেহেতু এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে মুসলমানরা তাদের লক্ষ অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাবে একারণে মুসলিম লীগ এটিতে সমর্থন দান করে। শুরুর দিকে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেও তারা গণপরিষদে অংশ নেবে বলে জানায়। তবে মিশনের একটি বড় শর্ত ছিল যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর আংশিক মেনে নেওয়ার কোন বিধান থাকবে না। তৎকালীন বড় লাট ওয়াভেলের মুসলিম লীগের হাতে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা দিতে কিছুটা অনীহা ছিল। কেননা কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে অংশ নিতে অস্বীকার করে কিন্তু মুসলিম লীগ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য উৎসাহ দেখালেও ওয়াভেল তা গ্রহণ করেননি। যাইহোক পরবর্তী মাসে ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য নেহেরুকে অনুরোধ করেন। এতে মুসলিম লীগ চরমভাবে অপমানিত হয় এবং ১৬ আগস্ট সারা দেশে হরতাল ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে বড়লাট ওয়াভেলকে প্রত্যাহার করে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে তদস্থলে নিয়োগদান করা হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা প্রশমন করার দায়িত্ব নিয়েই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে প্রেরণ করা হব। তিনি অনুভব করেন যে, হিন্দু মুসলিম উভয়ের দাবি না মেনে নিলে তা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভারতে এসেই ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এমন ভারতীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। মাউন্টব্যাটেন সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে বলা হয়- আগামী ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে সেখানে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। আর যেহেতু বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্ক আছে সেহেতু এদুটি প্রদেশ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হবে। এছাড়াও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও আসামের সিলেট জেলা পাকিস্তানের সাথে থাকবে কিনা তা নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নব গঠিত ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে যে, তারা কমনওয়েলথভুক্ত হবে কি না আর উভয় দেশদুটির সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আইন কমিশন গঠিত হবে। মাউন্টব্যাটেন এর পরিকল্পনা সংগ্রামরত দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানেরা মেনে নেওয়ায় এই পরিকল্পনা মতই ভারত স্বাধীনত আইন প্রণীত হয়। যা ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করে।

ভারত স্বাধীনতা আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা

- ১) ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে কার্যক্রম শুরু করবে এবং তারা ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে।
- ২) বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা নামে আলাদা প্রদেশ গঠিত হবে।
- ৩) প্রত্যেক ডোমিনিয়নের জন্য আলাদা গণপরিষদ ও আলাদা আইন পরিষদ থাকবে।
- ৪) সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্র অন্যদিকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে ভারত রাষ্ট্র।
- ৫) প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন করে 'হেড অব দি স্টেট' হিসেবে একজন গভর্নর জেনারেল দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৬) উভয় দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি না তা গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে।
- ৭) এই আইন কার্যকর হলে দেশীয় রাজ্যগুলো হতে ইংরেজ শাসনের অবসান হবে এবং ব্রিটেনের রাজা 'ভারত সম্রাট' উপাধি পরিত্যাগ করবেন প্রভৃতি।

আইন কার্যকর:

আইন কার্যকরের মাধ্যমে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর ভারতের গভর্নর হিসেবে থেকে যান লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। জওহরলাল নেহেরু ও লিয়াকত আলী খান যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। আর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান

ভারত স্বাধীনতা আইন কার্যকর হবার মধ্য দিয়ে এদেশী হিন্দু ও মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের আশা- আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়। একই সাথে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। আইনটি ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাস হবার আগে অবশ্য কংগ্রেস কিছুটা অনাগ্রহ দেখিয়েছিল কিন্তু অন্য দিকে মুসলিম লীগ আপোসহীন থাকায় এবং তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে কংগ্রেস তাতে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। তবে একথা ঠিক যে, এই বিভক্তির ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ভারতীয়রা তথা কংগ্রেস কেননা তারা অর্জন করেছিল বিশাল ভূখণ্ড। অপরদিকে মুসলিম লীগ নেতারা যেখানে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অনড় ছিল এবং

শেষ দিকে তারাই বেশি সর্বাঙ্গিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল সেই তাদের ভাগ্যেই জুটলো কর্তিত ও তুলনামূলক ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ড যার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১২শ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব মেনে নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হলো। এভাবেই ভারত বিভক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশদের সুদীর্ঘ ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনাবসান ঘটে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
---	------------------------	--

ভারত বিভক্তি কী?	কেন ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল?	আগস্ট প্রস্তাব কী?	মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দাও?
------------------	---------------------------------------	--------------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারত বিভক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তেমনি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত না হলে ভারত বিভক্তি সম্ভব হত না আবার ভারত বিভক্তি এতটাই অনিবার্য ছিল যে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। হঠাৎকরেই ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয়নি এর পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং কতগুলো ধারাবাহিক ঘটনা। ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং ব্রিটিশ রাজ ‘ভারত সম্রাট’ উপাধি পরিত্যাগ করলেন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৬
---	--------------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি কত তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে?
ক. ৪ জুলাই খ. ১৪ জুলাই গ. ১৫ জুলাই ঘ. ১৮ জুলাই
- নিম্নোক্ত কোন প্রস্তাবটি ভারত স্বাধীনতা আইনের জন্য গৃহীত হয় ?
ক. আগস্ট প্রস্তাব খ. মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব গ. ক্রিপস প্রস্তাব ঘ. ওয়াভেল প্রস্তাব
- ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?
ক. লিয়াকত আলী খান খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. একে ফজলুল হক

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	---------------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ব্রিটিশ শাসনামলে X নামক রাষ্ট্রে জনগনের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ বিরাজ করছে এবং দেশটিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সে সকল উদ্যোগ ফলপ্রসূ না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ক-এর জনগনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে ক দেশটিতে ধর্মের ভিত্তিতে ‘প’ ও ‘ভ’ নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।

- (ক) ভারত স্বাধীনতা আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১
- (খ) ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে কোন দুটি প্রদেশ তৈরি হয়? ২
- (গ) উদ্দীপকের আলোকে প্রণীত স্বাধীনতা আইনের প্রধান ধারাগুলো লিখুন। ৩
- (ঘ) ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমিসহ ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৭

ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- আরো জানতে পারবেন ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে



মুখ্য শব্দ

বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্রিটিশ বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান



প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নত। এ অঞ্চলের গ্রামগুলো ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই তখন এ সব গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। মানুষের ছিল গোলা ভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ। কুটির শিল্পের অবস্থাও ছিল সমৃদ্ধ। বাংলার তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নত ছিল। বাংলার বস্ত্রশিল্পকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছে এদেশীয় মসলিন। বাংলার কৃষিপণ্য এবং উর্বর জমির আকর্ষণে অনেকেই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদের অন্যতম। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ফলে এখানে নানাধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত। তবে ইতিবাচক পরিবর্তনের চেয়ে নেতিবাচক পরিবর্তন বেশি হওয়ায় কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল আর এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল বাংলার কৃষি ব্যবস্থা। নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি অস্বাভাবিক উর্বর। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে বাংলায় উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম তুলা ইক্ষু, পাট, আদা, জোয়ার, তেল, শিম সরিষা ও ডাল। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পান, সুপারি ও নারকেল উৎপন্ন হত। বাংলার উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ আয় করা হত। প্রাক-ব্রিটিশ আমলের কৃষি সাফল্যের উপর নির্ভর করে বাংলায় বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প এবং নৌকা নির্মাণ শিল্প বিকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে কোম্পানির সিদ্ধান্তে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্য (খাদ্য শস্য) বাদ দিয়ে শুরু হয় নীলচাষ। ফলে বাংলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ধ্বংস হতে শুরু করে এবং বাংলায় এক পর্যায়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশে নীলচাষ শুরু হয় আঠারো শতকের সত্তরের দশকে। নীলচাষের জন্য নীলকরগণ কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকের নীলচাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করত। বাংলাদেশে নীল ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের নিয়ন্ত্রণে। প্রথম দিকে নীলকরেরা চাষিদের বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ করে দেয়। ফলে ক্রমাগত নীলচাষ চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা নীলচাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। তারা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীলচাষিদের হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এই বিবরণ থেকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। ইংরেজরা ভারতকে শোষণ করত এবং সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত নিজ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্যে। বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদই গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিল্পায়নের কাজে বিশেষ মনযোগী হলেও ভারতে বিপরীত নীতি অনুসরণ করত। ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়তে থাকল এবং বেকারত্ব সমাজে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করল। দাদাভাই নওরোজী ভারতীয়দের চরম দারিদ্রের কারণ হিসেবে ইংরেজদের চরম বন্ধুত্বহীন অর্থনৈতিক লুণ্ঠন নীতিকে দায়ী করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় জমির উপর জমিদারের স্থায়ী মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়ে পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা

করেন। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। একই সাথে তারা নিজনিজ মালিকানাধীন জমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে গ্রামীণ সমাজ। কিন্তু অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে প্রজাদের পুরানো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদারের দয়ারও পরেই প্রজাদের জীবন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সৃষ্টি হয় নতুন সামাজিক সংকট। এছাড়া জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা প্রজাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করতে থাকে, এতেকারে জমির উৎপাদন কমতে শুরু করে এবং শুরু হয় অর্থনৈতিক সংকট। উপমহাদেশে জমি ছিল অভিজাত্যের প্রতীক। ফলে অনেক সাধারণ মানুষ তার অর্জিত আয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ না করে জমিদারি কেনায় বিনিয়োগ করে। সে কারণে বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা প্রাক-ব্রিটিশ আমলের ন্যায় গতিশীল ছিল না। এ সময় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান এ দুটো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মূলত এই দুটি ধর্মকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রভাব। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান শাসনকালে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা এবং সমাজ জীবনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন সুলতান। এছাড়া সৈয়দ, উলেমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাংলার নবাব তৎকালীন সময়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তিনি ছিলেন ক্ষমতাহীন। মূলত ব্রিটিশ প্রতিনিধি এবং কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন সমাজের উচ্চ স্থানীয়, এছাড়া জমিদার এবং তাদের নায়েব-গোমস্তারা সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করতেন। সমাজের নিম্ন শ্রেণিতে অবস্থান করতেন কৃষক ও প্রজারা। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রবর্তক মেকলে বলেছিলেন, “আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করতে, যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের ভাবের মধ্যে আদান প্রদানকারী। এই শ্রেণির লোকেরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় এবং রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।” এই বক্তব্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করত। তারা ভারতবাসীর প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করত। আর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পেছনে ছিল তাদের জাত্যাভিমান। অধিকাংশ সময়ে তারা ঘোষণা দিতে দ্বিধা করত না যে ভারতীয়রা অনুন্নত ও বর্বর জাতির লোক। বহু ইংরেজ ভারতীয়দের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করত। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও করত। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজরা গুরুতর অপরাধ করলেও তাদের শাস্তি দেয়া হত না। রেলওয়ের কোন কামরায় ইংরেজ থাকলে সেই কামরায় কোন ভারতীয়কে টিকেট দেয়া হত না। বাংলার নবজাগরণ ব্রিটিশ ভারতের সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নবজাগরণকে বৈদেশিক শাসনের প্রথম পরোক্ষ ফল বলে অভিহিত করা যায়। এই নবজাগরণের নেপথ্য নায়কদের অন্যতম ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহন ছাড়া ডিরোজিও এবং ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠী, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অ্যানি বেসান্ট, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখও এ ভাবধারার পতাকাবাহী ছিলেন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও অনুশাসনগুলো স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের অন্তরায় ছিল। তাই রাজা রামমোহনসহ অন্যান্য সমাজ সংস্কারকবৃন্দ সেগুলো বিলোপ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলিম সমাজেও নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকে মুসলিম জাগরণে এবং এ সকল সমস্যা নিরসনে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, তিতুমীর, সৈয়দ আহমেদ খান, নাবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি মুসলমানদের ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও সহজ সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দেন। তিনি এদেশকে ‘দারুল হরব’ বলে ঘোষণা দেন।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির পাশাপাশি নানাধরণের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারত তথা বাংলায় মুসলিম শাসকদের প্রাধান্য ছিল। ফলে তাদের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামী ভাবধারার প্রাধান্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। ১৭৫৭ সালের পর থেকে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলে মানুষের চিন্তা ধারায়ও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ

ভারতের সাহিত্য চর্চায় সেটা লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের বহু কবি ও সাহিত্যিক তাদের লেখনির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করেন। এদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সর্বোচ্চ। তার নাটক ও কাব্য বাংলার সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গদ্য সাহিত্যে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ দেশবাসীর মনে স্বদেশীকতার আদর্শ প্রচার করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত ‘নীলদর্পন’ নাটকে উপনিবেশবাদী ইংরেজদের নির্যাতনের এক নির্মম করুণ চিত্র নিখুত ভাবে তুলে ধরেন। তবে ভারতে স্বদেশিকতা প্রসাদে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর রচনাগুলো বিশেষ করে ‘আনন্দমঠ’ ও ‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় আন্দোলনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাও নবজাগরণ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে পরিব্রাজক, ‘বর্তমান ভারত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলা সাহিত্যে চরম উন্নতি লাভ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর বহুমুখী ও কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলের তুলনায় ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ ছিল। ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে বাংলার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ক্রমাগতই দুর্বল হতে থাকে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শুরু হয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
---	-----------------	--

বেঙ্গল রেনেসাঁ কী?	সতীদাহ প্রথা কী?	নীলচাষ কী	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২টি সুবিধা লিখ?
--------------------	------------------	-----------	--

	সারসংক্ষেপ :
প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এসময় বাঙালির থাকত গোলা ভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ। কুটির শিল্পের অবস্থাও ছিল সমৃদ্ধ। বাংলার তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নত ছিল। বাংলার কৃষিপণ্য এবং উর্বর জমির আকর্ষণে অনেকেই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। এরকমই একটি বানিজ্যিক কোম্পানি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী হস্তান্তরের মাধ্যমে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক পরাজয় নিশ্চিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাজয়ের কারণে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান নামক দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে ভাটীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৭
---	-------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

ক. গতিশীল ছিল	খ. গতিশীল ছিল না	গ. গণমুখী ছিল	ঘ. কোনোটিই নয়
---------------	------------------	---------------	----------------
- ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার সামাজিক কাঠামোতে কী প্রভাব তৈরি করেছিল?

ক. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য	খ. হিন্দু-খৃষ্টান ঐক্য	গ. হিন্দু-মুসলিম বিরোধ	ঘ. কোনোটিই নয়
-----------------------	------------------------	------------------------	----------------
- ‘নীলদর্পন’ কে রচনা করেন?

ক. দীনবন্ধু মিত্র	খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ঘ. কেশবচন্দ্র সেন



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘ক’ দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ যেটি দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে রয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। অপ্রচলিত এবং দেশীয় বাজারে চাহিদাহীন পণ্য জোরপূর্বক চাষাবাদের ফলে কৃষকরা কৃষি কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করলে প্রচলিত অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

(ক) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কী? ১

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার সমাজ কাঠামোতে কি ধরনের পরিবর্তন এনেছিল? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরুন। ৩

(ঘ) ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করুন। ৪



উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ :	১. খ	২. ঘ	৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ :	১. খ	২. গ	৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ :	১. গ	২. ঘ	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ :	১. খ	২. ঘ	৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ :	১. খ	২. গ	৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ :	১. গ	২. ঘ	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৩ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৪ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৫ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৬ :	১. গ	২. ক	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৭ :	১. খ	২. গ	৩. ক

বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন

ইউনিট
৯

ভূমিকা:

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারতকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছিল। এই বিভাজনের মূলে ছিল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’। কিন্তু ১৯৪০ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্যে ভারতে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হয়েছিল নানা কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪’র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৬’র ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯’র গণ-অভ্যুত্থান, ৭০’র নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ- ১ : ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ
- পাঠ- ২ : ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
- পাঠ- ৩ : পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি
- পাঠ- ৪ : ছয়দফা কর্মসূচি
- পাঠ- ৫ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ ও গুরুত্ব
- পাঠ- ৬ : ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন
- পাঠ- ৭ : মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাঠ-৯.১

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন
- আরো জানতে পারবেন ভাষা আন্দোলনের ঘটনা ও তাৎপর্য

	মূখ্য শব্দ	দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ১৪৪ ধারা, একুশে ফেব্রুয়ারি ও আম তলা
--	------------	--



বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষকে মুসলিম লীগের তৎকালীন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও দ্বিজাতি তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দেয়। বাঙালিরা ভালোভাবেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে শোষণের গোলকধাঁধা থেকে বের হতে দেবে না। তারা একে একে বাংলার মানুষকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। যার প্রথম পর্যায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব। ফলে বাঙালিদের আন্দোলন করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। বাংলা ভাষার প্রশ্নে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ একই পতাকার ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং রক্তশ্রুতি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মজাগরণ ও জাতীয়তাবোধই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গিক প্রেরণা যুগিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় সংগঠনটির দাপ্তরিক ভাষা কি হবে তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশ বিভাগের আগে আবার বাংলা বা উর্দু বিতর্ক শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচারণা চালায় তেমনি বাংলার জনগণও বিশেষ করে লেখক, বুদ্ধিজীবী এটির বিরোধিতা করে এবং বাংলার পক্ষে প্রচারণা চালায়। গণ আজাদী লীগ, তমুদ্দন মজলিশ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন সভা সেমিনারসহ সর্বত্র নানাবিধ প্রচারণা চালাতে থাকে।

প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে একটি ‘পুস্তিকা’ প্রকাশ করা হয় এবং তা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রচারপত্র বা এই পুস্তিকায় বাংলাকে কেন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বিশিষ্টজনেরা যুক্তি দেখান যে, শুধুমাত্র শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে আইন পাশ হলে তা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। উর্দু ছিল পাকিস্তানের সংখ্যালগিষ্ঠের ভাষা। সংখ্যাগরিষ্ঠের (শতাকরা ৫৬.৪০ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা) ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে বুদ্ধিজীবী মহল খুবই উদ্বেগ ছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের চিন্তার বড় কারণ ছিল এই যে, যদি তারা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাংলাকে শাসন ও শোষণ করা সহজ হবে। কেননা বাংলাভাষী শিক্ষিত যুবকদের উর্দু না শেখার কারণে উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া না হলে তাদের সারা জীবন গোলামিই করে যেতে হবে। আবার রাজনৈতিক দিক থেকে উর্দুভাষী নেতরাই আইন পরিষদসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে বাঙালি নেতৃবৃন্দের কপালে অবহেলা ছাড়া সম্মান পাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অন্যদিকে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে সকলকে জাতীয় ভাষায় সংস্কৃতি চর্চার একটি বাধ্যবাধকতা থাকবে। ফলে এদিক দিয়েও বাঙালিরা পিছিয়ে থাকবে। এছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে উর্দুভাষীরা উচ্চশ্রেণিতে গণ্য হবে আর অন্যরা দারুণভাবে অবহেলার শিকার হবে। উপর্যুক্ত যুক্তিতর্ক বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সকলেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, বাংলা ভাষাকে অন্ততঃ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করা হলে বাঙালিরা পদে পদে লাঞ্চিত হবে। ফলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম বা আন্দোলন জোরদার হতে থাকে।

ঘটনাপ্রবাহ: ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। এটির ঘোরতর বিরোধিতা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। প্রস্তাবটি পাশ না হওয়ায় বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১১ মার্চ সারা দেশে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ভাষার দাবীতে ১১ মার্চ ধর্মঘটে ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমেই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা তার কথার প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভাতেও একই দাবি করলে ছাত্ররা না, না বলে প্রতিবাদ জানায় এবং সভাশুল্ক ত্যাগ করে। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে আবারও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মনোভাব ব্যক্ত করলে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৪৯ সালে বাংলাকে আরবী হরফে লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবল বাধার মুখে তাও বানচাল হয়ে যায়। অবশ্য এরপর নানা কারণে ভাষা আন্দোলনের গতি মন্থর হতে থাকে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের শেষ ও চূড়ান্ত পর্ব সংগঠিত হয়। ঐ বছরের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে, এমন ঘোষণা দিলে ভাষার প্রশ্নে জনরোষ নতুন করে জেগে ওঠে। ছাত্র জনতা আবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংগ্রামের অংশ হিসেবে ৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এমনকি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আবার পূর্ণদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার নুরুল আমীণ সরকার আন্দোলন দমনে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তবে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়। নানা সংগঠন এই ঘোষণার সঙ্গে একমত পোষণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ছাত্র জনতা সুকৌশলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং নানা তর্ক বিতর্ক শেষে ১৪৪ ভঙ্গের পক্ষে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ১০ জনের একটি করে দল ক্রমান্বয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। ঐ মিছিল রাজপথে বের হলে পুলিশ বাহিনী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কিছু ছাত্র ও জনগণকে গ্রেপ্তার করে। জনতার প্রবল, বাধা ও আন্দোলনী মনোভাব দমন করতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাদানে গ্যাস ছুড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। বুলেটের আঘাতে সালাম, রফিক, শফিক, বরকতসহ অনেকে শহীদ হয়। তাদের রক্ত বাঙালিদেরকে আরো দুর্দমনীয় করে তোলে এবং সংগ্রাম আন্দোলন ব্যাপকতর রূপলাভ করলে বাঙালির দাবি উপেক্ষা করতে পারেনি। এমনকি ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ফলাফল :

১. ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মধ্যে নব জাতীয় চেতনা তথা বাঙালিদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। প্রথমবারের মতো তারা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়। এমনকি তারা যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে স্বতন্ত্র মনমানসিকতার অধিকারী তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।
২. বাঙালিরা রক্তের বিনিময়ে অধিকার আদায়ের কৌশল রপ্ত করে। এমনকি তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।
৩. ভাষা আন্দোলনে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ জনগণের সাথে একাত্ম হয়েছিল বলে সমগ্র জাতিই সংগ্রাম মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। সকল পেশার লোকেরা মিলিত হলে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক চেতনা ও সংহতিবোধের উন্মেষ ঘটে। যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে। ঐ নির্বাচনে বাংলার মানুষেরা মুসলিম লীগকে চরমভাবে শিক্ষা দেয়।
৪. ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ছাত্র সমাজ। ফলে আন্দোলনে বাঙালিদের বিজয়ী হওয়ায় ঐ ছাত্র সমাজ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এমনকি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী নানা শ্রেণী পেশার লোকদের নিয়ে ঐক্যজোট গঠন করার রীতি গড়ে ওঠে। এরূপ ঐক্যজোট পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

৫. রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে এ আন্দোলন থেকে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে কোন জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলার জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয় সংগ্রাম করার মনোবল সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলার জনগণ বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত বোধ করেনি। কারণ তারা ঐ ১৯৫২ সালেই বুঝেছিল সাহাসী ও প্রাণ উৎসর্গকারী মনোভাবই তাদেরকে সকল অবিচার অন্যায় ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মনন ও মগজে এবং শিরায় উপশিরায় অসীম সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে যোগ হয় আরেকটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ভাষা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও তাৎপর্য তুলে ধরুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% লোকের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলাই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা সেখানে বাংলাকে বাদ দিয়ে ৩.২৭% মানুষের উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাঙালি মেনে নিতে পারেনি। ফলে শুরু হয় আন্দোলন যা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে। এই দিন ভাষা সংগ্রামীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম, আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার নিহত হন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালিদের প্রথম সর্বাত্মক প্রতিবাদী আন্দোলন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ভাষা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় কত সালে?
ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৫০ গ) ১৯৪৮ ঘ) ১৯৫২
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্বপাকিস্তানের শতকরা কত ভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা?
ক) ৫৬% খ) ৫২.৫৪% গ) ৫৬.৪০% ঘ) ৪৯%
- কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে?
ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৬ গ) ২০০১ ঘ) ১৯৯৭

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

X একটি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ যার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু শাসকশ্রেণীর মাতৃভাষা উর্দু হওয়ায় তারা উর্দুকেই X এর রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে আন্দোলনকারীদের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

- ভাষা আন্দোলনের কী? ১
- ভাষা আন্দোলনে নিহত চারজন ভাষা শহীদের নাম লিখুন ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও ঘটনা সম্পর্কে লিখুন। ৩
- উদ্দীপকের আলোকে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরুন? ৪

পাঠ-৯.২

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন ও
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ, ২১ দফা ও নির্বাচনী ইজ্তেহার



ভূমিকা

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল ভোটে বিজয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গড়ার একটি পূর্বাভাস মাত্র। দেশ বিভাগের পরপরই ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব বাংলার মানুষকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম ভরাদুবির মাধ্যমে। এজন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

পটভূমি: দেশ বিভাগের পরপরই নানাবিধ কারণে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মনোভাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঘৃণা চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে। এই অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি পেতে পূর্ব পাকিস্তানের নানা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত থাকে এবং নানা রকম দল গঠিত হতে থাকে। রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ১৯৫১ সালে থাকলেও নানাবিধ কারণে সরকার নির্বাচন আয়োজন করতে পারেনি। তবে ১৯৪৯ সালের একটি উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে অনেকে এ নির্বাচন বিলম্বিত করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। যাই হোক ১৯৫৩ সালে সংবিধানের ধারা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও কর্মসূচি:

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক দল, যুবলীগ প্রভৃতি। আবার অমুসলমান প্রধান আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি জাতি ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল, গণ সমিতি, কুমিল্লার অভয় আশ্রম প্রভৃতি। তবে একথা ঠিক যে, ভাষা নিয়ে তর্ক ও আন্দোলন সংগ্রাম প্রভৃতি কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের জনগণ চরমভাবে মুসলিম লীগ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যদলগুলো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অঘোষিতভাবে অবস্থান নেয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দল সম্মিলিতভাবে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। এই দলগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আতাহার আলী এবং হাজী দানেশ প্রমুখ। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' গৃহীত হয়। নির্বাচনের জন্য এই যুক্তফ্রন্ট তাদের 'ইশতেহার' প্রকাশ করে যার ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। ইশতেহারে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। যথা-

১. পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাংলা'র স্বীকৃতি দেয়া হবে।

২. কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায় বাতিল করা হবে।
৩. মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে সংঘটিত পাট কেলেংকারির সুষ্ঠু তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং পাট শিল্পকে জাতীয়করণ করা হবে।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষির উন্নতির বিধান করা হবে এবং সর্বপ্রকার কুটির ও হস্তশিল্পে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি করা হবে।
৫. লবণ কেলেংকারির তদন্ত ও শাস্তি বিধান করা হবে এবং বৃহৎ লবণ শোধনাগার কারখানা স্থাপন করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের জন্য খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হবে।
৮. আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিক অর্থনৈতিক; সামাজিক সংপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে।
৯. অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের বেতনভাতার ব্যবস্থা করা হবে।
১০. বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী উপায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে এবং উচ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য হিসেবে ব্যবস্থা করা হবে।
১২. সরকারি কর্মচারীদের পর্যায়ভেদে বেতনের সামঞ্জস্যতার বিধান করা হবে এবং যথাসম্ভব শাসন ব্যয় কমানো হবে।
১৩. স্বজনপ্রীতি, ঘৃণা ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪. বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জননিরাপত্তা আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হবে।
১৬. শাসন ব্যয় কমানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজ থেকে সরিয়ে কম বিলাসপূর্ণ জায়গায় স্থানান্তর করা হবে এবং এটি ছাত্রাবাসে পরিণত করা হবে এবং পরবর্তীতে এখানে বাংলা ভাষা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে।
১৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং ঐ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মিত হবে।
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহীদ দিবস’ ঘোষণা করা হবে এবং প্রতিবছর এই দিনটি সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হবে।
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা প্রবর্তন ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষমতা প্রদেশে বিভাজিত করা হবে। এমনকি অস্ত্রশস্ত্রে বলিয়ান হতে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হবে।
২০. যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন অবস্থাতেই তাদের কার্যকাল অনির্বাচিত ও অবৈধভাবে বৃদ্ধি করবে না। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যথাসম্ভব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।
২১. মন্ত্রিসভা কোন আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার:

যুক্তফ্রন্টের মতই মুসলিম লীগ ও তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, মসজিদে ইসলামী শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রণয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক কোরআন শিক্ষা প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এছাড়াও কৃষি, জননিরাপত্তা, পাটশিল্প প্রভৃতির সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয়া হলেও সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। মুসলিম লীগের প্রচারকৌশলে দুটি শ্লোগান ছিল তা হলো-‘বিপন্ন মুসলিম’, ‘বিপন্ন পাকিস্তান’। উল্লেখ্য মুসলিম লীগের তুলনায় যুক্তফ্রন্ট তাদের ইশতেহারে সুনির্দিষ্টভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করায় এবং সর্বোপরি বাংলার স্বায়ত্ত্বশাসনের উল্লেখ থাকায় জনগণ তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়।

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৩০৯ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি আসনে জয়যুক্ত হয় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। খেলাফত-ই-রব্বানী পায়

১টি আসন। বাকী আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফশিলি ফেডারেশন ২৭ টি আসন, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩ টি আসন, কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪ টি আসন, বৌদ্ধ ২ টি আসন, খ্রিস্টান ১ টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪টি আসন লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ:

১. ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের চরম ক্ষোভের সম্মুখীন হন।
২. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষণমুক্ত ও প্রাদেশিক স্বাধিকার প্রাপ্তির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ইশতেহারে দেখতে পেয়েছিল। ফলে তারা নিরঙ্কুশ সমর্থনে কার্পণ্য করেনি।
৩. মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহার জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কেননা তাদের একমাত্র বক্তব্য ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। গণমুখী কোন ইস্যু না থাকায় নির্বাচনের আগেই জনগণ কর্তৃক তাদের ইশতেহার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।
৪. কৃষক, শ্রমিক সর্বোপরি মেহনতি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারে বিদ্যমান ছিল।
৫. ইশতেহারে সদ্য সংগঠিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের সনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাংলার মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগ বাংলার ভাষা আন্দোলন ‘দেশদ্রোহী’ আন্দোলনের সাথে তুলনা করায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

১. দেশ বিভাগের অনেক আগ থেকেই মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে ভরাডুবির পর তাদের সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।
২. গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যরা পূর্ব- পাকিস্তান প্রদেশের সত্যিকারের প্রতিনিধি নন বলে প্রমাণিত হয়।
৩. এ নির্বাচনে প্রাদেশিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি বাঙালিদের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে বলে সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত হয়। ফলে জাতীয়তাবোধ ক্রমশ জোরদার হতে থাকে।
৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে যথাযথ ও কর্মঠ বিরোধীদের বিকাশ শুরু হয়।
৫. এই নির্বাচনে একাধিক তুলনামূলক ক্ষুদ্র দলগুলো মিলে যে জোট গঠনের রীতি প্রচলন করে তা পরবর্তিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিকশিত।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসেই এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু শিল্প এলাকায় দাঙ্গা শুরু হলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার অজুহাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ২৯ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। তার স্থলে পূর্ব বাংলার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ফলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়ন ঘটতে পারেনি। তবে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবার পর থেকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। এভাবে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার পরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য সম্পর্কে তুলে ধরুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে এবং তারা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনকে বলা হয় মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘ব্যালট বিপ্লব’। পাকিস্তানিদের নানাধরনের ষড়যন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম লীগকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে।	



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৫২

খ. ১৯৫৪

গ. ১৯৫৬

ঘ. ১৯৫৮

২। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মোট কতটি দল অংশগ্রহণ করে?

ক. ১৬টি

খ. ১০৬টি

গ. ২৬টি

ঘ. ১৭টি

৩। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে কতটি দফা ছিল?

ক. ২১ টি

খ. ৪১ টি

গ. ১৯ টি

ঘ. ৬টি



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ক সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ। সেখানকার সিংহভাগ মানুষ শাসকশ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এবং তারা নানামত ও পথ ভুলে গিয়ে একই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ত্রিাশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। নব গঠিত এই রাজনৈতিক মোর্চাটি শাসক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয় লাভ করে। এই নির্বাচনে জয়লাভ তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. যুক্তফ্রন্ট কী?

১

খ. যুক্তফ্রন্ট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কতটি এবং কীকী?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের কর্মসূচিসহ ফলাফল লিখুন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

৪

পাঠ-৯.৩

পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন



মূখ্য শব্দ

পূর্ব বাংলা, বৈষম্য, অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি



সুলতানি ও নবাবি আমল থেকেই বাংলার একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বাংলায় আগত বিদেশী পর্যটকরা বাংলাকে ‘সম্পদে পরিপূর্ণ নরক’ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এক সময় বাংলা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত থাকলেও এখানকার প্রত্যেকটি জনপদ ছিল সম্পদে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। যার রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। ফলে পূর্ব বাংলাকে প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই দুর্দশকেরও অধিক সময় ধরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কেবল তাই নয়, তাদের প্রতি নানাদিরের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর এই বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। আর এই প্রতিবাদী আন্দোলন থেকেই শুরু হয় স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন যার সফল পরিণতি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিগ্রহণ করেছিল। অনেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানের এই আচরণকে ‘অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ’ বলে অভিহিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে নিম্নোক্ত কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

১. অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে বিদেশী শক্তি জোরপূর্বক একটি ভূখন্ড বা সম্প্রদায়কে নানাদিক থেকে শোষণ ও নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করে।
২. অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে প্রভুত্বকারী শক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে।
৩. তারা ক্ষমতা ব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করে।
৪. উপনিবেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে তাদের কাঁচামাল, সম্পদ পাচার করে নিজ দেশের বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটায়।
৫. উপনিবেশিক শক্তি দেশীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ স্বকীয়তা ধ্বংস করে নিজেদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বদলে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ বাঙালির উপর চেপে বসে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না। প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক, ভূ-রাজনৈতিক, ভাষা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর বৈসাদৃশ্য ছিল। এ সকল বৈসাদৃশ্যের কারণে একাত্তরে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ-

রাজনৈতিক বৈষম্য

১. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা থাকলেও ১৯৪৭ সালে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।
২. পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালির স্বার্থের প্রতি চরম অবহেলা করতে থাকে। পূর্ব বাংলার ৫৬% লোকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জনসংখ্যা অনুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হয়।
৩. সংবিধান নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু ১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণয়নের কথা থাকলেও পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। প্রায় নয় বছর সময় লেগেছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে। এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ নামকরণ করা হয়। এই সংবিধানে সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবহেলা করতে থাকে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত হয়েও তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি।
৫. বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র দারুণ অবহেলা ও নির্যাতন করতে থাকে। পাকিস্তান আমলে সিংহভাগ বাঙালি নেতা জেলখানায় বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

প্রশাসনিক বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাঙালিদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবিসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ‘এলিট শ্রেণি’ গড়ে তোলা হয়। মন্ত্রীদের পরই ক্ষমতাস্বত্ব ছিলেন এই এলিট শ্রেণী। ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৬৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই পাঞ্জাবি, বাঙালি ছিলেন মাত্র তিনজন। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে বাঙালি অফিসারদের নিয়োগ করা হত না। এভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত।

প্রতিরক্ষা বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। পাকিস্তান আমলের বেশির ভাগ সময়জুড়ে ক্ষমতায় ছিল সামরিক বাহিনী। বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি বাঙালি জাতি ও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সামরিক সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধযুদ্ধে জনগণের সাথে অংশগ্রহণ করে। নিম্নে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যগুলো তুলে ধরা হল-

১. ১৯৫৫ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মোট সংখ্যা ছিল ২২১১ জন। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৮২ জন যা শতকরা হিসাবে ৩.৭% মাত্র।
২. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্যে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয়। এতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং অবশিষ্ট ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের বাকি এলাকা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়।
৩. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিয়োগ বৈষম্য দেখলে যে কেউই আঁতকে উঠবেন। সেনা, নৌ, ও বিমান বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি পরিলক্ষিত হয়। সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। অফিসার পদে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। কেবল অফিসার নয় সাধারণ সৈনিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালি সৈনিকদের সুযোগ ছিল সীমিত। তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫,০০,০০০ সদস্যের মধ্যে বাঙালি ছিলেন ২০,০০০ জন মাত্র যা মোট সংখ্যার ৪% মাত্র।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনোই অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমুদয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত বলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। স্টেট ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার হতো সহজেই। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০ এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। তাদের ভয় ছিল বাঙালিরা শিক্ষিত হলে চাকরিসহ প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এবং দেশ শাসনে অংশীদারিত্ব দাবী করবে। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষে তেমন কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তাছাড়া শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ২০% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৮০%। একইভাবে পাকিস্তানের ১৬টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র তিনটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আর মেধাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মোট ৩৫ টি বৃত্তির মধ্যে ৩০টি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে আর ৫টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে।

সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। কৌশলে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পার্থক্যও কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হত। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে চালের মন ১৮ টাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানে চালের মন ছিল ৫০ টাকা।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

সাংস্কৃতিক বৈষম্য ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রধান কারণ। দু'অঞ্চলের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ এবং তাদের ভাষা বাংলা। অপরদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৪ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এই ৪৪ শতাংশ লোকের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি পর থেকে শাসকগোষ্ঠী ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তে লিপ্ত হলে বাঙালিরা তা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ডাক দেয়। শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় এক সময় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয় এবং বাঙালিরা বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ভূখন্ড লাভ করে।

রবীন্দ্র সাহিত্যসহ বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য বাঙালির প্রাণ। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ সকল সাহিত্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে বাঙালির মনে এক ধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কেবল তাই নয় বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা বর্ষবরণকেও পাকিস্তানিরা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭ সালে ১লা বৈশাখ পালনকে আইয়ুব খান হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বলে আখ্যা দেন। আইয়ুব খানের এরূপ ঘোষণা ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত। এমনিভাবে পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নানাধরনের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন, আগরতলা মামলা বিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনে বাঙালিরা সফলতা লাভ করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতিগুলো তুলে ধরুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পূর্ব বাংলা কেবল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তবে একমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোন মিল ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে একক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও, শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সাথে ঔপনিবেশিক আচরণ শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের উপর নানাধরনের অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়, যার প্রতিবাদে বাঙালিরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। শুরু হয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয় কত সালে?

ক. ১৯৫৬

খ. ১৯৪৭

গ. ১৯৪৬

ঘ. ১৯৪০

২। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ বাঙালি?

ক. ৫৫%

খ. ৫৬%

গ. ৭.২%

ঘ. ৪৪%

৩। 'মৌলিক গণতন্ত্র' কে চালু করেন?

ক. আইয়ুব খান

খ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান

গ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

ঘ. রাও ফরমান আলী

৪। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার কত শতাংশ বাঙালি?

ক. ৪%

খ. ৫%

গ. ২০%

ঘ. ১৫%

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

'ক' দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। দেশটির শাসকশ্রেণী 'উ' ভাষী কিন্তু দেশের সিংহভাগ মানুষ 'ব' ভাষী যারা দেশটির পূর্বাংশে বসবাস করে। শাসকশ্রেণী তাদের নিজস্ব ভাষা 'উ' কে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেবল ভাষার ক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়, তারা দেশটির পূর্বাংশের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং চাকুরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। 'ক' এর পূর্বাংশের মানুষের প্রতি শাসকশ্রেণী নানাধরনের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের প্রতি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক আচরণ শুরু করে।

ক. পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ হয় কত সালে?

১

খ. পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ধারণা দিন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিন।

৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশবাদ সম্পর্কে ধারণা দিন এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

৪

পাঠ-৯.৪

ছয় দফা কর্মসূচি



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।



মূখ্য শব্দ

মুক্তির মহাসনদ ছয় দফা, শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বায়ত্তশাসন



১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। একথা মানতেই হবে যে, এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এর প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং মুক্তির মহাসনদ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ছয় দফা আন্দোলন আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা কোন আন্দোলন নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র অন্যায়াভাবে যে সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল তার প্রেক্ষিতেই শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এর পক্ষে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। নিম্নে ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরা হল-

রাজনৈতিক পটভূমি

ছয় দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয় মূলত ১৯৪৭ সালেই, যখন লাহোর প্রস্তাব এর ভিত্তিতে দেশ বিভাজন করা হয়। কেননা দেশ বিভাজিত হলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর আঠারো বছর অতিক্রান্ত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং তারা নিষ্পেষণের হাত সদা প্রসারিত রেখে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। যেমন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র ৫৬ দিনের ব্যবধানে তারা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল ঘোষণা করে। এছাড়াও দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান ১৯৫৬ সালে কার্যকর হলেও মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে তা আবার বাতিল করে দেন এবং ১৯৫৯ সালে অগণতান্ত্রিক 'মৌলিক গণতন্ত্র' চালু করে জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট

দুই পাকিস্তানের ব্যবধান শুধু ভৌগোলিক ক্ষেত্রেই নয় বরং দৈনন্দিন জীবনচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাসেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল জীবনযাত্রার মানে অনেক এগিয়ে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি যা ছয় দফা দাবির জন্য মঞ্চ তৈরি করে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

ছয় দফা ঘোষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন-১৯৬২ সালের সংবিধানে বৈষম্য দূর করার কথা বলা হলেও বাস্তব প্রয়োগের অভাবে তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অথচ উন্নয়ন বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ থাকতো মোট বাজেটের মাত্র ২৫ ভাগ। এই বিশাল বৈষম্য ছয় দফা দাবি ঘোষণার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করে ছিল।

সামরিক প্রেক্ষাপট

সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান নিজেদেরকে খুবই অনিরাপদবোধ করে ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। কারণ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকায় যতটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় তার ১০ ভাগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকায়। ভারত চাইলে যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারতো। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়।

প্রশাসনিক পটভূমি

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাঙালিদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবিসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ‘এলিট শ্রেণী’ গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত। ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৬৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই পাঞ্জাবি, বাঙালি ছিলেন মাত্র তিনজন। এ ধরনের বাস্তব অবস্থাও ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল।

ছয় দফা ঘোষণা

পাক-ভারত যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মোট ২১ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবি সম্বলিত ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ সম্মেলনে পেশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে অনুষ্ঠান স্থলের বাইরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতে পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করে এবং জনমত তৈরির জন্য ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ‘আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ১৯ মার্চে কাউন্সিল অধিবেশনে ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ অনুমোদন লাভ করে।

ছয় দফার ধারাসমূহ**প্রথম দফা: পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও শাসনতন্ত্র**

লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করে সত্যিকারের একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে। আর প্রদেশগুলো পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে।

দ্বিতীয় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। আর বাদ বাকী ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

তৃতীয় দফা: মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক

এ বিষয়ক বিকল্পসহ দুটি প্রস্তাব করা হয়। যথাঃ-

ক) সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য দুটি পৃথক মুদ্রা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রচলন করতে হবে। এজন্য দুই প্রদেশে দুইটি পৃথক স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। অথবা,
খ) একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুই প্রদেশের জন্য অভিন্ন মুদ্রা প্রচলন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংবিধানে এমন বিধান থাকতে হবে যাতে এক প্রদেশের মুদ্রা অন্য প্রদেশে পাচার না হয়।

চতুর্থ দফা: রাজস্ব ও শুল্কনীতি বিষয়ক

প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য ও কর আদায়ের ক্ষমতা। তবে প্রদেশে আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে যা রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এভাবে ফেডারেল সরকারের তহবিল সমৃদ্ধ হবে।

পঞ্চম দফা: বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্য

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। দুই প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দুই প্রদেশ থেকে সমান হারে অথবা সংবিধানে উল্লেখিত নির্ধারিত হারে কেন্দ্রের ফেডারেল সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিনা শুষ্কে উভয় প্রদেশের আমদানী ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং বিদেশের সাথে এ সংক্রান্ত সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের নিকট সাংবিধানিকভাবে অর্পণ করতে হবে।

ষষ্ঠ দফা: প্রতিরক্ষা বিষয়ক

প্রদেশের নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি নামে প্রাদেশিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করার ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রদেশকে দিতে হবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফার ধারাগুলো ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির মহাসনদ। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ এটির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণার কারণে ছয় দফা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ ধারণ করতে থাকে। অন্যদিকে তৎকালীন সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা এটিকে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের বিরোধী এবং ‘রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা’ বলে প্রচার করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে এটি তেমন একটা আলোড়ন ফেলতে না পারলেও পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। একারণে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার দমননীতি আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সকল বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা না মেনে জনগণ স্বেচ্ছায় মিছিল বের করে। অবৈধভাবে মিছিল করায় পুলিশ জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলিবর্ষণ করে। ফলে কিশোর মনুমিয়াসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সর্বমোট ১১ জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হয়। ১৯৬৭ সালে আন্দোলন আরো জোরদার হয় আইয়ুব খান বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল একত্রিত হবার মধ্যদিয়ে। এভাবে ‘ছয় দফা আন্দোলন’ পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

‘ছয় দফা আন্দোলনের’ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- ১। ছয় দফাকে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির মহাসনদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং এটিকে নিজেদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।
- ২। ছয় দফা কর্মসূচি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী পদক্ষেপ।
- ৩। ছয় দফার প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রদেশকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। কেননা ঔপনিবেশিক শাসনামলের মতো তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অর্থ ও ধনসম্পদ উৎপাদনের কারখানা হিসেবে গণ্য করতো। তারা উৎপাদিত ফসল, আদায়কৃত রাজস্ব, উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি এই অঞ্চল থেকে নিয়ে যেত কিন্তু সরকারিভাবে এই অঞ্চলের অবকাঠামো, শিক্ষাসহ নানাক্ষেত্রে তারা চরম অনিহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তাই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল এদেশের আপামর জনতার দীর্ঘ দিনের দাবি।
- ৪। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জানতো যে, ছয় দফা শুধুই স্বায়ত্তশাসনের দাবি নয়। ছয় দফা বাস্তবায়িত হলে তাদের আয়ের বড়ো উৎস হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ফলে তারা ছয় দফাকে জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে চিহ্নিত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেয়। কিন্তু বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় যার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, দাবি আদায়ের একমাত্র মাধ্যম হলো আন্দোলন। তাই তারা ছয় দফা আন্দোলনকে ব্যাপক সমর্থন দান করে।
- ৫। ছয় দফা আন্দোলনে উজ্জীবিত জনগণ ‘৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে। কারণ জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য রাজনীতি করে। তারা সর্বদা জনগণের ভালো মন্দ দেখভাল করে। এই

আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিচালিত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন।

- ৬। ছয় দফা আন্দোলন জনগণকে জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ দেখায়। যা গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ করে এমনকি পর্যায়ক্রমে তা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সাহস, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগায়। এভাবে এমন এক গণজোয়ারের সৃষ্টি হয় যা মোকাবেলা করা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ :
ছয় দফা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছয় দফা দাবি ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং জনগণ ব্যাপকভাবে এটিকে সমর্থন জানায়। তারা ঐতিহাসিক ছয় দফাকে মুক্তির মহাসনদ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এটিকে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা বলে অপপ্রচার চালায়। মূলত, ঐতিহাসিক ছয় দফাই বাঙালি জাতিকে মুক্তির অনুপ্রেরণা দেয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। ছয়দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ কে ফজলুল হক গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. মাওলানা ভাসানী
- ২। ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৬ খ. ১৯৬৫ গ. ১৯৫৮ ঘ. ১৯৫৬
- ৩। ছয়দফায় কয়টি মুদার কথা হয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. কোনটিই নয়
- ৪। পাকিস্তান সরকার ছয় দফাকে কি বলে আখ্যায়িত করে-
ক. মুক্তির সনদ খ. রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা গ. পাকিস্তান ভাঙ্গার দলিল ঘ. খ ও গ উভয়

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
---	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘প’ দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম দেশ যেটি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির পূর্বাংশের জাতীয়তাবাদী নেতা জনাব এম রহমান। ‘প’ এর শাসকগোষ্ঠী পূর্বাংশের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে জনাব এম রহমান বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্যে ৬টি দাবি সম্বলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ‘প’ এর বাঙালি জনগোষ্ঠী এটাকে তাদের প্রাণের দাবি বলে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ‘প’ এর শাসকগোষ্ঠী এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করেন।

- ক. ছয়দফা কী ? ১
- খ. শেখ মুজিবুর রহমান কেন ছয় দফা ঘোষণা করলেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচির দফাগুলো লিখুন। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব এবং এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৫

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ ও গুরুত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বায়ত্বশাসন ও গণ-অভ্যুত্থান
--	------------	--



পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ব মূহুর্তে ঘটে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। সাধারণত ঐতিহাসিক ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন এবং আগরতলা মামলা পরবর্তী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রভৃতির সমন্বয়ে গণআন্দোলন আইয়ুব খান সরকারের উৎখাত আন্দোলনে রূপ নেয় যা ১৯৬৯ সালে সংগঠিত হওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে ‘উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান’ নামে পরিচিত।

গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

দেশ বিভাগের পর থেকে রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিরা দারুণ বৈষম্যের শিকার হয়। বাঙালির মনে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। এটিতে জ্বালানীর কাজ করে ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন এবং প্রহসনমূলক আগরতলা মামলা। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং জনগণ ব্যাপকভাবে এটিকে সমর্থন জানায়। পূর্ব বাংলার ছয়দফা কেন্দ্রিক এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালে ছয় দফার রূপকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করে, যা ইতিহাসে ‘আগরতলা মামলা’ নামে পরিচিত। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তারা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের আগরতলায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এবং ভারতীয়দের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। মামলা দায়েরের খবর ছড়িয়ে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা মামলা প্রত্যাহার ও আসামীদের মুক্তির দাবিতে দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। উল্লেখ্য যে আগরতলা মামলার আসামিদের মুক্তির আন্দোলন এক পর্যায় আইয়ুব খান সরকারের উৎখাত আন্দোলনে রূপ নেয়। বাঙালির এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে পূর্ব পাকিস্তানের ৮ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে ‘গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি’ (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে DAC নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন এটির সাথে একাত্ম হলে আন্দোলন দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলে।

আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি:

জানুয়ারি, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের উপর নিপীড়ণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলে ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। পরিষদের অধীনে পূর্বের এগারো দফার ভিত্তিতে একটি দাবিনামা তৈরি করা হয় এবং এর সঙ্গে ছয়দফার দাবিগুলো একীভূত করা হয়। ৮ জানুয়ারি তারিখে ৮ টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ‘গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ’ বা Democratic Action Committee বা সংক্ষেপে DAC/ডাক’ গঠন করে। এই ‘ডাক’ এর অধীনে ১৪ জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ১৭ জানুয়ারি ‘ডাক’ এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে দেশ ব্যাপী ‘দাবি দিবস’ পালিত হয়। এই দিনে ‘ডাক’ এর অধীনে বিক্ষোভ মিছিলের বের করা হলে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে মিছিলে লাঠি চার্জ করে। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরের দিন অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি তারিখের ধর্মঘট সহিংসতায় রূপলাভ করলে পুলিশ বেপরোয়াভাবে ছাত্রদের মিছিলে আক্রমণ করে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতার ঘটনার প্রতিবাদে আবার পরবর্তী দিন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া

হয়। ১৯ জানুয়ারি তারিখে আন্দোলনরত ছাত্রদের মধ্য থেকে অনেককে গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয় ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হবার পর। আসাদের মৃত্যুর সংবাদ দাবানলের মত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরপর থেকে প্রতিদিন লাগাতার কর্মসূচি পালিত হয়। ২২ ও ২৩ জানুয়ারি তারিখে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২৪ জানুয়ারি দেশব্যাপি হরতাল পালন করা হয়। এদিন রাজপথে সর্বস্তরের জনগণের ঢল নামে। এত জনসমাগম দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং পুলিশ বাহিনীকে আবারো গুলি চালানোর হুকুম দেয়। সচিবালয়ের নিকট গুলিবর্ষণের ঘটনায় এক কিশোর ছাত্র নিহত এবং বহু হতাহত হয়। এই ঘটনা আগুনে জ্বালানীর সঞ্চালন করে। কেননা জনতা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, তারা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান এবং মর্নিং নিউজ এর ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ কিছু সময়ের জন্য হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ২৫ জানুয়ারি নানা স্থানে হরতাল পালনকালে অন্তত ২ জনের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে ২৬ জানুয়ারি তারিখে সাক্ষ্য আইন জারী করা হয়। এমনকি এই দিনেও সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এভাবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে মিছিল-মিটিং, বিক্ষোভ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯:

১৯৬৯ সালের উত্তাল জানুয়ারির মতই ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ হরতাল বিক্ষোভ সমাবেশ ও নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এই পূর্ব পাকিস্তানে। বিশেষ করে ১, ৬, ৯, ১২ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি এরকম কর্মসূচি চলাকালে বহু লোকের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঘটে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এদিন আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে জেল খানায় গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একই ঘটনায় অপর আসামি সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী আন্দোলন অগ্নিরূপ ধারণ করে। জনতা তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এই মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার অবস্থা বেগতিক দেখে ‘সাক্ষ্য আইন’ জারি করে এবং তা ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ রাখে। আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয় এবং আরো অনেক ছাত্র ও শিক্ষক আহত হন। ফলে দেশের সামগ্রিক আইন শৃংখলার দ্রুত অবনতি ঘটে। এতে করে আইয়ুব খান সরকার কিছুটা হলেও ভীত হয়ে পড়ে এবং বিরোধী দলগুলোর সাথে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তৎকালীন নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এ অবস্থায় নেতারা সরকারকে অসহযোগিতা করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অসহযোগিতার ফলে দেশের অবস্থা আরো অবনতি হতে থাকে। আইয়ুব খান উপলব্ধি কারণ যে, মামলা প্রত্যাহার ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নেই। তাই তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তার ঘোষণা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য আসামিদের মুক্তি দেওয়া হয় ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মামলা প্রত্যাহারের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতাদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকেও শেখ মুজিব ৬ দফা এবং ১১ দফা আদায়ের লক্ষ্যে তার অবস্থান পুনরায় ব্যক্ত করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। ফলে আইয়ুব খানের স্বপদে বহাল থাকা কঠিন হয়ে ওঠে।

মার্চ ১৯৬৯:

মার্চ মাসে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশে ব্যাপকতর রূপ লাভ করলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরো কিছুদিন ক্ষমতায় থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তবে ১০ মার্চের গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান অগত্যা পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এভাবে নানা আলপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং কোন প্রকার উপায় না দেখে আইয়ুব খান দেশ পরিচালনায় তার অপারগতার কথা স্বীকার করেন এবং ২২ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে তদস্থলে এম এন হুদাকে গভর্নর নিয়োগ করেন। ফলে গোলযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব:

১। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সরাসরি প্রভাব হলো- স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের পতন। আইয়ুবখান সরকার এই আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ এতে অংশ নেয় এবং আর সার্জেন্ট জহুরুল হক

এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হলে অবস্থা আরো খারাপ হয়। যা আন্দোলনে নতুন রূপদান করে। ফলে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

- ২। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া আদায়ের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে দমনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের স্বাধীকার দাবি আন্দোলন চিরতরে দমন করা। কিন্তু ইতিহাস চিরদিন শাসকের পক্ষে লেখা হলেও নির্যাতন ও নিপীড়ণকারী এবং শাসনের নামে শোষণকারী বরাবরই আন্তাকুঁড়ে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি, যে উদ্দেশ্যে মামলা করা হয়েছিল তা তো সফলতা পায়নি, বরং উল্টো মামলার উদ্যোক্তা আউয়ুব খানকেই ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হতে হয়েছিল।
- ৩। এই আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি লাভ।
- ৪। এই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালিদের যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জাগ্রত হয়েছিল তার পূর্ণতা পায়।
- ৫। এই আন্দোলনে সফলতা পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু আলাদা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।
- ৬। এই গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালিদের জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
ঐতিহাসিক ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি রচিত হতে থাকে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং ১৯৬৮ সালে তাঁকে প্রধান আসামী করে আগরতলা মামলা দায়ের করে। এই মামলা পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে পুনরায় বেগবান করে। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি তা বাংলার কৃষক, শ্রমিকসহ সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথম আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দু'অংশের মানুষ একযোগে মাঠে নামে। এই গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং বাঙালিরা স্বাধীনতার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫
---	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে কার পতন ঘটে?

ক. আইয়ুব খানের	খ. ইয়াহিয়া খানের
গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	ঘ. খাজা নাজিমুদ্দিনের
- ২। কয়টি দলের সমন্বয়ে 'ডাক' গঠিত হয়?

ক. ৮	খ. ১৯	গ. ১০	ঘ. ১৫
------	-------	-------	-------
- ৩। ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান কত তারিখে নিহত হন?

ক. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি	খ. ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি	ঘ. ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি
- ৪। ১৯৬৯ সালে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে কী আইন জারি করেন?

ক. সূর্যাস্ত আইন	খ. সাক্ষ্য আইন
গ. জরুরী আইন	ঘ. বৈকালিক আইন



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জনাব সফিক সাহেব তার কন্যা প্রিয়ন্তিকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বলছিলেন। প্রিয়ন্তি তার বাবার কাছে জানতে চাইল কেন বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু করলেন? তার বাবা বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শাসন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

- | | |
|--|---|
| ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কী? | ১ |
| খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়গুলো লিখুন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি এবং ঘটনা লিখুন। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্ব বর্ণনা করুন। | ৪ |

পাঠ-৯.৬

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন

	মূখ্য শব্দ	ছয় দফা, স্বায়ত্বশাসন, তফসিল, নৌকা প্রতীক ও নির্বাচনী ইস্তেহার
--	------------	---



১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর এটি ছিল মাত্র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। নানা কারণে এই বিজয় ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একদিকে পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাঁদের কর্তৃত্বের বৈধতা হারায় অপরদিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এই লাহোর প্রস্তাবের ধারার উপর ভিত্তি করেই জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৪০ সালের প্রস্তাবনার আরেকটি ধারায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে সবসময়ই বিমাতাসুলভ নীতি অবলম্বন করেছে। এমনকি দেশ পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবিধান প্রণয়ন করতেও তারা দীর্ঘ এক দশক কালক্ষেপণ করেছে। পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় মুসলিম লীগের ভরাডুবির পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। নির্বাচনের ফলাফলে হতাশ হলেও যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে করে প্রদেশগুলো আবার গভর্নরের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৯৫৬ সালে রচিত হয় পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। এতে প্রদেশের স্বায়ত্বশাসনের কথা নামমাত্র দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক প্রত্যাশিত এই সংবিধান কার্যকরের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সংবিধান ও সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলে সামরিক শাসন। এই সময়কালে দুইবার (১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে) বিরোধী দলবিহীন এবং ১৯৬৪ সালে সর্বদলীয় নির্বাচনের আয়োজন করেছিল আইয়ুব খান সরকার। কিন্তু সে নির্বাচনে সকলের ভোটাধিকার ছিল না। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ঘোষণা করেন। এর দাবিগুলো জনগণের প্রাণের দাবি হওয়ায় সর্বস্তরের জনগণ এতে সমর্থন জানায়। শেখ মুজিবুরের প্রতি জনসমর্থনের ঢল দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে দমন করতে সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নাটক মঞ্চস্থ করে। কিন্তু জনগণ সরকারের কুমতলব বুঝতে পারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে আইয়ুব খান সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা দেন যে, ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ এ সংক্রান্ত একটি দিক-নির্দেশনামূলক ‘আইন কাঠামো আদেশ’ (Legal framework order) জারি করেন। যেখানে উল্লেখ করা হয়-

১. প্রাদেশিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
২. এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্বাচন দেওয়া হবে।

৩. পাকিস্তানের উভয় অংশের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সম্পর্ক নির্ধারণ করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। তবে জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করতে হবে।
৪. ১৯৭০ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভোটের তালিকা হালনাগাদ করা হবে।
৫. জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ কর্মদিবসের মধ্যে নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে। এসময় অতিক্রান্ত হলে পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে ছয়টি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যথা:
- (ক) ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- (খ) রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ।
- (গ) নির্বাচনে প্রতিটি প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।
- (ঘ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- (ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- (চ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. নববর্ষের দিন থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে এবং আচরণবিধি দু'দিন পর ঘোষিত হবে।
৭. জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী আসন হবে সর্বমোট ৩১৩ টি। যেখানে ১৩ টি মহিলা আসন থাকবে। আর পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে। যেখানে ৬২১ টি আসনের বিপরীতে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অর্থাৎ-

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	২৭	১	২৮	৬০	২	৬২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৮	১	১৯	৪০	২	৪২
বেলুচিস্তান	৪	১	৫	২০	১	২১
কেন্দ্র শাসিত এলাকা	৭	-	৭	-	-	-
সর্বমোট	৩০০	১৩	৩১৩	৬০০	২১	৬২১

৮. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে সাধারণ আসনগুলোর সদস্যগণ। তবে মহিলা আসনগুলোতে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হবে শুধুমাত্র সাধারণ আসনের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে।

৮. কেন্দ্র শাসিত এলাকার নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে।

৯. জাতীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে সংবিধান বিল পাশ করার ক্ষমতা।

তবে নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতে একটু বেশি সময় লেগে যায় এবং ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রাদেশিক নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৯ টি আসন ব্যতীত (এই আসনগুলোতে ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়) সমগ্র পাকিস্তানে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কার্যাবলি:

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশে বিরাজমান অস্থিরতা দূরীকরণে সাধারণ নির্বাচনের বিকল্প কিছু ভাবে পারেননি। এ কারণে তিনি অচিরেই একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হন তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারপতি আবদুস সাত্তার।

রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতা:

১৯৭০ সালে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে সমগ্র পাকিস্তানে প্রাণ সঞ্চার হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সমমনা কিছু দল ঐক্যজোটের মাধ্যমে নির্বাচনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আওয়ামী লীগের অনাগ্রহের কারণে তা সফল হয়নি। ফলে নতুন বা পুরাতন সব রাজনৈতিক দল আলাদা ভাবে মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মোট ২৪টি

রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। এই নির্বাচনে প্রথমবারের মত রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচারকার্য চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করে। দলটি ‘নৌকা’ প্রতীক নিয়ে তার প্রচারাভিযান আরম্ভ করে। তাদের মূলমন্ত্র ছিল ছয় দফার বাস্তবায়ন। দলটির প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতায় বারংবার উচ্চারিত হয় এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি। অন্যদিকে অন্যান্য দলের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনপ্রিয়তা ব্যাপক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রচারাভিযানে তাদের স্লোগান ছিল, “ইসলাম হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি।” এদলটির প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি শেখ মুজিবুরের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হন এবং কৌশলে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। তিনি অপপ্রচার চালাতে থাকেন যে, ছয়দফা হলো পাকিস্তানের জাতীয়তার জন্য আঘাত স্বরূপ। নির্বাচনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির দিক বিবেচনা করে মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতারা নির্বাচন পেছানোর দাবি করলেও শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল যথা সময়ে নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকেন। আওয়ামী নেতারা প্রচার করেন যে, এই নির্বাচন এখন বাতিল করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আবার অন্য কুটকৌশল চালাতে পারে। তারা আরো বলে যে, যে সমস্ত এলাকায় নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় সেখানে পরিবর্তিত তারিখে নির্বাচন হতে পারে। ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পেছানোর কথা দ্বিতীয় বার ভাবেনি। যাই হোক ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি আসনে একমাস পর ১৯৭১ সালে ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন (৩০০)	মহিলা আসন (১৩)	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	০৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৮১	০৫	৮৬
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৯	-	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	-	৭
জমিয়ত-উ-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভী)	৭	-	৭
মারকাজ-ই-জমিয়ত-ই-ইসলাম	৭	-	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	৬	০১	৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৪	-	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	-	১
স্বতন্ত্র	১৬	-	১৬

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি আসন (ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি) বাদে অন্য সব আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন জয়ী দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন না পেলেও পাঞ্জাবে ৬৪ টি, সিন্ধুতে ১৮ টি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি আসনে জয়ী হয়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০ আসনের ফলাফল:

১. আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি
২. পি. ডি. পি ২ টি
৩. জমিয়তে ইসলাম ০
৪. উলেমা ই ইসলাম ১
৫. নেজামে ইসলাম ০
৬. জামায়াতে ইসলাম ১
৭. ন্যাপ (ওয়ালী) ১
৮. স্বতন্ত্র ৭

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুলভোটে বিজয়ের কারণ:

শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ। তাছাড়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে জুলুম নির্যাতন ও বৈষম্য বঞ্চনা করেছিল, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি ব্যালটের মাধ্যমে আস্থা জানিয়ে এর জবাব দেওয়া হয়। ছয় দফা ভিত্তিক ইশতেহার প্রণয়ন ছিল এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের আরেকটি কারণ। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের নির্যাতন নিপীড়নের থেকে মুক্তির সুবাস দেখতে পাচ্ছিল। ইতিপূর্বে ছাত্রদের এগারো দফা আওয়ামী লীগ কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ছাত্ররাও দলটিকে বিজয়ী করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

ক. এই নির্বাচনে বিপুলভোটে বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এ দেশের আপামর জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইতিপূর্বে তার ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রকৃত অর্থেই এদেশের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল তা এই নির্বাচনী ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

খ. শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোতে জনগণের ভূমিকা আরেক বার জোরেশোরে প্রকাশ পায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে জানান দেয় যে, তারা তাদের অধিকার আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেই আদায় করে নিতে প্রস্তুত আছে। জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দল বিশেষ করে পি. পি. পি কে একটি আসনেও জয়ী হতে দেয়নি এটি তার বড় প্রমাণ।

গ. এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিরা জাতীয়তাবোধে দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। দিন মজুর থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির কামনা জেগে ওঠে। এভাবে তারা নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়।

ঘ. এই নির্বাচন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে কালবিলম্ব হওয়ায় আওয়ামী লীগের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিল।

ঙ. বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এই নির্বাচনের প্রভাব অপরিমিত এবং অনস্বীকার্য। কেননা জনগণ শাসনতান্ত্রিকভাবেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় নির্বাচনে বিপুলভোটে আওয়ামী লীগকে জয়ী করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে গড়িমসি করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। ফলে উপায়ন্তর না দেখে বাঙালি জাতি পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ :
১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই নির্বাচনের জন্য ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারকের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এই নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকবর্গ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয় হয়। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।	

পাঠ-৯.৭

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

আগরতলা মামলা, গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ



বাঙালি জাতির জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে তথা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না বিভিন্ন কটকৌশল অনুসরণ করেন। ফলে বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দিকে বাকে পড়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, নির্যাতন নিপীড়নের থেকে মুক্তির মহামাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালে প্রতিবাদী বাঙালি জাতি স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মহামুক্তি। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের চেতনার ইতিহাস রচনার বীজ বপন হয় সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। যেখানে বাঙালি জাতি প্রমাণ করেছিল রক্তের বিনিময়ে হলেও তারা তাদের দাবি আদায় থেকে পিছপা হবে না। বাঙালি জাতি তাদের আন্দোলন সংগ্রামের মূলমন্ত্র খুঁজে পায় ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে। আবার ছাত্ররাও সুনির্দিষ্ট এগারো দফার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। আইয়ুব খান সরকার আগরতলা মামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে নেতৃত্ব শূণ্য করার অপচেষ্টা চালালে তা বাঙালিদেরকে বারুদের মত বিস্ফোরিত করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে চরমভাবে উত্তেজিত করে। বাঙালি জাতি শেখ মুজিব সহ সকল আসামির মুক্তির দাবিতে দুর্বীর গণআন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৯ সালে এক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এ অভ্যুত্থানের ফলে ঘটে। আগরতলা মামলার আসামীরা মুক্তি পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে ঘিরে তারা নতুন দিনের সোনালী সূর্যের আশায় দিন গুনতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ এতই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী দল পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে তারা নির্বাচনে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর বিশাল বিজয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়। এজন্য ক্ষমতা হস্তান্তর নানা প্রতারণার আশ্রয় নেয়। প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হলেও তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে গড়িমসি করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয় এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। যা ছিল বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা মূলক একটি ভাষণ। এই ভাষণে তিনি সর্বস্তরের জনগণকে লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহবান জানান। ভাষণে তিনি বলেন, “ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুখের বিষয় আজ ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভায়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ আজ তার অধিকার চায়।”..... ভাষণের

শেষ অংশে এসে তিনি সবাইকে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন। তিনি এদেশের মানুষকে মুক্ত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

শেখ মুজিবুর এই ভাষণ বাঙালি জাতির মনে চরমভাবে আশার সঞ্চারিত করে এবং তারা প্রবল উৎসাহ নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার কথা বলে কালক্ষেপণ করার বন্দোবস্ত করেন। যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে আনা যায়। তবে অন্তরে যাই থাক প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন ১৬ মার্চ।

২৫ মার্চের গণহত্যা

আলোচনা কালেই ২৩ মার্চ ‘পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে’ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উড়ানো হয়। ২৫ মার্চ কোন ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। তার নির্দেশেই বাঙালির আন্দোলন চিরতরে দমন করতে ঐদিন রাতেই ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে হত্যায়ত্ত শুরু করে। এই কাপুরুষোচিত অতর্কিত হামলাকে তারা নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চলাইট’। এই অপারেশনের দায়িত্বে এবং পরিকল্পনায় ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত গভর্নর টিক্কা খান এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে জাতির মহাদুর্যোগকালে চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অষ্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ই-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান ‘We revolt’ বলে প্রথম বিদ্রোহ এবং পাকিস্তান বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জিয়া তাঁর অধীনস্থ সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন। সবাই তাঁর সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসারগণ তাদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের গ্রেফতার ও হত্যা করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে জিয়াউর রহমান এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজ নামে এবং পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামোল্লেখ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বাঙালি জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দীর্ঘ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুক্ত বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, দিশেহারা মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। আর এভাবেই শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

২৬ মার্চ থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ। কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আরেকটু সময় লেগে যায় অর্থাৎ ১৫ দিন পর ১০ এপ্রিল তারিখে অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার গঠন করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া হয়। তার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান তাজউদ্দিন আহমেদ। এই সরকারের সর্বমোট সদস্য ছিল ৬ জন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি
৩.	তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী
৪.	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
৫.	ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী
৬.	এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন:

প্রবাসী সরকার গঠন করা হলে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য দলের নেতাকর্মীরা নবগঠিত এই সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। বিশেষ করে ন্যাপ নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ এবং কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। তাদের সাথে আওয়ামী লীগের আরো পাঁচজন নেতার সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। তারা মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

মুক্তিবাহিনী গঠন:

অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে আরো গতিশীল এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে পরিচালনা করার জন্য এ দেশের বিভিন্ন বাহিনীতে চাকরির সেনাদের সমন্বয়ে ‘নিয়মিত বাহিনী’ এবং সাধারণ জনতার সমন্বয়ে ‘অনিয়মিত বাহিনী বা গণবাহিনী’ নামক প্রধান দুটি বাহিনী গঠন করা হয়। তবে সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের এসব বাহিনী ‘মুক্তি বাহিনী’ নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর অধীনে আরো কিছু উপ বাহিনী গঠিত হয়। যথা-

ক. সেনা ব্যাটেলিয়নঃ এই বাহিনীটি গঠিত হয় তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর এর বাঙালি সদস্যদের সমন্বয়ে। এই বাহিনীকে পরে তিনটি আলাদা ব্রিগেডে বা ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ব্রিগেড প্রধানদের নামের অদ্যাক্ষর অনুযায়ী ব্রিগেড ফোর্সগুলোই নামকরণ করা হয়। ব্রিগেড ও এর প্রধানগণ হলেন-

১. জেড ফোর্স- মেজর জিয়াউর রহমান

২. এস ফোর্স- মেজর শফিউল্লাহ

৩. কে ফোর্স- মেজর খালেদ মোশাররফ

খ. সেক্টর ট্রুপস: এই বাহিনী গঠিত হয় ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যদের নিয়ে। সারাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে এই বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

অনিয়মিত বাহিনী: মুক্তিযুদ্ধে অসীম অবদান রাখা আরেকটি দল ছিল অনিয়মিত বাহিনী। দেশের আপামর জনতা কৃষক দিনমজুর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ এই বাহিনীর অংশ ছিল বলে এরা গণবাহিনী নামে সমধিক পরিচিতি পায়। এদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো হত। তারা বেশিরভাগ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করত। আবার নিয়মিত বাহিনীকে খবরাখবর, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ কাজে সহযোগিতা করত এই বাহিনী। উল্লেখ্য যে, নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও যুদ্ধের সময় আরো কিছু বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স বা বি. এল. এফ এটিকে বলা হয় রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। কেননা ছাত্র নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা, কর্মী এবং আরো কিছু শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এরা পরবর্তীতে ‘মুজিব বাহিনী’ নামেও সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

টান্কাইলের কাদেদিয়া বাহিনীঃ এটির প্রধান ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। পরে যাকে ‘বঙ্গবীর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই বাহিনী গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করত।

ময়মনসিংহের ভালুকার আফসার বাহিনীঃ এই বাহিনীটিও গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় পর্যদুস্ত করে রেখেছিল।

মুক্তিবাহিনীকে সেক্টরে বিভক্তকরণ:

যুদ্ধ ব্যাপকভাবে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বমোট ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে সেক্টর সমূহের অধীনস্থ এলাকা এবং সময়কালসহ কমান্ডারদের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

সেক্টর নং	কমান্ডার	দায়িত্ব পালনের সময়কাল	অধীনস্থ এলাকাসমূহ
১.	ক. মেজর জিয়াউর রহমান	এপ্রিল- জুন	সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম (ফেনী নদী পর্যন্ত)
	খ. মেজর মোহাম্মদ রফিক	জুন- ডিসেম্বর	
২.	ক. মেজর খালেদ মোশাররফ	এপ্রিল- সেপ্টেম্বর	ঢাকা, ফরিদপুরের কিছু অংশ, নোয়াখালী, কুমিল্লার আখাউড়া হতে ভৈরব রেললাইন
	খ. মেজর এ টি এম হায়দার	সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর	

সেক্টর নং	কমান্ডার	দায়িত্ব পালনের সময়কাল	অধীনস্থ এলাকাসমূহ
৩.	ক. মেজর এ কে এম শফিউল্লাহ খ. মেজর নুরুজ্জামান	এপ্রিল- সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
৪.	মেজর সি আর দত্ত	এপ্রিল- ডিসেম্বর	বর্তমান সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত
৫.	মেজর মীর শওকত আলী	এপ্রিল- ডিসেম্বর	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ডাউকি রোড থেকে ময়মনসিংহ জেলা পর্যন্ত
৬.	উইং কমান্ডার এম বাশার	এপ্রিল- ডিসেম্বর	বর্তমান রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা
৭.	ক. মেজর নাজমুল হক খ. মেজর কাজী নুরুজ্জামান	এপ্রিল-আগস্ট আগস্ট- ডিসেম্বর	বর্তমান দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা
৮.	ক. মেজর আবু উসমান চৌধুরী খ. মেজর এম মঞ্জুর	এপ্রিল-আগস্ট আগস্ট- ডিসেম্বর	বর্তমান কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনার উত্তরাঞ্চল
৯.	ক. মেজর এম এ জলিল খ. মেজর জয়নাল আবেদিন	এপ্রিল-ডিসেম্বরের কয়দিন ডিসেম্বরের শেষ কয়দিন	বর্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলা
১০.	সংশ্লিষ্ট এলাকার কমান্ডারের অধীনে পরিচালিত	-	দেশের সমগ্র নদীপথ এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর এলাকা
১১.	ক. মেজর আবু তাহের খ. এম হামিদুল্লাহ	এপ্রিল-নভেম্বর নভেম্বর-ডিসেম্বর	বর্তমান ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠন এবং চূড়ান্ত বিজয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হলে যুদ্ধের মোড় দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করার ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববাসীর নজর কাড়ার অপচেষ্টা চালায়। এদেশীয় মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারত বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। যৌথ বাহিনীর সরাসরি আক্রমণে বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে যশোর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিকট থেকে মুক্ত করা হয়। এরপর একে একে সাতক্ষীরা, টঙ্গী, জামালপুর, সিলেট জেলা মুক্ত হতে থাকে। ময়নামতি সেনানিবাস অধিকারে এনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকা অবরোধের চেষ্টা চালানো হয়। ভারতের স্বীকৃতির পরই অস্থায়ী সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বেতার কেন্দ্র থেকে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই মাগুরা, ঝিনাইদহ এবং নড়াইল যৌথ বাহিনীর অধিকারে আসে। ঢাকা আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ১০ ডিসেম্বর সকল প্রকার বিমান হামলা বন্ধ রেখে বিদেশি নাগরিকদেরকে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশনা জারি করা হয়। ঢাকায় আক্রমণ চালানোর মূল পরিকল্পনা করা হয় ভৈরব দখল করার পর এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখান থেকেই ঢাকায় আক্রমণ চালানো হবে। ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড: বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশীয় মিত্র আল বদর, আল শামস প্রভৃতি বাহিনীর সহযোগিতায় আরেক দফা গণহত্যা চালায়। যেখানে বাঙালিদের মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয় এবং হত্যা করা হয় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর তারিখে তারা ব্যাপকভাবে শিক্ষিত শ্রেণি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য অধ্যাপকদের হত্যা করে। কিন্তু ঐদিনই বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী ঢাকার খুব নিকটে পৌঁছে গেলে হানাদার বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।



পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের দৃশ্য

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও পূর্বপাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ রেসকোর্স ময়দানে তথা বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ বাহিনীর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হাজার হাজার মা-বোনের সন্তানহানি এবং লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলার জনগণ লাভ করে একটি পতাকা এবং একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম ভূখণ্ড বাংলাদেশ। পূর্ণ হয় বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নস্বাদ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ঘটনা ও ফলাফল লিখুন।
--	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ :
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালালে অদম্য বাঙালি জাতি গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং বাঙালি জাতি। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হলে জাতির চরমক্রান্তিকালে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে শুরু হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ২৭৬ দিন পর ৯৩ হাজার সৈন্যসহ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অব্যুদয় ঘটে।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭
--	------------------------

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণটি কে প্রদান করেন?
ক. আইয়ুব খান খ. ইয়াহিয়া খান গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান
- ২। চট্টগ্রাম অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে কে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?
ক. তাজউদ্দিন আহমদ খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম গ. মেজর জিয়াউর রহমান ঘ. কর্ণে আতাউলগণি ওসমানী
- ৩। মুক্তিযুদ্ধের স্থিতিকাল কতদিন ছিল?
ক. ৯০দিন খ. ২৭৬ দিন গ. ২৬৫ দিন ঘ. ২৩৫ দিন
- ৪। মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সেক্টর ছিল?
ক. ৮ খ. ১৯ গ. ১১ ঘ. ১৫
- ৫। কবে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?
ক. ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল খ. ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল
গ. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘ. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল

	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
--	--------------------

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘ক’ সদ্য স্বাধীন একটি মুসলিম দেশ। দেশটির মধ্যে দুটি প্রধান জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলমান। একটি পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হল। নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এবং সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এই যুদ্ধে শাসক শ্রেণি চরমভাবে পরাজিত হয় এবং বাংলাদেশ নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. মুক্তিযুদ্ধ কী ?	১
খ. মুক্তিযুদ্ধে মোট কতটি সেক্টর ছিল লিখুন?	২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি লিখুন।	৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।	৪



উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১. গ	২. গ	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১. খ	২. ক	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১. ক	২. খ	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১. ক	২. ক	৩. খ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১. ক	২. ক	৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১. গ	২. ক	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১. গ	২. গ	৩. ঘ

মানবন্টন

এইচএসসি প্রোগ্রাম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (দ্বিতীয় পত্র)

নম্বর বন্টন	সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো
-------------	------------------------------------

পূর্ণমান-১০০

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন- ৬০ নম্বর

৬×১০ = ৬০

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর।

প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর ১।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, ম্যাপ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের এ ৪টি অংশে মোট ১০ নম্বর (১+২+৩+৪=১০) থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের ধরন হবে নিম্নরূপ:

প্রশ্নের ধরন	নম্বর
ক. জ্ঞান স্তর-	১
খ. অনুধাবন স্তর-	২
গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	৩
ঘ. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	৪
মোট=১০	

(খ) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন- ৪০ নম্বর

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন ১ নম্বর।

৪০×১ = ৪০

সর্বমোট = ১০০